

চৈত্র—১৩৩৮

দ্বিতীয় খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { চতুর্থ সংখ্যা

জীবাত্মা

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্

(১)

জীবাত্মা কি তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব ; বুঝাইতে পারিব এমন সাহস করি না। নিম্নে দেখা যাইবে যে, এই বিষয়ের আলোচনা কত জটিল।

আমরা এখন সকলেই দেহাতিরিক্ত একটি জীবাত্মা স্বীকার করিয়া থাকি। তিনি দেহ নহেন, কিন্তু দেহের অধিপতি ও পরিচালক। এইরূপ ধারণা সভ্য সমাজে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। কোন সমাজে ইহাকে soul বলে, কোন সমাজে রুহ (‘রুহ’) বলে। কিন্তু সর্ব্ব সমাজেই দেহ হইতে ইহাকে পৃথক করা হয়।

যদি তিনি দেহেই বাস করেন অথচ দেহ হইতে পৃথক, তবে দেহের সর্ব্বত্রই বাস করেন, কিম্বা দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করেন—ইহাই সর্ব্বপ্রথমে আলোচ্য।

প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত জীবাত্মা সম্বন্ধে কি ধারণা চলিয়া আসিতেছে? প্রথমে কোষ-গ্রন্থের উল্লেখ করিব। নিঘণ্টুকে বেদমন্ত্রের কোষ-বলা যাইতে পারে। নিরুক্ত তাহারই ভাষ্য। নিঘণ্টুতে জীবাত্মা বা আত্মা শব্দের কোন পদ-নাম (প্রতিশব্দ) নাই। সুতরাং অনুমিত হইতে পারে যে বেদের মন্ত্রাংশে জীবাত্মা অথবা আত্মা

শব্দের উল্লেখ নাই। আমিও বেদে এই দুই শব্দ পাই নাই।

অমরকোষে দেখা যায় যে আত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষ—এই তিন শব্দের একই অর্থ।

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতি স্ত্রিয়াং।

স্বর্গবর্গ ৪।১০

অর্থাৎ আত্মার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষ এবং প্রকৃতির নাম প্রধান।

কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমে জীব শব্দের যত্ন, ধৃতি বুদ্ধি, স্বভাব, ব্রহ্ম, দেহ এই ছয়টি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে "অমরকোষ প্রমাণং"। কিন্তু আমি অমরকোষে এই ছয়টি অর্থ পাই নাই। আমি যাহা প্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

জীবাত্মা যদ্যপি ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে জানেন, স্বয়ং দেহ নহেন। গীতার ১৩।২ শ্লোকে পাওয়া যায়—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

শ্রীধর স্বামী এ স্থলে বুঝাইতেছেন যে "ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রং * * * * এতদ্ যো বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে তং ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাহুঃ কৃষিবলবত্তৎ ফল ভোক্তৃত্বাৎ তদ্বিদঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকজ্ঞাঃ।" স্বামীজী বলিয়াছেন যে দেহকে প্ররোহ ভূমি বলিয়া যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে ইনিই জীবাত্মা।

কিন্তু অমরকোষে ইহাকে পুরুষও বলিয়াছে। সাংখ্য-দর্শনে দেখিতেছি—

সঙ্ঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ১৭

ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য্য প্রণীত কারিকা।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত সংঘাত পদার্থ "পরের" অর্থাৎ অসংঘাত পদার্থের প্রয়োজনীয়। যাহা সংযোগ বিয়োগের দ্বারা জাত হয় তাহা (ঐ প্রকারে যিনি জাত নহেন তাঁহার অর্থাৎ) অজাতের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সে অজাত ত্রিগুণাত্মক বস্তু নহে, অর্থাৎ ত্রিগুণ জাত সমস্তের অতিরিক্ত। ইনি অধিষ্ঠাতা ভোক্তা এবং মুক্তির জন্য প্রবৃত্ত। এতদ্দ্বারাও জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক বলিয়া বুঝা যাইতেছে; এবং বোধ হয় পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতেছে।

মেদিনী কোষে জীবাত্মাকে "মন" বলিয়াছে। কিন্তু মন কি? মন সংকল্প বিকল্পাত্মক অন্তরেন্দ্রিয় মাত্র। অমরকোষে মনের এই কয়েকটী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে—

চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসংমনঃ।

স্বর্গবর্গ ৪।১৮

তাহা হইলে জীবাত্মা চিত্ত অথবা হৃদয় হইতেছেন। কারণ তিনি ও মন একই।

হেমচন্দ্র জীবকে অর্ক হুতাশন ও বায়ুর সহিত এক করিয়াছেন।

জীবঃ অর্কঃ হুতাশনঃ বায়ুঃ।

শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত।

এ কি হইল? জীবাত্মা বায়ু এবং হুতাশন এবং অর্ক হইয়া গেল। এ তিনটি কি ক্ষেত্রজ্ঞ অথবা পুরুষ?

ত্রিকাণ্ড-শেষে জীব পর্য্যায়ে আত্মা, পুরুষ, অন্তর্যামী এবং ঈশ্বরকে একই বলা হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মমায়োপহত হইয়া ঈশ্বর উপাধি লাভ করেন, এবং ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টি। সুতরাং জীবাত্মা সৃষ্টিকর্ত্তাই হইতেছেন। ইহা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। পাতঞ্জল দর্শনের যোগপাদের ২৪ সূত্রে দেখা যাইতেছে যে—

ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।

জীবাত্মা কি তবে ক্লেশ কর্ম্মাদির অধিক হইল না? এ কি?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখিতে পাই—

জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ॥

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নির্লিপ্ত আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিবিম্বই জীবাত্মা অথবা দেহী। পরমাত্মার প্রতিবিম্ব কথাটি বুঝা কঠিন। অবস্তুর প্রতিবিম্ব কি? প্রতিবিম্ব পড়েই বা কোথায়? স্থানান্তরে বলা হইয়াছে,

"দর্পণ মুখ প্রতিবিম্ববৎ বুদ্ধিস্থ চৈতন্যং প্রতিবিম্বং।"

বুদ্ধিস্থ চৈতন্য নিশ্চয়ই দেহে অবস্থিত; সুতরাং দেহী অথবা জীবাত্মা। মুখ এবং দর্পণ দুইটি বস্তু থাকিলে দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। পরমাত্মা যদি বস্তু হন এবং আর একটি স্বচ্ছ বস্তুও থাকে তবেই তাহাতে পরমাত্মার

প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। নচেৎ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব জীবাত্মা, এ কথাটি বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় অসম্ভব হইয়া উঠে। এই কথাটি উপমা মাত্র তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু বস্তুতঃ অর্থ বোধ করা কঠিন। তাহা হইলেও জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক কিন্তু দেহস্থ, ইহা বুঝা যাইতেছে।

"দেহস্থ"—কিন্তু দেহের কোথায় স্থিত? এ কথা বুঝিতেই হইবে, যদিও বুঝা সহজ নহে। বেদান্ত মতে—

"ঘটাবচ্ছিন্নাকাশবৎ শরীর ত্রিতয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যং"

অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ত্রিবিধ শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়াই চৈতন্য রহিয়াছে। তাহাতেই আমরা চেতন। যে বস্তুতে এই পদার্থ নাই তাহা অচেতন। কিন্তু ত্রিবিধ দেহে অবচ্ছিন্ন হইলে ঐ সকল দেহের কোন্ স্থানে অবচ্ছিন্ন তাহা বুঝা গেল না।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার (২।২২) বিখ্যাত "বাসাংসি-জীর্ণানী" শ্লোকে দেখিতেছি যে জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক পদার্থ। কারণ তিনি এক দেহ ত্যাগ করিয়া আর এক দেহ গ্রহণ করেন, আমরা যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করি। গীতারই ২।২৫ শ্লোকে মনকে আত্মাতে স্থির করিবার উপদেশ আছে। অথচ মেদিনী কোষ মন ও আত্মা এক করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক মনকে আত্মাতে স্থির করিবার অর্থ কি? গীতার ১৩।৩২ শ্লোকে লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মানো পলিপ্যতে"।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে গীতাকার জীবাত্মাকে দেহের সর্ব্বত্র স্থিত বিবেচনা করিয়াছেন। তাহা হইলে মনকে দেহের সর্ব্বত্র স্থির করিতে হয়। এ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য কথা। আত্মা দেহ হইতে পৃথক পদার্থ হইলেও তাহার অবস্থান অপরিজ্ঞাত থাকায় মনকে তাহাতে স্থির করিবার কথা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে।

আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি যে জীবাত্মা ও মন একই। (অমরকোষ স্বর্গ বর্গ, ৪।১৮)। এ স্থলে মনকে আত্মায় স্থির করা বলিলে কি বুঝিব?

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৯।৩।২৫-২৬) দেখিতে পাই—

অথৈকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদস্ত্রাস্মন্নাসৈ বৈতদস্ত্রাস্মৎ স্যাচ্ছানো বৈতদস্ত্যর্ব্বয়াংসি বৈনদ্দিম ন্তীর নিতি।২৫।

কস্মিন্নুতঞ্চাত্মাচ প্রতিষ্ঠিতৌস্থ ইতি প্রাণ ইতি, কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি, * * * সমান ইতি॥২৬॥ *

এই দুই মন্ত্রের ভাষ্যে স্বামী শঙ্করাচার্য্য বুঝাইতেছেন যে, যস্মিন্‌কালে এতদ্দ্বয়মাত্মা অস্য শরীরস্যান্যত্র ক্বচিদ্দেশান্তরেঽস্মতো বর্ত্তত ইতি মন্যসে * * * তদাশ্বানো বা এনচ্ছরীরং তদাদ্যুঃ, বয়াংসি বা (পক্ষিণো বা) এনদ্ধি * * * বিলোড়য়েয়ুঃ। তস্মাম্ময়ি শরীরে হৃদয়ং (আত্মা) প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ। শরীর স্যাপি নামরূপ কর্ম্মাত্মকত্বাদ্ধৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২৫॥

হৃদয় শরীরয়োরেব মন্যোঽন্য প্রতিষ্ঠোক্তাকার্য্য করণয়োরতস্ত্বাং পৃচ্ছামি কস্মিন্নু ত্বং চ শরীর চাত্মাচ তব হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতৌস্থ ইতি। প্রাণইতি। দেহাত্মানৌ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতৌ কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি * * * সমান ইতি। ২৬। পূর্ব্বে উদ্ধৃত ২৫।২৬। মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যের অর্থ এইরূপ—"হে অহম্বিক যে সময়ে এই শরীরের পরিচালক হৃদয় (আত্মা) আমাদের দেহ হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে কর সে সময়ে এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করে, পক্ষী সকল স্ব স্ব চঞ্চু দ্বারা বিমোহিত (ছিন্ন ভিন্ন) করে। যেহেতু হৃদয়ের অভাবে দেহ এইরূপ বিধ্বস্ত হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই দেহই হৃদয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। যেমন হৃদয় দেহেতে প্রতিষ্ঠিত তেমনই নামরূপ কর্ম্মময় শরীরও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।" ।২৫। "তুমি (শরীর) এবং তোমার আত্মা (হৃদয়) এই উভয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—প্রাণে অর্থাৎ দেহ ও আত্মা উভয়েই প্রাণবৃত্তিতে অবস্থিত। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রাণবৃত্তি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তর—অপানে। অপান বৃত্তি কোথায় অবস্থিত? উত্তর—ব্যানে। * * * সমানে প্রতিষ্ঠিত।" ।২৬।

এ সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হৃদয়ের নামই দেহস্থ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। জীবাত্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান এই পঞ্চবায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। এই পঞ্চবায়ু শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্ম করে। প্রাণবায়ু নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস করায়; এইরূপ আর চারিটি বায়ুও

* মন্ত্রে এবং শঙ্কর ভাষ্যে * * * এইরূপ ষ্টার চিহ্নিত স্থানে ব্যান, উদান, সমান, বায়ুত্রয় সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তবৎ প্রশ্নোত্তর বুঝিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করায়। অতএব জীবাত্মা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করান। তাহা হইলে জীবাত্মা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইতেছেন; এবং হৃদয় ইহাঁর নামান্তর মাত্র হইতেছে। জীবাত্মা তবে সর্ব্বশরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক পঞ্চবায়ুর সমষ্টি-নাম হইয়া গেল। যেমন বহু বৃক্ষলতাদির সমষ্টি-নাম জঙ্গল অথবা অরণ্য। যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে আছে তাহা ঐ সকল বৃক্ষলতা। জঙ্গল অথবা অরণ্য বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই। উহা কেবল সমষ্টি-নাম মাত্র। তদ্রূপ যখন প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ুর সমষ্টি-নাম আত্মা, তখন যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে আছে তাহা ঐ পঞ্চবায়ু অথবা তাহাদিগের (শারীর) কর্ম্ম; আত্মা নহে। এ দিক হইতে দেখিলে জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্বই থাকে না। তাহা হইলে জীবাত্মা সর্ব্বদেহের বিভিন্ন কোষের কর্ম্ম-সমষ্টি অথবা কর্ম্ম-সমষ্টি-প্রবর্ত্তক এবং সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত পদার্থ হইতেছে; ইহার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকিতেছে না। ন্যায়দর্শনে ১।১।১০

ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গমিতি। এবং বৈশেষিক দর্শনে ৩।৪।২

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষ জীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তর বিকারাঃ সুখ দুঃখেচ্ছাদ্বেষ প্রযত্নাশ্চাত্মনোলিঙ্গানি।

এতদুভয় দর্শন হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটি সামান্য লিঙ্গ আছে এবং বৈশেষিকে কয়েকটি বিশেষ লিঙ্গ আছে। বৈশেষিক দর্শনে বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই প্রাণবায়ু অপান বায়ু প্রভৃতি জীবাত্মার লক্ষণ বলিতেছে। তৎসহ সমস্ত জীবন ব্যাপারেরও উল্লেখ করিয়াছে, যদিও মনেন্দ্রিয়াদি পৃথক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু উভয় দর্শনেই ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ইত্যাদিকে জীবাত্মার লক্ষণ বলা হইয়াছে। যাহা হউক মহর্ষি গৌতম ও কণাদ উভয়েই দেহের সমস্ত প্রযত্ন ও মনের সমস্ত বৃত্তি এবং সুখ দুঃখাদি অনুভূতিকেই জীবাত্মার লিঙ্গ বলিতেছেন। ইহাতেও জীবাত্মার লক্ষণ দেহের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আরোপ করা হইতেছে না; বরং আমাদিগের জীবনব্যাপী দেহ মনের সমস্ত কর্ম্মের সমষ্টিকেই জীবাত্মার লক্ষণ বলা হইতেছে। লক্ষণ হইতে লক্ষ্যকে যখন পৃথক করা যাইতে পারে না তখন ঐ সমস্তকেই জীবাত্মা বলা হইল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৯।৩।৯ মন্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

"কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মত্যাদিত্যাচক্ষতে।" মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তেত্রিশ দেবগণকে ক্রমে একে পরিণত করিবার পর বলিতেছেন যে, সেই এক দেব কে? উত্তর—সেই এক দেব প্রাণ; তাহাকে ব্রহ্ম বলে। এ স্থলে প্রাণকে পঞ্চবায়ুর অন্যতম বলা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। লক্ষ্য করিবেন, ঈশ্বর বলা হয় নাই, ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অমরকোষে এবং গীতায় জীবাত্মাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ, ব্রহ্ম তাহা নহেন। সুতরাং এই দুই অর্থে অত্যন্ত প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৩।১ এবং ১।৪।১ মন্ত্র দুইটি পূর্ব্বোদ্ধৃত ৯।৩।৯ মন্ত্রের সহিত একত্র পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আত্মা প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এই পঞ্চবায়ুই; এবং ব্রহ্মও। ৪।৩।১ মন্ত্রে আত্মাকে পঞ্চবায়ুর সহিত একীকরণের পর "সর্ব্বান্তরঃ" বলায় ব্রহ্মই বলা হইল। ১।৪।৩ মন্ত্রে "প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি * * * * প্রাণ এবায়তনং" বলায় স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা * * * * *" মন্ত্রের (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।১) ভাষ্য করিতে স্বামী শঙ্করাচার্য্য জীবাত্মাকে অবিবেকী এবং "কাম-কর্ম্ম-বাসনাশ্রয়-ফল-ভোগী" বলিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে জীবাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা হইতেছে। কারণ ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব এবং কাম কর্ম্ম বাসনার ফল কখনই ভোগ করেন না। "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মে এ প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঈশোপনিষদেরও প্রথম মন্ত্রেই ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব উল্লেখ আছে। সে ব্যাপিত্ব জীবাত্মার নাই। তবে জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলা হইবে কেমন করিয়া? তিনি কি সর্ব্বদেশী অথবা ঘটাবচ্ছিন্ন সুতরাং একদেশী?

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চ কোশের বিবৃতি আছে। প্রত্যেক কোশের মস্তক বাহু পদ ইত্যাদি অঙ্গ আছে। অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ; অতএব "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ"। এই অন্ন রসময় কোশ হইতে পৃথক আর একটি প্রাণময় কোশ আছে। ঐ কোশ "অন্তরঃ আত্মা" অর্থাৎ আত্মারূপে পরিকল্পিত। অন্নময়

কোশের যিনি আত্মা প্রাণময় কোশেরও তিনিই আত্মা। এ আত্মা "শারীর আত্মা"। শারীর অর্থে এ স্থলে শরীরস্থ। মনোময় কোশের এবং জ্ঞানময় কোশের একই রূপ। জ্ঞানময় কোশেরও শারীর আত্মা অর্থাৎ জ্ঞানময় কোশের যেরূপ শরীর বর্ণিত আছে তদাশ্রিত আত্মা। শ্রদ্ধা এ কোশের মস্তক, ঋত দক্ষিণ হস্ত, সত্য বাম হস্ত, যোগ তাহার আত্মা, বুদ্ধি তাহার পুচ্ছ। এ রূপকের অর্থ সুস্পষ্ট। অনন্তর আনন্দময় কোশ। এ কোশেরও দেহ আছে। "স বা এষ পুরুষ বিধ এব;" অর্থাৎ আনন্দময় কোশ পুরুষ-রূপ। কিন্তু পুরুষের তো রূপ নাই। এ নিমিত্ত পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী সংশোধিত তত্ত্বনিধি মহাশয়ের ভাষ্যে "মনুষ্যাকার" বলা হইয়াছে। এ অর্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। যাহা হউক আনন্দময় কোশেরও রূপ আছে। সে রূপ এই প্রকার—

তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

মৎকৃত উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীতে এ মন্ত্রের আমি এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি:—

প্রীতি তার শির উত্তম অঙ্গ,
সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম সঙ্গ।
মোদ হয় তার দক্ষিণ হস্ত
প্রমোদ তাহার বাম হস্ত।
নিত্য আনন্দ আত্মা তাহার
ব্রহ্ম বস্তু পুচ্ছ তাহার।

এ রূপকের অর্থও সুস্পষ্ট।

এ সকল হইতে আমরা জীবাত্মার কি পরিচয় পাইলাম? পঞ্চকোশের প্রত্যেকেরই দেহ আছে, মস্তক বাহু পদ ইত্যাদি সমস্তই আছে। অন্নময় কোশের যেরূপ পঞ্চ-কোশেরও সেইরূপ। কিন্তু প্রত্যেকের শির বাহু পদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে গঠিত। আনন্দময় কোশের শির প্রীতি (প্রিয়) বিজ্ঞানময় কোশের শির শ্রদ্ধা; মনোময় কোশের শির যজু। এ কোশের আত্মা ব্রাহ্মণ অংশ। ইহার পুচ্ছ অথর্ব্ব মন্ত্র।

তস্য যজুরেব শির। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ।
সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা।
অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

প্রাণময় কোশের মস্তক্ প্রাণ; ব্যান ও অপান দুই বাহু; আকাশ আত্মা; পৃথিবী পুচ্ছ। অন্নময় কোশের দেহ আমরা সকলেই দেখিতেছি। পঞ্চ কোশেরই দেহ একই প্রকার এবং প্রত্যেক কোশ-দেহের পুরুষ একই প্রকার অর্থাৎ "শারীর আত্মা"। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশের যেমন শারীর আত্মা পর পর কোশেরও তেমনই। "যঃ পূর্ব্বস্য"। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১—৫। এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে যে, অন্নময় কোশের পুরুষ যখন অন্নরসময় হইল তখন অপর চারিটি কোশের পুরুষও সেইরূপ হইলে অর্থ কি হইবে? আত্মা কি আমাদিগের আহার্য্য পদার্থের মধ্যগত শক্তি মাত্র? যদি তাহা হয় তবে আত্মা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্তই হইতেছে। পূর্ব্বে অন্যান্য প্রমাণ হইতেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি। কিন্তু সে সকল স্থলে আত্মা অন্ন-রস-ময় শক্তি হইতে পৃথক বিবেচিত হইয়াছিল; এ স্থলে অন্ন-রস-গত শক্তিই বিবেচনা করিতে হইল। এ প্রকাণ্ড প্রভেদ।

কঠোপনিষদে পাই—

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। কঠ ৬।১৭

তাহা হইলে আত্মা তো দেহের সর্ব্বত্রব্যাপী হইল না। কেবল হৃদি-সন্নিবিষ্ট হইল। হৃদয় কোথায়? আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত শঙ্কর-ভাষ্য হইতে বুঝিয়াছি যে, হৃদয় ও আত্মা একই পদার্থ। বৃহদারণ্যকের মন্ত্রও তাহাই প্রতিপন্ন করে। যদ্যপি হৃদয় ও আত্মা এক হইয়া গেল তবে আত্মা হৃদি-সন্নিবিষ্ট এ কথার অর্থ কি? আত্মা আত্মাতেই সন্নিবিষ্ট। সুতরাং তাহার কোন আধার নাই। তিনিই সমস্তের আধার। অতএব ব্রহ্ম।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে দেখা যাইতেছে যে, এক শ্রেণীর প্রমাণে জীব শব্দের অর্থ "দেহ" পাইতেছি। অপরাপর প্রমাণে জীবাত্মা দেহের সর্ব্বত্রব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হইতেছেন। সর্ব্বশেষে উদ্ধৃত প্রমাণ মূলে জীবাত্মা ঈশ্বরও হইতেছেন, ব্রহ্মও হইতেছেন। আমরা এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম?

প্রশ্ন উপনিষদে পাইতেছি—

তস্মৈ স হোবাচ প্রজা কামোবৈ প্রজাপতিঃ

সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা স মিথুন মুৎপাদয়তে।
রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যে তৌমে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতে ইতি॥ ৪॥
আদিত্যো বৈ প্রাণোরয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা
এতৎ সর্ব্বং যন্ মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ। ৫।

প্রশ্নোপনিষদ্ ১।৪-৫।

ইহার অর্থ এই যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া তপস্যা (সংকল্প) করিলেন। চিন্তা মাত্রেই রয়ি এবং প্রাণ এই দুইটি উৎপন্ন হইল। রয়ি অর্থাৎ ভূত; প্রাণ অর্থাৎ আত্মা। এরূপ বুঝিলে বিশেষ দ্বৈধ হয় না কিন্তু পঞ্চম মন্ত্রের জন্য এরূপ বুঝিবার উপায় নাই। কারণ ঐ মন্ত্রে বলিতেছে যে রয়ি অর্থ চন্দ্রমা এবং প্রাণ অর্থ আদিত্য। সে আদিত্যও পূর্ব্বদিকে উদয় হন, সুতরাং তিনি সূর্য্য (৬ষ্ঠ মন্ত্র)। এখন কি হইল? প্রথম সৃষ্টি কি চন্দ্র এবং সূর্য্য? চতুর্থ মন্ত্রের "প্রাণ" তো পঞ্চবায়ুর অন্যতম হইতেছে না। তবে বৃহদারণ্যকের প্রাণ অপানাদির সহিত আত্মার একীকরণ কেমন করিয়া বুঝিব? যদি এই প্রাণ অথবা আত্মা দেহের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক হন, তবে তাঁহাকে সূর্য্য বলিলেই বা কি বুঝিব?

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এবং যে সকল প্রমাণ উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে, জীবাত্মা দেহ কি দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু; দেহের সর্ব্বত্রব্যাপী অথবা দেহের একদেশবাসী ইহা বুঝা সহজ নহে। জীবাত্মা ব্রহ্ম কি ঈশ্বর কিম্বা খাদ্য পানীয় গত শক্তি তাহাও বুঝা সহজ নহে। তথাপি বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে এবং বিভিন্ন প্রমাণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে মীমাংসা করিতে হয় যে, জীবাত্মা ব্রহ্মই।

জীবাত্মা না বুঝিতে পারিলে পরমাত্মা বুঝাও অসাধ্য। এ সকল না বুঝিলে মানব-জন্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং বুঝিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। এতক্ষণ আমরা এক দিক দিয়া এ চেষ্টা করিতেছিলাম; এক্ষণে অন্য দিক দিয়া চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করি।

প্রশ্ন হইতেছে, আত্মা কি এবং দেহের কোথায় অবস্থিতি করে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দেহ কিরূপে গঠিত হয়। জীবদেহ দ্বিবিধ;—এককোষ (Unicellular) এবং বহুকোষ (Multicellular)। এককোষ জীবের দৃষ্টান্ত শুক্রকীট, ম্যালেরিয়া, বসন্ত আদি রোগের কীট; এবং বহুকোষ জীবের দৃষ্টান্ত আমরা। এককোষ জীবের দেহ একটি মাত্র কোষে গঠিত; তাহাতেই তাহার সমস্ত জীবন-ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। বহুকোষ জীবের দেহ বহু কোষে গঠিত; ইহাদিগের দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন কোষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে। অস্থিকোষ, পেশীকোষ, স্নায়ুকোষ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত। অস্থিহীন বহুকোষ জীবেরও দেহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কোষ আছে এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে। এককোষ জীবের বংশবৃদ্ধি একটি কোষ হইতেই হয়; বহুকোষ জীবদিগের বংশবৃদ্ধিও এককোষ জীব দ্বারাই সাধিত হয়। যে পুংকোষ (Spermatozoon) এবং স্ত্রীডিম্ব (ovum) মিলিত হইয়া পরবংশ গঠন করে তাহারা উভয়েই এককোষ জীব। সুতরাং জীবদেহ এককোষই হউক অথবা বহুকোষই হউক, পরবর্ত্তী বংশের দেহ গঠন এককোষ জীবই করে।

পুংকোষ ও স্ত্রীডিম্ব জড় পদার্থ নহে, উহারা জীব। সুতরাং উহাদিগের আত্মা আছে। উহাদিগের মিলনে যখন অপত্যদেহ গঠিত হয়, তখন কি সে দেহে দুইটি আত্মা অবস্থিতি করে? না, তাহা নহে। বলিতেই হইবে, একটি আত্মা অবস্থিতি করে। উহাদিগের মিলনজাত ক্ষুদ্র দেহের নাম কলল। কলল দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধা ইত্যাদি বহুভাগে বিভক্ত * হইতে হইতে শত শত কোষ গঠিত করিবার পর উহারা ঊর্দ্ধাধঃ সজ্জিত হইয়া তিনটি স্তর গঠন করে এবং সেই সকল কোষপিণ্ড নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত হয়। তাহা হইতেই সমস্ত বহুকোষ জীবের দেহ জাত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, যে আত্মা অতি ক্ষুদ্র কলল-দেহাধিষ্ঠিত ছিলেন তিনিই পূর্ণগঠিত দেহের প্রত্যেক কোষে অবস্থিতি করেন। এ স্থলে কি বহু কোষে বহু আত্মা স্বীকার করিব? না, একই আত্মা। যে অণোরণীয়ান্ (অতি ক্ষুদ্র) আত্মা কলল-কোষে বসতি করিতেন তিনিই আবার মহতোমহীয়ান; সুতরাং পূর্ণাবয়ব দেহের প্রত্যেক কোষেই অতএব সমস্ত দেহেই ব্যাপ্ত। নচেৎ দেহস্থ বহু কোষের বহু ক্রিয়া মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। আমাদিগের দেহে সহস্র সহস্র কোষ আছে।

* বিভক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন নহে, পরস্পর সংযুক্ত।

ইহারা কেহ কাহারও কর্ম্ম করে না; যেন স্বতন্ত্র। তথাপি সকলেই সমষ্টি-জীবনের অনুকূল। বহুত্বের মধ্যে এই একত্ব রক্ষা করে কে? ইহাদিগের বিভিন্ন কর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা না হইলে জীবন-ব্যাপার অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই সামঞ্জস্য অতি বিস্ময়কর ভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি এই সামঞ্জস্য রক্ষা করেন তিনিই দেহের সর্ব্বকোষগত আত্মা। তিনিই অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্। এই উভয়বিধ ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্ব জীবাত্মার স্বধর্ম্ম। পরমাত্মারও স্বধর্ম্ম। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মাই। পরমাত্মা দেহবদ্ধ হইলে নাম দেওয়া হয় জীবাত্মা। ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রভেদ নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়েও রেতঃ (শুক্র)কে আত্মা বলা হইয়াছে।

যদেতদ্রেতস্তদেতৎ সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ
সম্ভূত মাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্ত্তি। ২।১

ইহার অর্থ এইরূপ:—রেতঃ সমুদয় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত তেজ। রেতঃ স্বরূপ আত্মাকে পুরুষ নিজমধ্যে ধারণ করে।

দেহের যোগে না হইলে আত্মা কোন কর্ম্মই করিতে পারে না। দেহ শব্দে এ স্থলে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, ত্রিবিধ দেহই বুঝিতে হইবে। মানবের দেহ-কোষ সকলের মধ্যে একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানের অর্থাৎ অণ্ডের অথবা ডিম্বাধারের (ovary) বিশিষ্ট কোষকে পুংকোষ অথবা স্ত্রীডিম্ব বলে। ইহারাই মিলিত হইয়া পরবংশের দেহ গঠন করে। মানব দেহের অন্যান্য কোষ দেহ-গঠন করিতে পারে না।

দেহ মরে কিন্তু পুংকোষ ও স্ত্রীডিম্ব পরবংশ গঠন করে বলিয়া মরে না। পিতার পুংকোষ পুত্রের অণ্ডে যায় এবং সেখানে তাহার পুংকোষ গঠন করে। মাতার স্ত্রীডিম্ব (স্ত্রীকোষ) কন্যার ডিম্বাধারে (ovary) গিয়া তাহার স্ত্রীডিম্ব গঠন করে। ইহারা বংশানুক্রমে দেহ গঠন করিতে থাকে এবং প্রত্যেক পর-পর বংশীয় দেহে অণ্ডে অথবা ডিম্বাধারে আশ্রয় লয় ও সেখানে স্বানুরূপ কোষ গঠিত করে। ইহাতে দেহকে আবাসভূমি এবং কললকে দেহ নির্ম্মাতা বলা যাইতে পারে *। ইহারা বংশধারা ক্রমে অমর। রেতঃ অমর সুতরাং অজও। ঐতরেয় উপনিষদে এই নিমিত্ত রেতঃকে আত্মা বলা হইয়াছে।

আমরা আবার সেই ব্রহ্ম ভাবে অথবা ঈশ্বর ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা অমর তাহা অজ তাহা নিত্য। সুতরাং একদেশী নহে। ফলে জীবাত্মা সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত হইতেছে।

যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে দেহ নহে, কিন্তু দেহ গড়িয়া লইয়া তাহার সর্ব্বত্র অবস্থিতি করে। জীবাত্মা বস্তুধর্ম্মী নহে, বস্তুও নহে।

এতক্ষণে আমাদিগের উত্থাপিত প্রশ্ন দুইটির উত্তর হইল। কিন্তু পরমাত্মা এবং জীবাত্মা যদি একই পদার্থ হন তবে জীবাত্মা দেহাবদ্ধ হওয়াতে উভয়ে এত পার্থক্য কেন উপস্থিত হয় এবং এ পার্থক্যের অবসান হইবে কেমন করিয়া? এ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রশ্নের উত্তরে পরমাত্মার ও জীবাত্মার ব্যবহারিক প্রভেদ বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতি এ বিষয়ে কিছুই সাহায্য করিতে পারে না। সুতরাং উপমা দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে হয়। বেদান্তে অনেক স্থলে সূর্য্য-কিরণের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্য-কিরণ অনন্ত আকাশ-বিস্তৃত, বৃহৎ। উহা বহুবিধ ঘটে পতিত হইয়া ঘট-ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের নিকট বহু প্রকার প্রতীয়মান হয়। এক পদার্থে লাল, অন্য পদার্থে কাল; এক পদার্থে স্বচ্ছ, অন্য পদার্থে অস্বচ্ছ ইত্যাদি বহু ভাবে প্রতিভাত হয়। আমরা সমুদ্রের জল এবং ঐ জল পূর্ণ একটি ঘট, এই দুইয়ের উপমা দ্বারা পরমাত্মার ও জীবাত্মার প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করি। ঘটপূর্ণ জল সমুদ্রের জলই, কিন্তু ক্ষুদ্র ঘটাবদ্ধ হওয়ায় তাহার কতিপয় ধর্ম্ম পৃথক্ হইয়া যায়। সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, তরঙ্গের চূড়া ফেণাবৃত হয়, সমুদ্রের জলরাশি নীলবর্ণ দেখা যায়। কিন্তু ঘটাবদ্ধ জল নীলবর্ণ দেখা যায় না, উহাতে তরঙ্গ উঠা অসম্ভব; ফেণাও উহাতে কখনই হইতে পারে না। ঘটাবদ্ধ জল অল্প কালেই সমল হইয়া উঠে, সমুদ্রের জল তদ্রূপ হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বৃহৎ যদি ক্ষুদ্রে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে ক্ষুদ্রত্ব বশতঃই সে বৃহতের ধর্ম্ম হইতে অনেক অংশে পৃথক হইয়া যায়।

* The bodies of the higher animals which die may from this point of view be regarded as something temporary and nonessential destined merely to carry for a time the unicellular eggs.

Ray Lankester.

পরিমাণের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এ তাহাই। পরমাত্মা বৃহৎ, ঘট অর্থাৎ দেহ ক্ষুদ্র। পরমাত্মা ক্ষুদ্র ঘটাবদ্ধ হইলে সেই হেতুই উভয়ের মধ্যে কতিপয় ব্যবহারিক পার্থক্য উপস্থিত হইবে, যদিও উভয়ে একই। ক্ষুদ্রত্ব হেতু জীবাত্মা যে সমলতা প্রাপ্ত হইল তাহা শুদ্ধ করিবার উপায়-উপাসনা। যেমন সমল জল পরিষ্কার করিলে নির্ম্মল হয় তেমনই জীবাত্মা দেহাবস্থিতি বশতঃ সমলতা প্রাপ্ত হইলে উপাসনা দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং শুদ্ধ হইলেই পরমাত্মার সহিত একধর্ম্মী হইয়া তাহাতে লীন হইয়া যায়। যেন জলে জল মিশিয়া গেল।

সাঁঝের পল্লী

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নিবু-নিবু-প্রায় দিবসের আলো
নদীর পাড়ে,
পাতায় পাতায় আবির ছড়ায়
বাঁশের ঝাড়ে।

সুর-শিল্পীর চিত্রশালার
রংএর ভাণ্ড করি চুরমার
কোন্ দেবশিশু খেলে বসি নভে
সংগোপনে।

হাসিভরা তা'র মুখটী উজল
সাঁঝের তারায় করে জ্বল জ্বল,
ঝুম্‌ঝুমী তার বাজে ঝুম্ ঝুম্
ঝিল্লীসনে।

হোথা পল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে
আলোর কমল ফোটে থরে থরে,
মধুভরা মনে বধূ পাতে শেজ
বঁধুয়া তরে।

পাখী যেতে যেতে আপন কুলায়,
পূরবীর সুরে মৃদু গান গায়,
তরল আঁধারে আবছায়া রূপ
ধরণী ধরে।

গ্রাম পথ পরে রাখালেরা সব
গরু নিয়ে ফেরে করি কলরব,
হাটুরেরা সব হাট সেরে এল
দিনের পরে।

মাঠ হতে এসে দাওয়ার উপরে
কৃষক বসেছে হুঁকা হাতে করে,
বৌ তারে কয় মৌ-মাখা কথা
সোহাগ ভরে।

নিবিড় তিমির যবনিকা খানি
ধীরে ধীরে টানি সন্ধ্যার রাণী
ঢাকিল এবার নিখিল দৃশ্য
নিখুঁত করে।

লাখ জোনাকীর চুম্‌কী কেবল
যবনিকা পরে করে ঝলমল,
তারারা বিলায় স্নিগ্ধ আলোক
গগন পরে।



অস্তাচল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ, বি-এ

(৯)

মেজর ও অনি যখন বাসায় ফিরিলেন তখন রাত্রি প্রায় বারোটা। পথে একসঙ্গে একই গাড়ীতে আসিলেও মেজরের সঙ্গে অনির বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। অনি ভাবিয়া পাইতেছিল না—মেজরের সহসা এতখানি পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এই কয়েক দিন হইতে সে লক্ষ্য করিয়াছে, যেন সর্ব্বদা একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান মেজরের বুকে জমিয়া উঠিতেছিল। সে অভিমান অমূলক ও তাহার প্রতিকার-চেষ্টা অশোভন ভাবিয়া অনি তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহার গোপন অন্তরে মেজরের এমন একটা দাবী গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অনি নিজেই হাঁপাইয়া পড়িতেছিল।

মেজরের শয়নগৃহে আসিয়া অনি তাঁহার টীপয়ের উপর জল, সিগার ও স্মেলিং সল্টের শিশি গুছাইয়া রাখিতেছিল। মেজর কোন কথা বলিলেন না; কিন্তু অনির পরাজয়ের ভাবটা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় অল্প একটু হাসিলেন। সে হাসিতে গর্ব্বের একটু আভাস থাকিলেও তাহা যেন বেদনার ভারে ম্লান ও নিষ্প্রভ। মেজরের সেই হাসিটুকু চোখে পড়িতেই অনির মুখখানি যেন মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল ও লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজের সে দুর্ব্বলতা পাছে মেজরের কাছে ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে অনি নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া লইয়া বলিল—"মেজর! আপনার বোধ হয় একটু অভিমান হ'য়েছে? কিন্তু সেটা কি আমারই দোষ? আমি তো—"

অনির কথা শেষ হইতে না হইতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেজর পূর্ব্ববৎ উদাস ভাবেই উত্তর করিলেন—"দোষ কারো নয়। যেখানে অভিমান শুধু অপর পক্ষের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা নিয়েই ফিরে আসে, সেখানে অভিমান ক'র্‌বার মত প্রবৃত্তি কোন ভদ্রলোকের না থাকাই উচিত। অত বড় ট্র্যাজেডী জীবনে ব'য়ে বেড়া'বার দুঃসাহস যেন কারো না থাকে।"

নিজের তরফ্ হইতে মেজর অত্যন্ত হাল্‌কাভাবে এ সাফাই দিবার চেষ্টা করিলেও অনির বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহার ভিতর কতখানি গুরু ভার লুকানো আছে। ইহা মুহূর্ত্তে অনিকে একটু বিচলিত করিল; কিন্তু অনি সে ভাব সামলাইয়া লইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কহিল—"চিকিৎসা-বিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান যখন ঠিক্ এক জিনিষ নয়, তখন প্রথমটার সাহায্যে দ্বিতীয়টার সিদ্ধান্ত নির্ভুল না হ'তেও পারে। সমস্ত বিষয় ভাল ক'রে জান্‌বার আগে, অত বড় ভুলটা ক'রে ব'স্‌বেন না, ডাক্তার বাবু! নিজের দৈন্য আর অযোগ্যতার চাপে যার মাথা সর্ব্বদাই হেঁট হ'য়ে আছে, মহৎকে উপেক্ষা ক'র্‌বার স্পর্দ্ধা তার কোনো দিনই হ'তে পারে না। প্রতিদানের যোগ্যতা নেই ব'লে, সে যে নিজের আগুনে পলে পলে কেমন ক'রে পুড়্‌ছে, তা শুধু সেই জানে আর অন্তর্যামী জানেন। তারও হয় তো জীবনের প্রত্যেকটী কোণে উত্তাপের বাষ্প জমে' ওঠে। প্রতিদানের শক্তি যার প্রকৃতই নেই, তাকে সংকীর্ণ মনে ক'রবেন না মেজর!"

এই কয়েকটী কথার ভিতর দিয়া অনির গোপন অন্তরের ভাব এতই পরিস্ফুট হইয়া তাহার সমস্ত মুখ

চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল, যে, মেজর তাহা লক্ষ্য করিয়া সহসা যেন বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। মেজর যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা যে এত অধিক ভাবে তাঁহাকে জয়ের গৌরবে ভরিয়া দিবে তাহা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন নাই। এতখানি প্রত্যাশা করিবার সাহস তো তাঁহার ছিল না। বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মেজর করমর্দ্দনের জন্য অনির দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। অনি তাহা লক্ষ্য করিয়াও হস্ত প্রসারিত করিল না। মজ্জাগত সাহেবী কায়দার আদব লইয়াই মেজর অনির হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"মেনি থ্যাঙ্কস্ মিস্!"

অনির মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না; নিশ্চল পাথর মূর্ত্তির ন্যায় অনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত পা যেন তখন অসাড় হইয়া গিয়াছিল।

মেজর শুইয়া পড়িলে, অনি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আশঙ্কা ও নিরাশার প্রবল জোয়ার-ভাটায় তাহার সমস্ত অন্তর যেন তোলপাড় করিয়া উঠিতেছিল।

লাইব্রেরী ঘরের ভিতরে গিয়া অনি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একখানা চেয়ারের উপর অবশ ভাবে বসিয়া পড়িল। একটা চাপা কান্নায় তাহার বুকখানা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল; অনি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা দমন করিবার জন্য দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আজ যে ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণটা পাক খাইতেছিল, চিরসংযতা সেই দৃঢ়চিত্ত নারী কোন মতেই তাহা হইতে নিজেকে টানিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। অনি আঘাত করিয়াও আজ আর তাহার প্রাণকে সবল করিয়া তুলিতে পারিল না। আজ তাহার সারা অন্তর শুধু কাঁদিতে চাহে; চোখের জল যেন আজ বাহির হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। চিরাভ্যস্ত সংযমের বাঁধ ছাপাইয়া অবিরল ধারে অনির চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

বিছানায় পড়িয়া অনি অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিল, কিন্তু তাহার চক্ষে ঘুম আসিল না; আলোটা একটু বাড়াইয়া দিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে মাসিক পত্রিকাখানি টানিয়া লইয়া একটু পড়িবার উদ্দেশ্যে পাতা উল্টাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও সে মনোযোগ দিতে পারিল না। একটা চিন্তা তাহার সমস্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া ফিরিতেছিল; একটা অব্যক্ত গুরু ভার তাহার সারা মনটার উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। তাহার প্রতিকার নাই—সমাধান নাই। শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া অনি হলঘরের বড় জানালাটার পাশে আসিয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশের এপার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত যেন একখানা কালো মেঘের চাদরে ঢাকিয়া গিয়াছে—একটী তারাও দেখা যায় না। অনি আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল তাহার জীবনের কথা; কিন্তু তাহার নিষ্পিষ্ট হৃদয় কোন সমস্যাই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহারও এপার ওপার যেন এমনি একটা নিকষ-কালো পাথরের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন দাদুর যে কয়েকটী কথা তাহার মনে একটা অবলম্বন আনিয়া দিয়াছিল, আজ আর অনি যেন তাহার মধ্যে কোন সোয়াস্তি খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ফিরিয়া ফিরিয়া অনির মনে হইতে লাগিল—'এ তো দাদুর আদেশ হইতে পারে না; যুদ্ধ শ্রান্ত দাদু নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। দাদু তো দুর্ব্বল ছিলেন না; জীবনের স্থির সিদ্ধান্ত তো দাদু কখনই পরিবর্ত্তন করেন নাই। দাদুর আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে মর-জগতের সীমা-বদ্ধ গণ্ডীর বাঁধ ছাপাইয়া চলিত।'

আলোটি নিভাইয়া দিয়া অনি কৌচের উপর শিথিল ভাবে বসিয়া পড়িল। বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ তখন যেন প্রলয়ের ভীষণ মূর্ত্তিতে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর নিস্তব্ধ বুকে মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। ঝড়ের সাঁ সাঁ শব্দে প্রকৃতির সমস্ত বুকখানা যেন দুলিয়া উঠিতেছিল। অনি স্থির দৃষ্টিতে সেই গাঢ় অন্ধকারের পানে চাহিয়া তাহার শূন্য জীবনের পথ খুঁজিতেছিল। কিন্তু সেখানে তাহার কোন সঙ্কেত নাই—কোন ইঙ্গিত নাই। ঝড় যেন শুধু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া তাহার অতীত জীবনের জীর্ণ স্মৃতির পাতাগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহারই চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

বিহ্বল চিত্তে অনি বইখানিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঠাকুর, আমায় পথ বলে' দাও—শক্তি দাও প্রভু!"

* * *

উন্মত্ত বাদলের পথ-ভ্রান্ত ধারা আসিয়া অনির অনাবৃত মুখ চোখকে সিক্ত করিয়া দিতেছিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন তাহার ছিল না।

(১০)

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া মেজর যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখনও তাঁহার ঘুমের নেশা সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই। মেজরের শয়ন-গৃহ ও লাইব্রেরীর মাঝখানে যে প্রকাণ্ড হল্‌টা ছিল, সেইটাই ছিল উপরের কয়েকখানি ঘরের সাধারণ পথ। শয়ন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হল্‌ঘরের মধ্যে আসিয়াই মেজর যেন থমকিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার পাশে বড় কৌচটার উপর শুইয়া অনি তখনও ঘুমাইতেছিল। অনির এরূপ ভাবে এখানে ঘুমাইয়া পড়িবার কোন কারণ তিনি ভাবিতে পারিলেন না। অনিকে এরূপ শ্লথভাবে শুইয়া থাকিতে মেজর কোন দিনই দেখেন নাই। শিথিল বইখানি তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বর্ষণ-ধৌত আকাশের নির্ম্মল স্নিগ্ধতা মাখিয়া প্রভাত-সূর্য্যের সদ্যোজাত রাগরাশি আসিয়া অনির সর্ব্বাঙ্গকে যেন প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। যে অনিকে নিবিড় ভাবে ঘিরিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি পুঞ্জীভূত ব্যগ্রতায় উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল, তাহার ভিতর এত অপরূপ সৌন্দর্য্যের সন্ধান যেন মেজর কখনই পান নাই। তাঁহার তন্দ্রা-বিমূঢ় হৃদয় একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া নিমেষে তাঁহার সমস্ত অগ্রপশ্চাৎকে যেন ডুবাইয়া ফেলিল। নিজের অজ্ঞাত-সারেই মেজর ধীরে ধীরে গিয়া অনির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সমস্ত বুকখানা যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

* * *

সহসা নাসাগ্র ও ওষ্ঠে একটা উষ্ণ-স্পর্শ অনুভব করিতেই অনি ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিল। চকিতে, মেজরকে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ক্রোধে, ঘৃণায়, দুঃখে আত্মহারা হইয়া অনি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মেজর! আপনাকে বিপন্নের আশ্রয়দাতা ব'লে শ্রদ্ধা ক'রেছিলুম্; তাই নিঃসঙ্কোচে আপনার মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস ক'রে এই অনাথা বিধবা আপনার আশ্রয় নিয়েছিল; স্বপ্নেও ভাবিনি—আপনি—"

অনির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। দুই হাতে মুখখানাকে ঢাকিয়া, অনি উচ্ছ্বসিত রোদনের ভারে লুটাইয়া পড়িল।

"অনি বিধবা!" একখানা চাবুক মেজরের বুকে দারুণ আঘাত করিয়া, তড়িৎ-প্রহারের ন্যায় তাঁহাকে অসাড় করিয়া দিল। তাঁহার হাত পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা কি বলিতে গিয়া তাঁহার ঠোঁট দুখানি শুধু বিকৃত ভাবে একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। কোন কথা বলিবার শক্তি তখন তার ছিল না। মরার মত অসাড় ও বীভৎস দৃষ্টিতে বারেক শুধু অনির দিকে চাহিয়াই, মেজর টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আলমারির কোণে সজোরে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির হইল, কিন্তু তাহা অনুভব করিবার মত অবস্থা তখন তাঁর ছিল না।

* * * *

মেজর চলিয়া যাইবার পরেও অনি কতক্ষণ ধরিয়া যে সেই কৌচের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়াছিল, তাহার ঠিক্ নাই। ভাগ্যহীন জীবনের কোথাও সে কোন কূল কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। আজকার হারানোর ব্যথা যেন তাহার অতীতের সমস্ত হারানোকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে যাহা হারাইয়াছে তাহার জন্য নিজেকে সান্ত্বনা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ইহার ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণের আশা নাই, অতীত-স্মৃতির কোন গৌরব থাকিবে না; সব কিছু সম্বল যেন একটা কালিমায় ডুবিয়া গিয়াছে। অনির ইচ্ছা হইতেছিল—আত্মহত্যা করিয়া তাহার নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছিয়া ফেলিতে।

অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া অনি ধীরে ধীরে তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে উঠিয়া আসিল। তাহার হাত পা তখনও এত শ্লথ ও অসাড় হইয়া ছিল যে, তাহার মনে হইতেছিল—সে বুঝি পড়িয়া যাইবে। একটা তীব্র বিষ

যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গকে জর্জ্জরিত করিয়া শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

অনি কি করিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। পৃথিবীতে তাহার এমন কোনো আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, যাঁহার কোলে মুখ গুঁজিয়া সে একটু শান্তি পায়। সহসা বনবিহারী বাবুর কথা মনে হইতে অনি যেন একটু ভরসা পাইল। বনবিহারী ব্যতীত আর কোন পরিচিতের কথা সে ভাবিয়া পাইল না। আজ অনির মনে হইতেছিল বটে, তাহার সেই হরিৎদা, কালিদাস-দা প্রভৃতির কথা; কিন্তু অনি তো আজ আর তাঁহাদের কোন সন্ধানই জানে না। সে আজ সুদীর্ঘ বারো বৎসর পূর্ব্বের কথা। নিরঞ্জনদা তাহাদিগকে কাশীতে দাদুর কাছে রাখিয়া বলিয়াছিলেন—"মা, বিপদে সম্পদে ছেলেদের কথা ভুলে যাবেন না"। নিরঞ্জনদার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। মা বাঁচিয়া থাকিতে নিরঞ্জনদা কয়েকবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর হইতে অনি তো এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদের কোন খোঁজ-খবরই পায় নাই। তখনকার সেই ছাত্র-নিরঞ্জনদা আজকার কর্ম্মজীবনে কোথায় সরিয়া গিয়াছেন—সে সন্ধান তাহাকে কে দিবে! কর্ত্তব্য আর নিষ্ঠা দিয়া গড়া কি সে সুন্দর নির্ভীক্ প্রকৃতি ছিল—নিরঞ্জনদার! তিনিও মানুষ—মেজরও মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের কি আকাশ পাতাল প্রভেদ!

মেজরের আশ্রয়ে থাকিতে অনির আর এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হইল না; অনির সমস্ত অন্তর ঘৃণায় মেজরের উপর বিরূপ হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি বনবিহারী বাবুর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, অনি তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য বসিল! কিন্তু হঠাৎ কি ভাবিয়া সে আর একটী বর্ণও লিখিতে পারিল না। বনবিহারী বাবুকেও আর তখন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। জীবনে ভোগের মাত্রাকে বাড়াইয়া চলিবার জন্য যাহারা পিতা পিতামহের চিরাচরিত প্রথাগুলিকেও ঘৃণা করিয়া পায়ে দলিয়া যায়, তাহাদের কাহাকেও হয় তো বিশ্বাস করা যায় না; অন্ততঃ অনি সে শক্তি ও সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষতঃ এই সকল সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ধ্বজাধারীদের উপর অনির সারা অন্তর যেন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই সব সম্ভ্রান্ত ও সুসভ্য সমাজের আদর্শ যাঁহারা, তাঁহাদের অধঃপতন অসভ্য ও অনার্য্যদের অধঃপতনের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। অনার্য্যের অধঃপতিত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিকে বলে না পারিলেও কৌশলে আয়ত্ত করা যায়; বুদ্ধি ও মানসী বৃত্তির দুর্ব্বলতা তাহাকে অনেকটা শক্তিহীন করিয়া রাখে; সে ছলনার জাল পাতিতে পারে না। কিন্তু এই সুসভ্য সমাজের প্রশস্ত ছায়ার তলে থাকিয়া যাহাদের পাপবৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাদের বিষাক্ত অন্তর বাহিরের ছদ্ম রূপে আত্মগোপন করিয়া থাকে। সুযোগ-মত সর্ব্ববিধ দুরভিসন্ধির অব্যর্থ বাণপ্রয়োগে তাহারা সিদ্ধহস্ত। অনার্য্য দস্যু অন্তর-বাহিরে দস্যু, আর সুসভ্য পিশাচ 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া অনি নিশ্চলভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল—সে কি করিবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল না। বনবিহারী বাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা অনি যখন তাঁহার পিছনে সুলতার শান্ত ও পবিত্র ছবিখানি দেখিতে পাইল, তখন আর তাহার সন্দেহের তিল মাত্র অবসর রহিল না। সুলতার কথা মনে হইতেই অনি যেন একটু আশার সন্ধান পাইল।

মনের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অনি বনবিহারী বাবুকে পত্র লিখিল। বেশী কথা লিখিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে কেবলমাত্র লিখিল—

"বন-দা, দয়া করিয়া একবার আসিবেন; ঠিক যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই। আশা করি ভগিনীর এ অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।"

ইতি—

ভাগ্যহীনা অনি।

বেয়ারার হাতে পত্রখানি দিয়া অনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ মোগলসরাইএর ডাক্তার বাবুর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু পূর্ব্বের মত ঠিক্ যেন আর আদেশ করিতে পারিল না। মোগলসরাইএ যাইবার রেল ভাড়াও অনি তাহার হাতে দিল।

তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বেয়ারা শিউ

কিষণ্ একবার মাত্র অনির মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহার হইল না।

(১১)

সন্ধ্যার গাড়ীতে সুলতা ও বনবিহারী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনির পত্রে সকল বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে না পারিয়া, এবং বেয়ারার নিকট হইতেও সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে না পারিয়া বনবিহারী একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ অনির সহসা ঐরূপ 'বনদা' সম্বোধন যেন হঠাৎ তাঁহার বোধ ও চিন্তাশক্তিকে ঘোলা করিয়া তুলিয়াছিল।

মেজরের ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া বনবিহারী সুলতাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর অনির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। অনি তখনো নিশ্চলভাবে চৌকীর এক পাশে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার মুখ চোখ দেখিয়া বনবিহারী সহসা চম্‌কাইয়া উঠিলেন; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হঠাৎ তাঁহার সাহস হইল না। মনে হইল একটা প্রবল ঝড় যেন অনির সব কিছুকে ওলটপালট করিয়া দিয়া গিয়াছে।

অনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বনবিহারীর পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বনবিহারী ইহাতে অনেকখানি আশ্চর্য্য হইলেন। অনিকে এরূপ ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে তিনি পূর্ব্বে কখনো দেখেন নাই। সুলতাকে কাছে টানিয়া লইয়া অনি তাহার হাতখানি কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখ হইতেই কোনো কথা বাহির হইল না।

হয় তো মেজরের কোনরূপ বিপদ হইয়াছে,—এই আশঙ্কা হইতেই বনবিহারী বাবু বলিলেন—"মেজরকে দেখ্‌ছি না যে অনি! তিনি কি বেরিয়ে গেছেন? এখন বেশ ভাল আছেন তো?"

অনি সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"আমার নিজের একটা কাজের জন্যে আপনাকে ডেকেছি দাদা। আপনি দয়া ক'রে আমার জন্যে একটু কষ্ট স্বীকার ক'রবেন কি?"

"নিশ্চয় অনি, তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বার সুযোগ পেলে' বরং সুখীই হব। সে বিষয়ে এত ফর্‌ম্যাল ভাবে তোমার বল্‌বার কোন দরকার নেই। কি ক'রতে হবে বলো—"

অনি বলিল—"আমায় কোলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌তে হবে আপনাকে, আজই রাত্রের ট্রেনে।"

বনবিহারী বাবু ভিতরের অবস্থা তখনো ঠিক উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না; অথচ অনির মুখ চোখের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"তোমায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো নিশ্চয়ই; তবে চাকরী-জীবী যারা, তারা তো হঠাৎ ইচ্ছা ক'রলে কোথাও যেতে পারে না—দিদি। আমাকে ছুটি মঞ্জুর করানোর জন্যে অন্ততঃ একটা দিন সময় দিতে হ'বে। কা'ল রাত্রের ট্রেণে রওনা হ'লে তেমন ক্ষতি হবে কি কিছু?"

"না ক্ষতি কিছু নেই; তবে—" বলিয়াই অনি দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া একটু ভাবিয়া লইয়াই যেন বেগে বলিয়া উঠিল—"কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয় দাদা!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনি মুখ নীচু করিয়া সুলতার হাতের চুড়ি কয়গাছি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল।

ব্যাপারটা বনবিহারী বাবুর কাছে একটা হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইলেও, তিনি ভদ্রতার অনুরোধে অনিকে বলিলেন—"তবে, এই একদিনের জন্যও অন্ততঃ, তোমাকে আমার পর্ণকুটীরে থাকতে হবে; তার মধ্যেই আমি ছুটির ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌বো। কেমন! তাতে রাজী আছ তো?"

সুলতার সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিবার যোগ্যতা ছিল না; কিন্তু অনির আতিথ্য গ্রহণের কথা শুনিয়াই সানন্দে তাহার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল—"তাই ভালো, দিদি, আমাদের ওখানেই চলুন; এক্ষুনি।"

অনি ঔদাসভাবে উত্তর করিল—"হাঁ; তাই যাবো বোন্।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুলতা আবেদনের দৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখপানে চাহিল। পত্নীর সরল দৃষ্টিটুকুর অর্থ বুঝিলেও, স্বামী তাহাতে কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না।

বনবিহারী বাবু অনুমান করিলেন—বোধ হয় মেজরের

সহিত অনির কোনরূপ মনোমালিন্য হইয়াছে, যাহার জন্য অনি আর এখানে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছুক নহে।

মেজর তখনো ফিরিয়া আসেন নাই। অনি সাড়ে সাতটার গাড়ীতে এখান হইতে রওনা হইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু একটু বিশ্রাম করিয়া লইবার অছিলায় বনবিহারী বাবু পরের ট্রেণ ধরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে না পারিলেও বনবিহারী মেজরের গৃহ হইতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে অনিকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না তাহা ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অথচ অনির যেটা একমাত্র প্রার্থনা জানিয়াই তিনি নিজে হইতেই তাহার পূরণের ভার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা এড়াইয়া চলিবার কোন পথও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

রাত্রি নয়টার মধ্যেও মেজর ফিরিলেন না দেখিয়া বনবিহারী অনিকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সুলতা এতক্ষণ জিনিষপত্র গুছাইবার ধূমধামের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে, কি কি গুছাইতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য, অনির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু অনি সে বিষয়ে পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্ট থাকিয়াই উত্তর করিল—"কিচ্ছু না।"

বনবিহারী ও সুলতা উভয়েই যেন অনির ভাবগতিক দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গূঢ় রহস্য আছে! সে কথা অনুমান করিলেও কেহই সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিলেন না।

নিজের কয়েকখানি কাপড় ও খানকয়েক বই এবং খাতাপত্র—যাহা লইয়া অনি তিন মাস পূর্ব্বের এক মধ্যাহ্নে আসিয়া এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই কয়টীকে মাত্র আবার তাহার পুরানো বেতের ছোট্ট বাক্সটির মধ্যে গুছাইয়া লইয়া অনি বাহির হইল।

ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ ও প্রতি স্থানটি এই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অনির এত আপনার হইয়া উঠিয়াছিল যে আজ এক নিশ্বাসে ছাড়িয়া যাইবার ভিতরেও সে সবের আকর্ষণে যেন অনির চোখ দুইটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। হল্‌ ঘরের ভিতরে যেখানে দেওয়ালের উপর মেজরের বড় ফটোগ্রাফখানা ঝুলিতেছিল, সেখানে আসিয়াই অনির পা দুইটি যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই বারেকের জন্য থামিয়া গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার চোখ দুইটিকে মাটির দিকে নামাইয়া রাখিয়া অনি দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

বনবিহারী ও সুলতা তখন গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছেন। অনি নীচে আসিয়া বয় ও বেয়ারার হাতে একটা করিয়া টাকা দিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইল। অশিক্ষিত ও সরল চাকর দুইটির মুখে কোন কথাই বাহির হইল না; তাহারা শুধু অনির মুখের পানে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

* * *

মোটর ছাড়িয়া দিতেই সুলতা অনির হাতখানাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল: "দিদি, তুমি যে এক নিমিষে ঝড়ের মত সব কিছু ছেড়ে কোলকাতায় পালাতে চাচ্ছ কেন, তা ভেবে পাচ্ছি নে।"

অনি সস্নেহে তাহার মাথাটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ঘূর্ণীর স্রোতে ও ঝড়ের ঝাপ্‌টায় যে সব আল্‌গা ঘাস পাতা বা আলাদা আলাদা জিনিষ এক জায়গায় এসে মেশে, তাদের ছাড়াছাড়িও হ'য়ে যায় আবার অমনি একটা ঝড় কিম্বা ঘূর্ণীর ভিতর দিয়ে। যারা গোড়াগুড়িই পৃথক ও আলাদা, তাদের একতা তো কখনই স্থায়ী হ'তে পারে না দিদি। মানুষের জীবনেও ঠিক্‌ তাই ঘটে, এতে ভাব্‌বার বা জান্‌বার কিছুই নেই বোন্‌।"

বনবিহারী অবাক্‌-বিস্ময়ে অনির মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। যাহার সব কিছু জানিবার জন্য মনে অদম্য একটা আগ্রহ হয়, তাহাকে সম্মুখে পাইয়া তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিতেও যেন একটা সঙ্কোচ আসে। সেটা লজ্জা না দুর্ব্বলতা তাহা ঠিক্‌ বলা যায় না।

ট্যাক্সি যখন ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া হইয়াছে। যে বেনারস ছাড়িয়া যাইবার জন্য অনি এতক্ষণ উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, সেই বেনারস ছাড়িয়া যাইতেও অনির মনটা এইবার কাঁদিয়া উঠিল।

(১২)

দুই দিন পরে মেজর যখন বাংলোয় ফিরিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। একটা ভীষণ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যেন তাঁহার যাবতীয় সমৃদ্ধি এই

দুই দিনের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ঝড়-গোহালো একটা পঙ্গু ও অবসন্ন কাকের মত অবস্থায় মেজর বাহিরের ফটকটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভিতরে আসিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না। তাঁহার সমস্ত শরীর তখন মৃতের ন্যায় বিকৃত ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। কোটর-গত চক্ষু দুইটীকে দেখিলে হয় তো মনে হয় ক্ষীণ নিষ্প্রভ জীবনীশক্তি এখনো বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সে দৃষ্টি এমনই ঝলসিয়া গিয়াছে, যে, তাহাকে আর দৃশ্য জগতের আলোকের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যায় না।

একটা অতর্কিত ভূমিকম্প অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলভাবে সব ওল্‌ট পাল্‌ট করিয়া দিয়াছিল, যে অল্প-বুদ্ধি বেয়ারা ও বয় বেচারীরা তাহার কোন সূত্রই খুঁজিয়া পায় নাই। অনি চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব হইতে মেজরকে অনুপস্থিত দেখিয়া ও অনির ওরূপভাবে চলিয়া যাইবার কোন কারণ ভাবিতে না পারিয়া তাহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ শিউ-কিষণ; সে চাকর হইলেও তাহার সেবার ভিতর দিয়া অনি ও মেজরকে সে বিশেষ স্নেহ করিত। মায়িজী কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, ডাক্তার সাহেবও দুই দিনের মধ্যে কুঠীতে ফিরিলেন না: শিউকিষণ সত্য সত্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মেজরকে গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভগ্‌লু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম দিল ও এক নিশ্বাসে অনেক অভিযোগ ও অনুযোগ শুনাইয়া ফেলিল। মেজর নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন কি না বলা যায় না।

সহসা মেজরের মুখ-চোখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বয় আতঙ্কে থামিয়া গেল। মেজরের তখনকার চেহারা দেখিয়া তাহার অনুমান করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না যে তাঁহার পুনরায় সেইরূপ একটা কঠিন অসুখ হইয়াছে। সরল-চিত্ত হিন্দুস্থানী কিশোর ব্যথিত হৃদয়ে প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মেজর পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন; কোনো কথা বলিতে বা কোনো আদেশ করিতে পারিলেন না।

অনির চলিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়াও ডাক্তার নিঃসঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার নিজস্ব অধিকার এই ঘর-বাড়ী, তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত আজ্ঞাবহ ভৃত্য ভগ্‌লু ও শিউকিষণ—সব কিছুই যেন আজ বিধ্বস্ত জীবনের তটভূমি হইতে সুউচ্চ পর্ব্বতশিখরের মত মনে হইতেছিল। যে পদ-সেবী ভগলু ও কিষণের অস্তিত্ব তাঁহার নিকট কখনো কোন বিশিষ্টতা লইয়াই দাঁড়াইতে পারে নাই, এমন কি যাহাদিগকে কখনো সমতলবর্ত্তী ভাবিতেও তাঁহার ঘৃণা হইত, সেই বয় ও বেয়ারার পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার সাহস পর্য্যন্ত আজ আর মেজরের নাই। তাঁহার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতেছিল হয় তো তাহারাও আজ অন্তরের সেই দুর্গন্ধময় ক্ষত দেখিয়া ফেলিবে। অপ্রকাশিত গোপন পাপও পাপীর শিরকে নত করিয়া রাখে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত নিজের বশ পদদ্বয়কে কোন রূপে টানিয়া লইয়া মেজর উপরের ঘরে উঠিলেন। অনি না থাকিলেও, তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির সম্মুখ হইতেও নিজেকে গোপন রাখিবার জন্য আজ যেন মেজর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চোরের মত নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অতি বড় শত্রুও যাঁহাকে কোন দিন ধর্ম্মভীরু বলিয়া অপবাদ দিতে পারিত কি না সন্দেহ, খেয়ালের ঘূর্ণাবর্ত্তে যাঁহার আত্মপ্রবৃত্তি বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও কখনো দ্বিধাবোধ করে নাই, আজ গোপন-বৃত্তির সংঘর্ষে তাঁহার সমস্ত অন্তরে যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কৌচের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজর বলিয়া উঠিলেন—"ভগবান, জানি না তুমি আছ কি না; যদি থাকো, আমায় শান্তি দাও।" নাস্তিকতার ঝুলিতে তখন পরাজয়ের গ্লানি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল।

পেখমের সৌন্দর্য্যে উৎফুল্ল ময়ূর যেমন সহসা তাহার কুৎসিত চরণ দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠে, নিমেষে তাহার সকল নৃত্য থামিয়া যায়, মেজরও সেইরূপ আজ তাঁহার দৃপ্ত জীবনের পঙ্কিলতাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এতদিন তিনি নিজেকে চিনিতে পারেন নাই। ছদ্ম মহত্ত্বের ভিতর যে পাপ লুকাইয়াছিল, মেজর আজ তাহার স্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। এতকাল, শুধু এ বিশ্বকে ভোগের বাসর মনে করিয়া, তাহার অগ্রপশ্চাৎ চাহিয়া দেখিতে তিনি কখনই চেষ্টা করেন নাই। মহত্ত্বের আদর্শে

যাহাকে বিপন্ন বলিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, ভোগের দুয়ারে তাহাকে বলিদান করিয়া সে আদর্শের পূর্ণাহুতি হইয়াছে। জীবনপথে যাহারা একে একে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক জীবনটীকে কিরূপে ব্যর্থ করিয়া পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন, আজ আর সে কথা ভাবিয়া দেখিবার মত একবিন্দু শক্তিও মেজরের বুকে নাই। অন্তরের সেই সব অনাদৃত অনুভূতি আজ তাঁহার অচঞ্চল শান্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাণের সে শান্তি, হৃদয়ের সেই অসমসাহসিকতার তেজ বিপ্লবের আগুনে ছাই হইয়া গিয়াছে। এ আগুন বুঝি আর নিবিবে না।

আজ আর মেজর নিজেকে সান্ত্বনা দিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। যে সব মহত্ত্বের গৌরব লইয়া নিজেকে অনেকবার সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মেজর নিজেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। নিজের দারুণ ক্ষুধাই যে এতকাল মহত্ত্বের রূপ লইয়া প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে, সে কথা মেজর কোনো দিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অনিকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন; তাহার বিপন্ন অবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া, না—তাহার দেহসম্ভারের পরিপূর্ণতায় প্রলুব্ধ হইয়া, সে কথা আজ যেন তিনি অন্তরে অন্তরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। কিন্তু কে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে! জীবনের পথে কত অসহায় বিপন্ন পথিক আর্ত্তনাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—কৈ? তিনি তো কাহারো সন্ধান রাখেন নাই! জীবনের ইতিহাসে আজ কোনো পাতায় এমন একটী উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, যাহার গৌরব অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

যে অনিকে কেবল মাত্র আশ্রয় দিয়া তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার রোগশয্যায় সেই অনির সেবা যে তাঁহার সে অনুগ্রহের ঋণকে ছাপাইয়া তাঁহাকেই ঋণী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"তাহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।" তাই অনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে তো কোন দিনের জন্যও তাঁহার আশ্রয়ের ভিখারিণী হইয়া আসে নাই।

ইদানীং বনবিহারীর উপর মেজরের একটা অযথা আক্রোশ গড়িয়া উঠিয়াছিল; হয় তো বনবিহারীর জীবনে তাহার ছায়াপাতও হয় নাই। অনি বনবিহারীর সহিত যে-রূপ অবাধে তর্ক ও আলোচনা করিত, তাহা মেজরের আদৌ ভাল লাগিত না। বনবিহারীর সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা রাখাটা তিনি মনে মনে সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই, বনবিহারীর আসা যাওয়া ও আহ্বান-অভ্যর্থনা-গ্রহণ তাঁহার পছন্দ হইত না। যতবার তাঁহার মনে হইয়াছে অনি বনবিহারীর সহিত অধিক আগ্রহে মেলামেশা করিতেছে, ততবারই তিনি মনে মনে যাচাই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—'অনি কাহার নিকট অধিক উপকৃতা ও ঋণী? বনবিহারীর দাবী তাঁহার অধিকারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।' কিন্তু কিসের এই দাবী? আজ নিজের কাছে এ প্রশ্নের জবাবদিহি করিতেও মেজরের মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছিল।.....কিন্তু অনি তো কোন দিনের জন্যও বলে নাই যে সে বিধবা। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অনি অযথা কোন বিষয় উত্থাপন করা পছন্দ করিত না; অকারণ কৌতূহলকেও অনি কখনো পরিতৃপ্ত করে না। অনি বিধবা কি সধবা—সে প্রশ্ন তো তিনিও কখনো করেন নাই। করিলেও হয় তো কোন ফল হইত না। অনির বিপন্নতাকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন,—সে বিধবা, না কুমারী তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন তো তাঁহার ছিল না। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া মানে কি তার যৌবনকে হাতে পাবার প্রচ্ছন্ন লালসা!

সারাদিন মেজর শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। শান্তির কোন সন্ধান তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। বয় ও বেয়ারা অনেকবার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহাদের হয় নাই। সমস্ত বাড়ীটাই যেন একটা বেদনার নিস্তব্ধতায় থম্ থম্ করিতেছিল। বেলা শেষ হইয়া আসিল, মেজর তবুও ঘর হইতে বাহির হইলেন না; নিঝুম হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। রাজপথ হইতে কর্ম্ম প্রত্যাগত কুলীদের কোলাহল ভেদ করিয়া একটা অসংলগ্ন গজলের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। কোন শ্রান্ত কুলী তখন মাতাল হইয়া গাহিতেছিল—

হরবকৎ ইএ পিয়ালা মে
দিল্ করে মস্‌গুল।

ইমারৎ ইএ জান্ বাগিচায়
তান্ ধরে বুল্ বুল্।

ভাঙা ভাঙা গানের শব্দগুলি মেজরের কাণে যাইতেই, তিনি বিছানার উপর একবার উঠিয়া বসিলেন। ঐ নিরন্ন দিন-মজুরদের প্রাণের আনন্দটুকুও আজ যেন তাঁহার নিকট বড় লোভনীয় বস্তু। চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তিনি জানালার ধারে আসিয়া বসিলেন। আর একদল কুলী তখন খুব হল্লা করিতে করিতে গাহিয়া চলিয়াছিল—

"তাজা চুয়া মিঠা দারু
পিয়ো পিয়ো রে মেরি জান্।
দিল্‌ভি আচ্ছা হোগা সাচ্চা
টুট্ যাওয়ে হায়রাণ্॥"

মেজর কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলেন; ঐ নিরন্ন কুলীদের আনন্দ-গান যেন তাঁহার বুকের ব্যথাকে গোপনে কিসের ইসারা করিয়া গেল।

(১৩)

অনি ও সুলতাকে সঙ্গে করিয়া বনবিহারী কলিকাতায় আসিলেন। ভবানীপুর—চন্দ্রমাধব ষ্ট্রীটে—তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উঠিবেন বলিয়া বনবিহারী পূর্ব্বেই তাঁহাকে তার করিয়া দিয়াছিলেন।

* * *

অনির পিসিমা, মোক্ষদাসুন্দরী, বাগবাজারে—বোসুপাড়া লেনে থাকিতেন; তাঁহার স্বামী গোপীমোহন ছোট আদালতের উকিল। মোক্ষদাসুন্দরী রাধাকিশোরের সহোদরা ভগিনী না হইলেও, রাধাকিশোর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি মোক্ষদার খোঁজ খবর ও তত্ত্বতল্লাস করিতে কখনো ত্রুটি করেন নাই। গোপীমোহন যখন প্রথমে হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। রাধাকিশোর মফঃস্বল হইতে মক্কেল সংগ্রহ ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে কখনো কোনরূপ কৃপণতা করেন নাই। ভগিনীপতি গোপীমোহন তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। অনির পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন মোক্ষদা ও গোপীমোহন অনেকবার অনিকে কলিকাতায় আনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া রাধাকিশোরের একমাত্র কন্যা অনিই যে তাঁহাদের সর্ব্বস্নেহের একমাত্র আধার সে কথা মোক্ষদাসুন্দরী বহুবার ঘোষণা করিতে বাকী রাখেন নাই।

* * *

বনবিহারীকে সঙ্গে করিয়া অনি পরদিন বিকালে পিসিমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাগবাজারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনির ইচ্ছা ছিল যে পর্য্যন্ত সে কলিকাতায় কোনরূপ উপার্জ্জনের সংস্থান না করিতে পারে, পিসিমার আশ্রয়েই থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে; যদিও মাতার ও দাদুর মৃত্যুর পর অনি নিজের বিপন্ন অবস্থার কথা জানাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতির সাড়া না পাইয়া সে আশা অতি ক্ষীণভাবেই পোষণ করিয়াছিল।

গোপীমোহন তখন আদালত হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় তামাক ও গল্পের আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। ছোট আদালতে তাঁহার যে বেশ প্রসার-প্রতিপত্তি জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা গোপীমোহনের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই অনুমান করা যায়। অনি তাহার কৈশোরে যে অবস্থায় গোপীমোহনকে দেখিয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহা মিলাইয়া লইয়া তাঁহাকে সহসা সে চিনিয়া উঠিতে পারিল না।

অনির বিস্তৃত পরিচয় শুনিয়া গোপীমোহন বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাধাকিশোরের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বিপন্ন জীবনের কাহিনী শুনিয়া গোপীমোহনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল পত্র দিয়াছিল, তিনি তাহার একখানির কথাও জানিতেন না। গোপীমোহন আদালতে থাকিবার কালে যে সব পত্র আসিত, মোক্ষদাসুন্দরী তাহা খুলিয়া দেখিতেন। অতি সরল ও উদার-প্রকৃতি স্বামীর উপর মোক্ষদাসুন্দরী এরূপ নিপুণ-ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিতেন যে স্বামীর মার্জ্জিত ওকালতি বুদ্ধিও সব সময় তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। গোপীমোহন সমস্ত বুঝিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। মোক্ষদাসুন্দরী পরিপূর্ণ রূপে অসুন্দরী হইলেও, তাঁহার বিষয়ে স্বামীর বেশ একটু দুর্ব্বলতা ছিল।

অনির হাত ধরিয়া গোপীমোহন অন্দরে আসিয়া হাজির হইলেন। মোক্ষদা তখন পাচকের নিকট মধ্যাহ্নের লবণ তৈলের হিসাব বুঝিয়া লইয়া, সায়াহ্নের সরঞ্জাম মঞ্জুর করিতেছিলেন। সহসা স্বামীর পশ্চাতে নবাগতা একটী মহিলাকে দেখিয়া তিনি যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। মোক্ষদার অন্দরে কালে-কস্মিনেও কোন অতিথির শুভাগমন হইত কি না সন্দেহ। প্রতিবেশিনী মহিলারাও নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কখনো মোক্ষদার নিকট আসিতেন না। মোক্ষদা বিরক্তি-পূর্ণ মুখে ভ্রূ দুইটীকে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বক্রদৃষ্টিতে অনির আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইলেন।

গোপীমোহন বাড়ী ঢুকিয়াই আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ওগো—দেখছো, কে এসেছে! এই যে অনু, আমাদের রাধুর মেয়ে।"

অনি মোক্ষদাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

মোক্ষদা যেন অবাক্ হইয়া বলিলেন—"কোন্ রাধু! কোথাকার!!"

কথাটা অনির বুকে খচ্ করিয়া বিঁধিল। মোক্ষদা তাহারই পিসিমা!

স্বামীর মুখে সকল কথা শুনিয়া মোক্ষদা যেন অতি কষ্টে একটা ক্ষীণ স্মৃতিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"ওঃ; আহা! বেশ! বেশ! এখানে কোথায় থাকো মা?"

স্ত্রীর কথায় একটু লজ্জিত হইয়া গোপীমোহন তাড়াতাড়ি পত্নী-পক্ষের অভ্যর্থনার ত্রুটিটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্য বলিয়া উঠিলেন—"দেখ দেখি, আমরা থাক্‌তে মা আবার থাক্‌বে কোথায়! ও তো মাত্র কা'ল এসেছে। রাত্রে এসে কোথায় বাসা খুঁজে বেড়াবে, সেই জন্যে কা'লই এসে এখানে উঠতে পারে নি। ঐ যে ভদ্রলোকটী এসেছেন, ওঁর বাসাতেই বুঝি উঠেছ মা? উনি বোধ হয় তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক?"

অনি সংক্ষেপে উত্তর করিল—"হাঁ; ওঁর বাসাতেই আমি আছি।"

মোক্ষদার মুখ চোখের ভাব ও অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে অনির পিত্ত প্রায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি তাহার অত বড় বিপদের সংবাদ পাইয়াও কোন খোঁজ-খবর করেন নাই, উপরন্ত স্বামীকে সে সকল সংবাদ পর্য্যন্ত জানিতে দেন নাই, সেই পিসিমার নিকট হইতে অনি ইহার বেশী বিশেষ কিছু আশা করিতে পারে নাই। তবুও সে আসিয়াছিল, তাহার আশ্রয়ের নিতান্ত অভাব বলিয়া। প্রয়োজন হইলে, অনি নিজের খোরাকী দিয়াও সেখানে থাকিতে পারে; কিন্তু এখন আর সে প্রবৃত্তি রহিল না।

"তবে আসি পিসি মা!" বলিয়া অনি মোক্ষদাকে আর একবার প্রণাম করিল; অন্তরে ঠিক ভক্তি ছিল কি না বলা যায় না। গোপীমোহন দাঁড়াইয়া পত্নীর রায় শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মোক্ষদার অভ্যর্থনা দেখিয়া তিনি সত্যই লজ্জিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন; কিন্তু কোন কথা বলিবার ইচ্ছা বা সাহস তাঁহার হইল না।

মোক্ষদা চক্ষু দুইটিকে ঈষৎ মুদ্রিত করিয়া, গাল-ভরা দোক্তা-পানের কিঞ্চিৎ রস গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—

"আচ্ছা—এসো মা। এবার যখন ক'লকেতায় আস্‌বে, আমার এখানেই উঠো। আজ রাত্রে এখানে থেকে গেলেও হ'তো।"

অনি মনে মনে না হাসিয়া পারিল না। ঠিক এই রকমের একটা উত্তর সেও কল্পনা করিয়াছিল।

নির্ব্বাক গোপীমোহন অনির সঙ্গে সঙ্গে সদর পর্য্যন্ত আসিলেন। কি বলিবেন তাহা ভাবিতে পারিলেন না। বনবিহারী ও অনি তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইল।

(১৪)

অনি যে বিধবা তাহা বনবিহারী এতাবৎ কাল জানিতেন না। তিন চারি মাসের মধ্যে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা যথেষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু নাম-ধাম ও কুল-পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা আধুনিক সভ্যতায় বাধে বলিয়া সে বিষয়ে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ গোপীমোহনবাবুর সহিত অনির কথোপকথন কালে যে সকল বিষয় বনবিহারী জানিতে পারিলেন, তাহাতে তিনি হঠাৎ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। অনির সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন বনবিহারী ভাবিয়া-ছিলেন—অনি বোধ হয় মেজরের কোন আত্মীয়া হইবেন। তবে সে আত্মীয়তার বিষয় তিনিও বিশেষ কিছু অনুসন্ধান

করিবার চেষ্টা করেন নাই; মেজর এবং অনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনো দিন সে কথা উত্থাপন করেন নাই। অনি যেদিন হঠাৎ মেজরের আশ্রয় ছাড়িয়া আসে, সে দিন তিনি কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে অনি ও মেজরের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সূত্র থাকিলেও তাহা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল; হয় তো সেটা মাত্র বন্ধুত্বের দাবী। তাহার পর অনি যেদিন সেই দুই ছত্রের একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে 'বনদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতে বনবিহারীর থাকা-না-থাকা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাই ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রতিষ্ঠিত দাবীকে আবার নূতন করিয়া নাড়া-চাড়া করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই; পাছে সে সম্বন্ধের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

অনি ও বনবিহারী যখন পিসিমার বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া রাস্তায় আসিয়া নামিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য আলোকের শ্রেণী তখন সারা পথকে যেন হাসির মালায় বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অনির হাসির শেষ কণাটি পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

বনবিহারী একখানা গাড়ী ডাকিয়া অনিকে উঠাইয়া নিজে উঠিয়া বসিলেন। অনি ভারাক্রান্ত মনে গাড়ীর এক কোণ ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া বসিল। নিজের অদৃষ্টের চিন্তায় তাহার মনটা তখন এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কথা বলিবার শক্তিটুকুকে পর্য্যন্ত সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এতদিন অনি তবুও মনে একটা আশা পোষণ করিয়াছিল যে—তাহার পিসিমা আছেন। দূর হইতে পিসিমার সাড়া না পাইলেও সম্মুখে আসিয়া এতটুকু স্নেহের পরশ পাইবার আশা অনি ছাড়িতে পারে নাই; স্নেহের পিপাসায় তাহার বুকখানা যে মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ অনি যখন সেখান হইতেও হতাশ হইয়া ফিরিল, তখন আর সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছিল না। আজ তাহার সত্য সত্যই মনে হইতেছিল—এ পৃথিবীর সকল আশ্রয়, সকল করুণার দ্বার তাহার পক্ষে চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আজ সে অনাথা, নিরাশ্রয়া—পথের ভিখারিণী।

অনিকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বনবিহারী অনেকক্ষণ হইতেই অবসর খুঁজিতেছিলেন; কিন্তু অনির ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি কোনো কথা উত্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না।

বনবিহারীর পক্ষে অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত অসহ্য বলিয়া মনে হইল; মানুষের ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি আর কিছু থাকিতে পারে কি না, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত বনবিহারী জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—"অনি, তুমি তো কৈ এতদিন আমাদের ওসব কথা কিছুই জানাও নি।"

'ওসব'টা যে কি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে তাঁহার কোথায় যেন একটু ব্যথার বাধা লাগিতেছিল।

অনি মুখ তুলিয়া একবার বনবিহারীর দিকে চাহিল; চোখ দুইটিতে কোনো প্রশ্নও ছিল না, উত্তরও ছিল না। তখনও বোধ হয় সে ভালরূপে বনবিহারীর জিজ্ঞাস্য বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। পরক্ষণেই আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বেশ প্রকৃতিস্থ ভাবে বলিল—"কি কথা দাদা?"

"ওই যে—" বলিয়া বনবিহারী একটা ঢোঁক গিলিলেন। একটা দুর্ব্বলতার সঙ্কোচ আসিতেছিল—হয় তো অনির প্রাণে ব্যথা লাগিবে।

"ওঃ—আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বুঝি?" বলিয়াই অনি একটু হাসিল। সে হাসিতে প্রসন্নতা বা ব্যথা কিছুই ছিল না; তবু নীরস ও রুক্ষ নয়।

বনবিহারী জানিতেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখের বা হাসি-কান্নার উপর অনির অদ্ভুত একটা আধিপত্য আছে। দুঃখ অনিকে বিচলিত করিতে পারে না। নিজেকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই পুনরায় বলিলেন—"হাঁ। তুমি যে বিধবা সে কথা কোনো দিন ভাবতেও পারিনি; তুমি নিজেও তো সে সম্বন্ধে কোনো দিন কোনো কথা আমাদের ব'লো নি।"

অনি অবিচলিত ভাবেই উত্তর দিল—"আপনারাও তো সে সম্বন্ধে কোনো দিন জিজ্ঞেস্ করেন নি, দাদা! বিনা কারণে অযাচিত ভাবে নিজের দুঃখের কাহিনী তো মানুষ বল্‌তে পারে না। পারলেও আমি অন্ততঃ সেই 'পারা'টাকে ঘৃণা করি; ওতে হৃদয় ভিক্ষুক ও কাঙ্গাল হ'য়ে পড়ে। লোকেও হয় তো তার দুঃখে ব্যথা পেয়ে তাকে দয়া ক'রতে পারে; কিন্তু শ্রদ্ধা ক'রতে পারে না।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনির মনে হইল—নিজের দৈন্যের কথা জানাইয়া মেজরের কাছে সে তো সত্যই

কর্ম্মের ভিড়ে এই ক্ষুদ্র অবসরটুকু এরূপ অলক্ষ্যে কাটিয়া গেল যে বনবিহারী ও সুলতা কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অনিকে মেসে উঠাইয়া দিয়া ও তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি গুছাইয়া দিয়া, তাঁহারা যখন অদ্যই ডেরাডুন্ এক্সপ্রেসে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার কথা জানাইয়া অনির নিকট বিদায় চাহিলেন, তখন সুলতার চোখের জল ও অনির বিহ্বল দৃষ্টি যেন সেই ছুটি-শেষের বিচ্ছেদ-বেদনাকে ভালভাবে জানাইয়া দিল।

বনবিহারীর পায়ে মাথা ঠেকাইয়া অনি গড় হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই বনবিহারীর সহিত যেদিন তাহার প্রথম পরিচয় হয়, সেই দিন হইতেই সে তাঁহার সরল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বাচাল ও কৌতুকপ্রিয় প্রকৃতির অন্তরের এই বিরাট মনুষ্যত্বকে তখন অনি এরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মেজরের তুলনায় বনবিহারীর যে সকল চপলতা ও দুরন্তপনাকে অনি একদিন অবহেলার চক্ষে দেখিয়াছিল, আজ সেগুলিকে তাঁহার সরল হৃদয়ের সমৃদ্ধি বলিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া পারিল না। আজ অনির সারা অন্তর বনবিহারীর চরণে ভক্তিনত হইয়া পড়িল।

সুলতার মুখখানির পানে চাহিয়া অনির ব্যথিত হৃদয় যেন ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুলতা তাহার পদধূলি লইতেই অনি তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। এই নিতান্ত সরলা বালিকার স্নেহময় বন্ধুত্ব সম্পদ সেই সুদূর প্রবাসে তাহার জীবন-মরুভূমিকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়া দিয়াছিল। অনি তাহার উত্তপ্ত শূন্য জীবনে সুলতাকে যেন হঠাৎ একটা সুশীতল ছায়াবীথির মত পাইয়াছিল। কিন্তু আজ সেই সুলতাকেও আবার ছাড়িয়া দিতে হইবে—কে জানে, সেই ছাড়া চিরদিনের মত কি না, এ কথা ভাবিতেই অনির চোখ্ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আরো নিবিড়ভাবে সুলতার মুখখানিকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে অনি বলিল—"লতি! আমায় ভুলে' যাবি না তো বোন্!"

সুলতার ঠোঁট্ দুখানি তখন কাঁপিতেছিল। অনির বুকের মধ্যে মুখখানাকে তেমনি ভাবেই গুঁজিয়া রাখিয়া উদ্গত কান্নাকে চাপিয়া লতি বলিল—"দিদি, তুমি আর যাবে না—আমাদের ওখানে?"

"নিশ্চয়ই যাবো" বলিয়া অনি তাহার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল—"তোর ছেলের অন্ন-প্রাশনে।"

লজ্জিতা সুলতা অনিকে একটু ধাক্কা দিয়া চাপা ভর্ৎসনার ইঙ্গিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল—"যাও! ভারি দুষ্টু মেয়ে! আমার ছেলে হ'তে হবে না; আমি চাই নে।"

দুঃখের মধ্যেও অনি একটু না হাসিয়া পারিল না, এই বোকা মেয়েটীর সরল ভাব দেখিয়া। সুলতার গাল দুইটীকে ঈষৎ টিপিয়া দিয়া বলিল—"তা না হ'লে যে বাঁধন আল্‌গা হ'য়ে যাবার ভয় আছে! চা'স্—নিশ্চয়ই চা'স্।"

"সে ভয় আমার এক ফোঁটাও নেই। তুমিই তো ব'লেছিলে যে—ভক্তির ঘরে ভয়কে বাসা বাঁধতে দিতে নেই।"

"ব'ল্‌লে কি হয় লতি! ঐ দুটো জিনিষ গোড়াগুড়ি এমন তাল পাকিয়ে জড়িয়ে থাকে যে, ভয়কে ভক্তি থেকে আলাদা ক'রে বেছে' ফেলা ভারি কঠিন।"

"তা হো'ক্ গিয়ে! তার ভয়ে আমি 'মা' হ'তে চাচ্ছি কি না! আমার ছেলেয় দরকার নেই; তুমি যাবে কি না বল?"

"যাবো; নিশ্চয়ই যাবো লতি!" বলিয়া অনি সুলতার মুখখানিকে গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া কাণে কাণে বলিল—"পাগলি! মেয়েরা কি শুধু 'মা' হ'তে চায় 'ছেলের মা' হ'বার লোভে? স্বামীর আত্মার একটা টুক্‌রোকে নিজের রক্ত মাংস দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে, একবারে নিজস্ব ক'রে বুকে পাবার লোভই তা'দের পাগল ক'রে তোলে, জানিস্।"

অনির কথা খুব পরিষ্কার ভাবে না বুঝিলেও, সুলতা যতখানি বুঝিল—তাহারই অনুভূতি তাহার সুন্দর মুখখানিকে নিমেষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

রাত্রি দশটায় ডেরাডুন্ এক্সপ্রেস্ ছাড়িয়া যায়। তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে দেখিয়া বনবিহারী সুলতাকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে বলিলেন। জিনিষপত্র সবই ভবানীপুরে পড়িয়া আছে, তখনো কিছুই গুছাইয়া লওয়া হয় নাই।

অনি ও সুলতা আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখের মধ্যেও কথা বার্ত্তায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সহসা

নাড়া পাইয়া যেন পরস্পরের হৃদয় আবার ব্যথিত হইয়া উঠিল।

দারোয়ান জানাইল যে ট্যাক্সি ডাকা হইয়াছে। অনি সুলতা ও বনবিহারী নীচে নামিয়া আসিলেন। অনির মনটা তখন বেদনার ভারে আরো নিস্তেজ ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতাকে আর একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অনি তাহার সীমন্ত চুম্বন করিল; মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না। উভয়েরই চক্ষু তখন নীরব-বেদনার অশ্রুতে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

লতিকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া অনি মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিল। অশ্রু যে তাহারই জীবনের সাথী; অপরকে সে তাহার অংশ পাইতে দিবে কেন!

বনবিহারী জোর করিয়া অনির হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। ইচ্ছা হইলেও অনি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিল না। এই স্নেহের দাবীকে উপেক্ষা করিবার সাহস তাহার ছিল না।

ট্যাক্সি ছাড়িয়া গেলেও অনি নিশ্চল ভাবে তাঁহাদের পথ পানে চাহিয়া রহিল। আজ অনির মনে হইতে লাগিল যে পশ্চিমের সঙ্গে তাহার সুদীর্ঘ বারো বৎসরের সম্বন্ধ বোধ হয় এই বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়িয়া গেল—শুধু কতকগুলা কান্নাহাসির জীর্ণ স্মৃতির একটা স্তূপ তাহার মনের উপর বসাইয়া দিয়া। আজ মেজরের কথা মনে পড়িয়াও তাহার চোখে জল আসিল। সেই বাংলো, সেই শিউ-কিষণ ও ভগলু;—একজনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার ঝাপ্‌টায়, সব কিছু হইতেই চিরদিনের মত সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

বনবিহারীর উদাস মনটাও বোধ হয় তখন একটু কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া—হাতের রুমালখানি নাড়িতে নাড়িতে তিনি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিলেন—

নিত্য তোমার ভাঙা-গড়া,
সৃষ্টি-খেলার আগা-গোড়া।
হে নটরাজ, নৃত্য তোমার
বুঝেও বুঝি না।
কান্না-হাসির ছন্দে-ভরা
তোমার আঙিনা॥

বনবিহারী ও সুলতা চলিয়া যাওয়ার পর অনি অনেকক্ষণ নিরুম ভাবে ফটকের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। এতদিন গোপনে তাহার বুকের ভিতর যে ভালবাসা নীরবে আপনার অস্তিত্বটুকুকে ছড়াইয়া রাখিয়াছিল, আজ পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধের সকল বাঁধন নিঃশেষে কাটিয়া যাইতেই যেন সেই প্রচ্ছন্ন ভালবাসা মূর্ত্ত হইয়া তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বিশেষতঃ, মেজরের স্মৃতিতেই যেন তাহার সারা অন্তর জুড়িয়া আজ হাহাকার উঠিতেছিল; আর অনি শুধু চোখ রাঙাইয়া তাহার মনকে সংযত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল।

উপরে আসিয়া, অনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার বুকের ভিতর একটা ব্যথিত ক্রন্দন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

(১৬)

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই যেন মেজরের কর্ম্মঠ ও উৎসাহী প্রাণটা সম্পূর্ণ অসাড় ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহার এই চৌত্রিশ বৎসর বয়সের উদ্দাম জীবনকে এরূপ জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল যে, মেজরকে দেখিয়া এখন আর সহসা তাঁহার বয়স অনুমান করা যায় না। এই কয়দিন তিনি বাহিরের ডাক ও হাসপাতালের কার্য্যে পর্য্যন্ত বাহির হন্ নাই। বয় ও শিউকিষণ্ নিয়মিত ভাবে তাঁহার সমস্ত কার্য্যই করিয়া যাইতেছিল; কিন্তু তিনি সে সব দৈনন্দিন কার্য্যের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া এমন একটা নিভৃত কোণে নিজেকে টানিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বেচারী চাকর ও বেহারাদের সমস্ত শক্তির নাগালকে তাহা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এখন আর পূর্ব্বের মত তাহারা যখন তখন মেজরের সম্মুখে আসিতে সাহস করিত না। মেজরও হয় তো সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন—পাছে তাঁহার দুর্ব্বলতা ও গোপন পাপ বিশ্বের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়।

যে গ্রহ একদিন তাহার খেয়ালের পথে অবাধ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল—জগতের সকল অমঙ্গল ও বাধাবিঘ্নকে নিজের শক্তির প্রাবল্যে উপেক্ষা করিয়া, সহসা একটা প্রলয়ের ঝঞ্ঝায় সে যখন কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই দুর্জ্জয় আত্মাভিমান ও খেয়ালের শক্তির নেশা এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যায়। সেই ভীষণ পতনের হাত হইতে সে

তখন নিজেকেও ফিরাইতে পারে না ; তাহারই উপেক্ষিত নিতান্ত ক্ষুদ্র উপগ্রহদের আকর্ষণকেও হাত বাড়াইয়া নাগাল পায় না। খেয়ালের নেশা যখন দুকূল ছাপাইয়া বহিতেছিল, তখন তীরের বন উপবন সব কিছুকে ভাঙ্গিয়া লইয়া মেজর চাহিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের মাতলামিকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ-করিতে। সেদিন তিনি ভাবিতেও পারেন নাই যে সেই সকল গাছপালা একদিন সেই স্রোতের মোহনায় জমা হইয়া তাহার গতি রোধ করিয়া দিবে—সমস্ত প্রবাহ বদ্ধ-বেগ হইয়া তাহার অন্তর পর্য্যন্ত পচিয়া উঠিবে। বাসনার আগুনকে জ্বালাইয়া তুলিয়া যে উপভোগের যজ্ঞে তিনি কর্ত্তব্যের বিধি-নিষেধকে পর্য্যন্ত শাখাসহ ছিঁড়িয়া লইয়া আহুতি দিয়াছিলেন, সেই আগুনে যে পতঙ্গের মত শেষে নিজেকেই পূর্ণাহুতি দিতে হইবে, তাহা মেজর কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

এখন আর মেজর বড় একটা বাহির হইতেন না। অধিকাংশ সময়ই নিজের শয়ন-কক্ষখানিকে আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। লাইব্রেরি, অনির নির্দ্দিষ্ট ঘরখানি, এমন কি, হল্ ঘরেরও সেই অংশটুকু পর্য্যন্ত তিনি এড়াইয়া চলিবার জন্য সদা সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সেই অচেতন জড় পদার্থগুলিকে দেখিয়াও যেন তাঁহার একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইত। স্থবিরের মত বদ্ধ ঘরে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে যখন তাঁহার প্রাণ নিতান্ত শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উঠিত, মেজর কোনরূপে নিজেকে টানিয়া আনিতেন বারান্দা কিম্বা পশ্চাতের বাগানের একটি কোণে। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। নিজের যে দুর্ব্বলতা তিনি এতকাল জানিতে পারেন নাই, সেই দুর্ব্বলতা যেদিন হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তাহার স্বরূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই দিন হইতেই বহির্জগতের একটা ক্রুর বিদ্রূপ-হাসি যেন মেজরের সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া বাজিত।

* *

তখন সন্ধ্যা। পৃথিবীর যে বুক এতক্ষণ আলোকে ভরিয়া ছিল, গোধূলির ম্লান হাসি যেন সহসা কোন গোপন দুর্ব্বলতাকে তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে লজ্জায় রাঙা করিয়া তুলিয়াছিল ; পরক্ষণেই সেই লজ্জার আভাটুকুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনন্দময় জীবনের উজ্জ্বল আলোকরাশি যেন ভয়ে আত্মগোপন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন শুধু একটা বিষাদের কালিমা ভরিয়া উঠিয়াছে। সেখানে হাসি নাই, আলো নাই ; দিনের সব পথ, সব সৌন্দর্য্য যেন মুহূর্ত্তে ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছে। মেজর জানালার পাশে কৌচটার উপর পড়িয়া বাগানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। কামিনী গাছটার কোলে কাঁঠালি চাঁপার প্রকাণ্ড ঝোপটা—যাহার পাতাগুলা এতক্ষণ আলোকে ঝল্‌মল্ করিয়া দুলিতেছিল, সেটা যেন তখন একটা নির্জ্জীব অন্ধকার স্তূপের মত দাঁড়াইয়া আছে। দিনের আলোয় খুঁজিলে যাহার কচি পাতার বুকে গন্ধের মদেভরা হাজার ফুলের কলি মিলিত, এখনকার বীভৎস রূপ দেখিয়া তাহাকে হয় তো ভালভাবে আর চেনাই যায় না। কিন্তু এই অন্ধকারে তাহার রূপের সমাধি হইয়া গেলেও কি তাহার বুকের মধ্যে লুকানো সেই সুরভি সৌন্দর্য্যের উৎস মরিয়া গিয়াছে? না—বাতাসে এখনো তাহার ভাষা হয় তো শোনা যায়। সে মরে নাই, মরিবে না। অন্ধকার তাহার চোখ বাঁধিয়া পথরোধ করিয়াছে; কিন্তু বাতাস তাহার নিশ্বাসের গতিরোধ করে নাই তো। মেজরও বাঁচিয়া আছে—সে বাঁচিবে, যে অন্ধকার সহসা তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে শ্বাসরোধ করিতে দিবে না।

মৌন মেজর বসিয়া বসিয়া নিজের জীবনের কথা ভাবিতেছিলেন। "জন্মের আগেকার কোনো ইতিহাস যার নেই, মৃত্যুর পরে যা' নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাবে, তার পিছনে মানুষ এত সামাজিকতা, এত বিধি নিষেধ গড়ে' তা'কে দম-বন্ধ ক'রে তুলেছে কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে আপনা আপনি যা বেয়ে চলে' আসে, তার গতিরোধ ক'রে নতুন ধারা সৃষ্টি ক'রে নিজেদের হাত পা এমন শিকল্ দিয়ে বাঁধবার কি দরকার পড়ে'ছিল মানুষের! চোখ, কাণ নাক মুখ প্রত্যেক অঙ্গ মানুষের জন্মের সাথেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে তাকে ভোগ ক'র্‌বার জন্যে। কল্পনার সৃষ্টিতে 'মরালিটী'র বাঁধন দিয়ে যারা সেই জীবনের হাত-পা'কে বেঁধে ভোগের পেয়ালাকে লোহার আবরণে ঢেকে ফেলেছে, তারা শুধু নিজেরা অক্ষম ব'লেই নিজেদের সেই তৃষ্ণার্ত্ত জীবনের পিপাসা মিটাবার অক্ষমতায় তার গলায় ছুরি মেরে, তার হাহাকারকে বন্ধ ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'রেছে মাত্র। কিন্তু যার সে পথ

বেয়ে চল্‌বার ক্ষমতা আছে সে কেন নিজে সেই সব অকর্ম্মণ্য মস্তিকের খেয়ালগুলোকে হাতে-পায়ে জড়িয়ে নিয়ে নিজেকে বিশ্বের সব কিছু থেকে বঞ্চিত ক'রবে? মানুষ জন্মেছে, সে মর'বেও। কিন্তু সেই জন্মানো আর মরার মাঝখানে তার যে পরিমিত বেঁচে থাকা, সেটাকেও সে মরবার আগেই মেরে ফেল্‌বে কেন? যে মুমূর্ষু সেও জল চায়, তারও পিপাসার আর্ত্তনাদ আছে, অন্ততঃ যতক্ষণ বাঁচ্‌বার—জগতের শেষ নিশ্বাস বাতাসটুকু পর্য্যন্ত তার বুকের পথকে মুক্ত ক'রে রেখেছে। মানুষ নিজে যে কল্পনার দড়ি তৈরী ক'রে মানুষকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়, তা'র পাশের ভিতর আমরা আপনা-আপনি হাত বাড়িয়ে দেবো কেন? প্রকৃতির বুকে যে অধিকার নিয়ে যে জন্মেছে, সে অধিকার তার নিজস্ব—সে তা' ভোগ দখল কর্‌বেই। কিন্তু—

ঐ 'কিন্তুর' গণ্ডীটা মেজর কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যেখানে নিজের স্বচ্ছন্দ অধিকার-টুকুকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া আমরা পাইতে চাই, সেখানে পরেরও তো আছে—তাহাদের প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ নিজস্ব অধিকার। জগতের তরফ্ হইতে প্রত্যেকের সেই স্বচ্ছন্দ অধিকারকে বাঁচাইয়া চলিতে হইলেই, নিজের অধিকারের গণ্ডীকে মাপিয়া লইতে হইবে—সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া। সমাজ—বিধি-নিষেধ, এ সকলই সেই অধিকারের মাপকাঠি। যে মাপকাঠি সমস্ত দুনিয়ার বাজারকে দখল করিয়া বসিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে ভাঙিতে গেলে সেখানে বিপ্লব ঘটিবেই। সংহত শক্তির আঘাতে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফিরিতে হইবে—শুধু পরাজয়ের গ্লানিতে নিজের অন্তরকে বোঝাই করিয়া। সেই গ্লানির কালিমায় নিজস্ব অধিকারের শেষ আলোক-কণাটুকু পর্য্যন্ত কালো হইয়া উঠিবে। আলোর সম্মুখ হইতে যে দুর্ব্বল জীবাণু কোন্ নিভৃত কোণে আত্মগোপন করিয়া ছিল, আজ সেই দুর্ব্বলতার অবসর লইয়াই, নিমেষে একটা বিষাক্ত ঘায়ের মত সমস্ত অন্তরকে সে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহাকে একদিন অধিকারের দাবী বলিয়া পতাকার মত তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আজ তাহা গ্লানির পাথর হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। সেখানে আলো নাই, তৃপ্তি নাই, পথ নাই—; শুধু গ্লানির হাহাকার, ক্ষতের ব্যথা!

দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেজর হাতের উপর মাথা রাখিয়া কপালের উপরকার সম্মুখের চুলগুলিকে আস্তে আস্তে টানিতেছিলেন।

বয় ঘরে আসিয়া আলো জালিয়া দিতেই মেজরের খেয়াল হইল। তিনি সেই অবস্থাতেই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ হ্যায়।"

সন্ত্রস্ত বালক কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অতি নিম্নস্বরে সভয়ে কহিল—"হাম্মে—হুজর! ভগ্‌লু।"

মেজর কটাক্ষে ভগ্‌লুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরেই বলিলেন—"পেগ্ লেয়াও—পেগ্—সরাব।"

ইদানীং মেজর সুরাপাত্রের মধ্যে শান্তির সন্ধান খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। দুশ্চিন্তা, অনুশোচনা ও অশান্তিতে যখন তাঁহার মনটা উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, মদ্যপানে তাহার বোধশক্তিকে উন্মত্ত করিয়া দিয়া তিনি অশান্তির গুরুভার ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। জীবনের পাত্র যখন কাণায় কাণায় বিষাক্ত হইয়া উঠে, মানুষ মরিয়া শান্তি পাইতে চায়, অথচ নিজেকে ঘিরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার লোভও সে ছাড়িতে পারে না, তখন এইরূপ একটা আশ্রয়ের মধ্যেই নিজেকে দাঁড় করাইয়া সে ঐ মরিবার চিন্তাটুকুকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে চায়। মেজর তাঁহার কাজকর্ম্ম ও সব কিছুকে ঐ সুরার পাত্রে ডুবাইয়া দিয়া হাল্‌কা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবসাদের সুযোগ লইয়া যখনই দুশ্চিন্তা ও অশান্তি মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, তখনই নীতি ও শান্তির বিরুদ্ধে মেজর নিজেও এই দারুণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেন।

বেচারা ভগ্‌লু বোতল ও পেয়ালা আনিয়া মেজরের সম্মুখে টিপয়ের উপর সাজাইয়া দিল। এই মদ্যপানের অধ্যায়টা তাহার নিকট বিশেষ ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইত। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা শিশুর প্রাণকে ভীতি-চঞ্চল করিয়া তোলে। বিশেষতঃ তাহার সুদীর্ঘ দুই বৎসরের কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় কখনো মেজরকে এইরূপ অবস্থায় সে দেখে নাই।

তখন মেজরের চা ও বিস্কুট খাইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া বয় ভয়ে ভয়ে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া

পুনরায় অতি নিম্নস্বরে বলিল—"হুজুর, চা রোটি লেয়ামে—"

মেজর একটা পেগ মুখে লাগাইয়া টানা অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"নেই—"।

সন্ত্রস্ত বালক-ভৃত্য ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মেজরের শাসনকে যথেষ্ট ভয় করিয়া চলিলেও মাঝে মাঝে প্রভুর নিকট ভগ্‌লু যে আদর পাইত, তাহার আনন্দ সে শাসন-ভীতিকে ছাপাইয়া উঠিয়া তাহার তরুণ বুকখানাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। কিন্তু এখন শাসনের ভয় হাল্‌কা হইয়া আসিলেও, বঞ্চিত হওয়ার অভিমান ও ব্যথা তাহার কচি ঠোঁট দুখানিকে যেন কান্নার চাপে ফুলাইয়া তোলে। সে কাঁদিতে পারে না, হয় তো তাহার ভৃত্য-জীবন আপনার পাওনার সীমা বুঝিতে শিখিয়াছে। ইহা অপেক্ষা সেই শাসনের ভয়ই যে তাহার ভাল ছিল। সে ভয়ের মধ্য দিয়া ভৃত্য তাহার প্রভুকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এই শাসনের শিথিলতার ভিতর দিয়া যে প্রভু বিকৃত রূপ লইয়া ভৃত্যের সম্মুখে দাঁড়ান, তাঁহাকে দেখিয়া যে ভৃত্যের মনও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

হাতের পেয়ালাটিকে এক চুমুকে নিঃশেষিত করিয়া মেজর কি বলিবার ইচ্ছায় একবার বয়ের উদ্দেশে ফিরিয়া চাহিলেন. কিন্তু ভগ্‌লু তখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তে কি ভাবিয়া লইয়াই মেজর উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মনের অবস্থাটা বোধ হয় হঠাৎ একটু বদলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া মেজর শান্তকণ্ঠে ডাকিলেন —"ভগ্‌লু!"

ভগ্‌লু ছুটিয়া উপরে আসিল। অনেক দিন পরে যেন, বালক তাহার প্রভুর আহ্বানের মধ্যে সেই পূর্ব্ব-স্নেহের রেশটুকু খুঁজিয়া পাইল।

ভগ্‌লু নিকটে আসিলে, মেজর তাহার মাথার উপর সস্নেহে নিজের বাম হাতখানি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"ভগলু, তোর মায়িজী, তোকে কোন চিট্টি উট্টি লেখে নি?"

ঈষৎ ম্লান হইয়া মেজরের মুখপানে চাহিয়া বয় বলিল—"নেই হুজুর। মায়িজী তো হাম্‌কো ছোড়কে গিয়া। একদম্ মুল্লুক্ চলা গিয়া……।" বালকের কচি বুকখানি একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে দুলিয়া উঠিল।

"মায়িজীর জন্যে তোর মনে খুব কষ্ট হয়, না—রে ভগলু? তুই তার সঙ্গে গেলি না কেন?" বলিয়া মেজর ভগ্‌লুর মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বালকের স্বচ্ছ চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

ভগ্‌লু, মুখখানি মাটির দিকে নামাইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"মায়িজী গরীব হ্যায় হুজুর; ওহি বাস্তে সাথমে নেই লে গিয়া।"

দুই হাতে রেলিংটাকে ধরিয়া মেজর আকাশের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার আকস্মিক অন্যমনস্কটুকু ভগ্‌লুর চোখেও ধরা পড়িল।

অনির দেশ সম্বন্ধে, মেজর কোনো দিনই তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মুল্লুক বলিতে—সেই বিস্তীর্ণ বাংলা দেশ। কে তাহাকে ফেলে সেখানে; কে কাহার খোঁজ রাখে!

ভগ্‌লুকে বিদায় দিয়া মেজর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মনটা তখন অবশ হইয়া যেন পুরাতন কোনো একটা স্মৃতিকে বারবার আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছিল। আর তাহারি ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হইয়া অনির মুখখানি তাঁহার বুকের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল।··· অনির সন্ধানের জন্য মেজর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)



মণিপুর রাজ্যে

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

পূজোর ছুটী,—কি করা যায়। এতবড় ছুটিটা শুধু বারোয়ারীতলার আমোদে কাটাবার ইচ্ছে হল না। দলের সকলেরই মন সহরের বাহিরে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। অতএব ঠিক হল ট্রেনে চাপতেই হবে, তা সে যে দিকেই হোক।

এমনি একটা দিনে আমাদের নৃতত্ত্বের কয়েকটী ছাত্র মিলে স্থির করা হল এবার মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। অনেক দিনের বাসনা মণিপুর-ভ্রমণ আমার ভাগ্যে আছে দেখে খুব আনন্দ হল।

১২ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দুপুর-বেলা আসাম মেলে চাপা গেল। কল্‌কাতার লোক,—বাহিরের গাছপালা

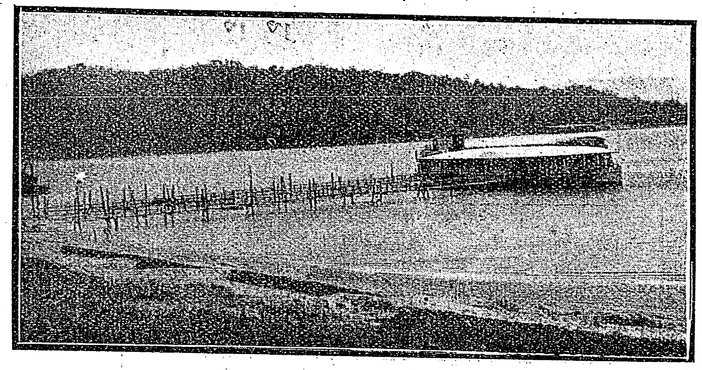

"ব্রহ্মপুত্র"



মণিপুরী নাগা

আর ক্ষেতের দর্শনলোভে বাহিরের দিকে তাকিয়ে রহিলাম। কিন্তু রোদে বেশীক্ষণ ভাল লাগ্‌ল না, অতএব সময় কাটাবার জন্যে আমরা তাস্ পাড়লাম। চমক ভাঙ্গল, গাড়ী যখন পদ্মার বুকে এসে পড়েছে। পশ্চিমে-হেলে-পড়া সূর্য্যের নিস্তেজ রোদ আমাদের গায়ে এসে পড়েছে—আমরা তাস বন্ধ করলাম। রাত্রি ৮টার সময় পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করে খাবার নিয়ে বসা গেল। তারপর শয়ন। ছোট গাড়ী আমাদের ঘুমের মাঝে বাংলা ছেড়ে আসামে এসে পড়ল। পরদিন সকালে আমিনগাঁওএ ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে (ষ্টীমারে অবিশ্যি) কামাখ্যা পাহাড়ের তলায় আশ্রয় নিতে হল। একটু বেলায় আসামের গাড়ী ছাড়ে দেখে আমরা স্নানাহার সেরে নিলাম।

বেলা ১২টায় আসাম বেঙ্গল রেলের ছোট গাড়ীতে চাপা গেল। গৌহাটীর ভেতর দিয়ে গাড়ী চলেছে—এক দিকে ব্রহ্মপুত্র আর এক দিকে খাসিয়া, জয়ন্তীয়া হিল্‌স্। শিলং রোড দেখে মনে পড়ল, শিলং

পিক্, লেক্ ও চেরাপুঞ্জীর গুহার কথা। ভাবলাম মণিপুর কি এরও চেয়ে সুন্দর ?

রেলপথটী প্রায় আগাগোড়া পাহাড় আর বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে,—মাঝে মাঝে পাহাড়ের কোলে ধান-জমি। রাতে যখন দ্বিতীয়ার চাঁদ ঝাউয়ের আড়ালে উঁকি মারছিল, আর পাহাড়ের ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের শরীরে বেশ আমেজের ভাব আনছিল, তখন



'ইম্ফালের বাজার'

চারি দিক কুয়াসায় ঢাকা, শীতও বেশ বোধ হল। ষ্টেশনে চা পান করে বেশ গরম হওয়া গেল এবং সারাদিনের পথ শুনে পেটটীও ভরে নিতে হল। গেট খোলার সময় বরাবর তাড়া দিয়ে বাস আমাদের ৬-৩০টার সময় রওনা করে দিলে। নিকটে ডিমাপুর থানায় বাস দাঁড়াল পাস্‌পোর্টের জন্য। দরবারের চিঠি দেখিয়ে প্রত্যেকের ৮ আনা দিয়ে পাশ করা হল।

স্থানটীর নাম ডিমাপুর—একেবারে আসামের জঙ্গল। অতএব ম্যালেরিয়ার উপদ্রব এখানকার বিখ্যাত। লোকজন এখানে মন্দ থাকেন না। বাঙ্গালীও কয়েক ঘর আছেন। এখানে দেখবার

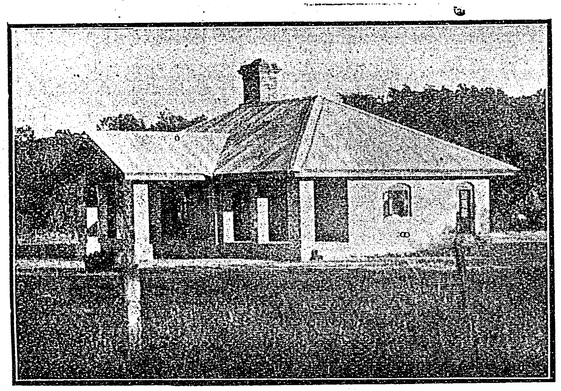

বিষ্ণুপুর ডাকবাংলো

এই আসামের পথে রেলে ভ্রমণ বাস্তবিকই রমণীয় করে তুলেছিল।

রাত্রি ১২৷৷০টায় যখন পৃথিবী বেশ শীতল হয়ে এসেছে—গাড়ী আমাদের 'মণিপুর রোড' ষ্টেশনে নামিয়ে দিল। ষ্টেশনে বিশ্রাম-ঘর (waiting room) নেই। নিকটে এক ডাকবাংলো আছে, তাতে শুনলাম লোক আছেন। অতএব হিমের রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে ভোরবেলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার জন্য সব প্রস্তুত হওয়া গেল। একখানা বাস ঠিক করা হল, বাস ছাড়া সাধারণ মোটর এখানে মোটেই থাকে না, শুনলাম। যাহা হউক, শনিবার সকালে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল মোটরবাসে।



ক্ষেতের কাজে মণিপুরী

একটী জিনিষ আছে, সেটী হচ্ছে বনের ভেতর, রাস্তার ধারেই প্রায়, কয়েকগুলি প্রাচীন মনোলিথ্ (monolith)—এক-প্রস্তর করব। এর নিকটে যেতে একটী বহু-পুরাকালের ফটক পড়ে। স্তম্ভগুলোর গায়ে বেশ খোদাই করা আছে। কিন্তু এগুলি যে কোন্ জাতের, কোন্ সময়ে তৈরী, কে ঠিক করে বলে দেবে ? হয় ত বা মহাভারতের অর্জ্জুনও মণিপুর প্রবেশ করবার সময় এই বনানীর ছায়াতলে

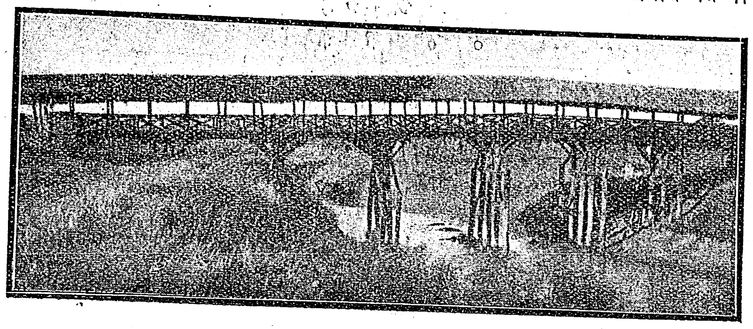

'ঢাকা ব্রিজ'

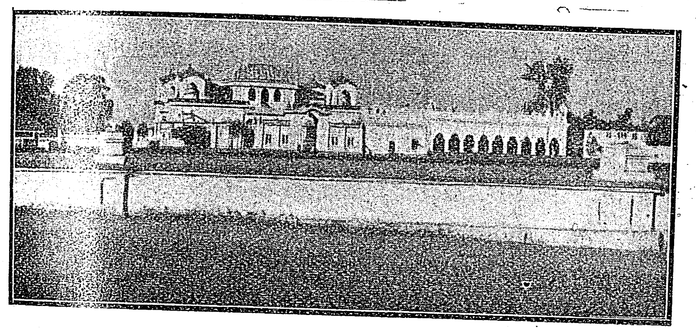

রাজপ্রাসাদ

চিরসুপ্ত মানবগণের সমাধি দেখে থাকবেন। তারই বা ঠিক কি ?

সরু পিচ্ বাঁধানো, উঁচু-নীচু পথের ওপর দিয়ে আমরা এগোতে লাগ্‌লাম। পথে ধনেশ্বরী নদী পড়ল। তার সাঁকো পার হয়ে আমরা নাগা হিলের দিকে অগ্রসর হলাম। অল্পবিস্তর কুয়াসার ভেতর দিয়ে গাড়ী চলেছে, সামনে আকাশের গা ঘেঁসে পর্ব্বতশ্রেণী, আশে পাশে ঘন্ বনের ফাঁকে ফাঁকে ধান-জমি। কখনও বাঁশ বন, কলা বন পথের ধারে ঝুঁকে পড়েছে; কোথাও ছোট্ট পাহাড়ের ওপর বড় লম্বা গাছ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারা অঙ্গে তার জড়ানো লতানে গাছের পাতা।

৯ মাইল দূরে মণিপুরের পথের প্রথম গেট 'নীচুকার্ড গেট' (Nichucard Gate)এ এসে গাড়ী দাঁড়াল। ৭টায় গেট খুললে গাড়ী ছাড়ল। খানিকটা যাবার পর গাড়ী পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগল। বিশাল নাগা হিলের অঙ্গ বেয়ে ছোট্ট বাসখানি চল্‌তে লাগ্‌ল। পাহাড়ের পাদদেশে উপত্যকার ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে সরু 'দয়াং' নদী।

খানিক রাস্তা-ভোর নদীটিকে প্রায় আশে পাশে দেখা যায় এবং বার পাঁচেক বোধ হয় পার হতে হয়। নদী না থাকলে বোধ হয় মণিপুরের পথ এত

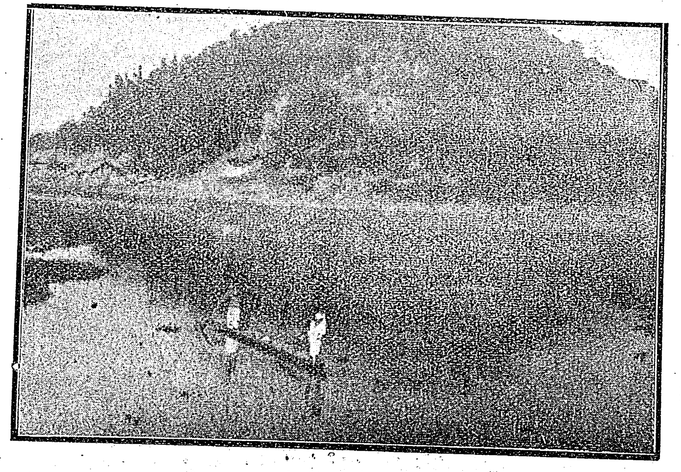

লোক্‌টাক্‌লেকের অন্তস্থিত পার্ব্বত্য-দ্বীপাংশ

সুন্দর লাগত না। কখনও পথটী একেবারে নদীর গায়ে এসে মিশেছে, তখন নদীর পাথরের টুকরোগুলির ভিতর

দিয়ে জলের স্রোত ও শব্দ দুই বেড়ে গেছে, কখনও পারের পাহাড়ের অঙ্গ নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তখন পাথরের শিরগুলি তার বেরিয়ে পড়েছে।

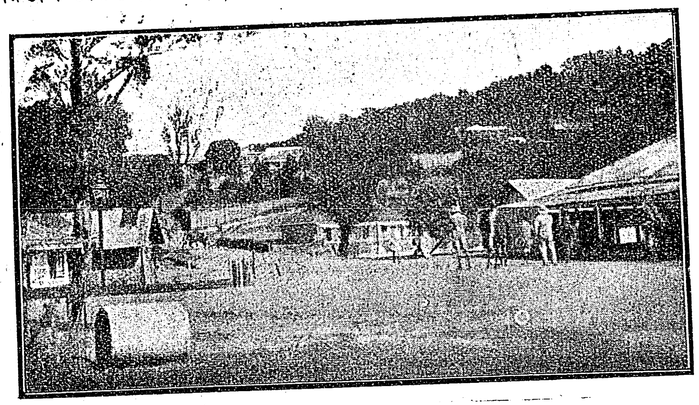

'কোহিমা'

১৩৩ মাইলের বর্ণনায় হয়ত পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্য-চ্যুতি হতে পারে, কিন্তু মণিপুর অপেক্ষা মণিপুরের পথটাই বেশী উপভোগ্য—তাই তার বর্ণনা না দিলে আমার কাহিনীই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১০ঘণ্টা ব্যাপী এই সারাদিনের পথ-ভ্রমণ একটুও কষ্টকর লাগেনি এই পার্ব্বত্য পথের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে; এবং হেমন্তের বাতাস আর রোদ এই পার্ব্বত্য পথে আমাদের শরীরে এতটুকুও কষ্ট দেয় নি।



'পাহাড়ের কোলে মণিপুর'

প্রায় পঞ্চাশ মাইল এসে ৯-৩০টার সময় আমরা কোহিমাতে পৌঁছিলাম। কোহিমা 'নাগা হিল' জেলার হেড্‌কোয়ার্টার—ইংরেজদের অধীন। কিছু দূর থেকে স্বাধীন মণিপুর আরম্ভ। স্থানীয় নাগাদের দেখতে পাওয়া গেল—তাদের গালে গোলাপী রং, অঙ্গে পাহাড়ী শক্তি। কয়েকজনের হাতে বন্দুক দেখতে পাওয়া গেল। এদের যোদ্ধার বেশে, মাথার টুপি থেকে পায়ের পোষাক পর্য্যন্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। নাগাদের জন্তু শিকারের বহর দেখে বিশ্বাস হয় যে এরা আগে মানুষের মাথা নিয়ে বেড়াত,—head-hunting করত।

কোহিমা প্রায় ৫ হাজার ফিট উঁচু

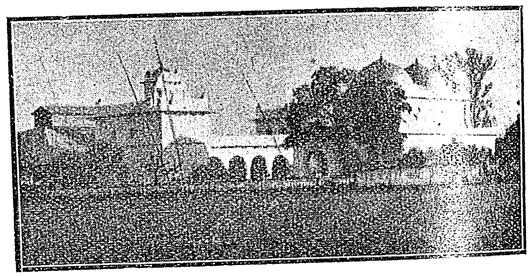

"শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির"

তাই বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল। সহরটী বেশ বড়ই লাগল। বাড়ী ঘরদোরের সংখ্যাও বেশী,—থানা, ক্লাব-হাউস, কাছারী, ক্যাণ্টনমেণ্ট সবই আছে। কাছাকাছি নাগাদের বস্তিও অনেক দেখা গেল।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে বাস আমাদের কিছুক্ষণ ছুটী দিলে, মাঝপথের মোটর ষ্টেশন 'মাও'তে এসে। পাহাড়ের গায়ে এমন সুন্দর স্থানে মাও জায়গাটী কোহিমার চেয়েও ভাল লাগল। মাও নাগাদের একটী মস্ত গ্রাম, মোটরের বড় ষ্টেশন। দুতিনজন বাঙ্গালী

এখানেও দেখা গেল। পাহাড়ের ওপর ডাকবাংলো, উৎসুক মন কেবলই ভাবছে 'আর কতদূর', 'সেই আর একটী মাড়োয়ারীর পুরীর দোকান। আমরা চা ও পুরী এখানে খেয়ে নিয়ে সে দিনের মত মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত করলাম।

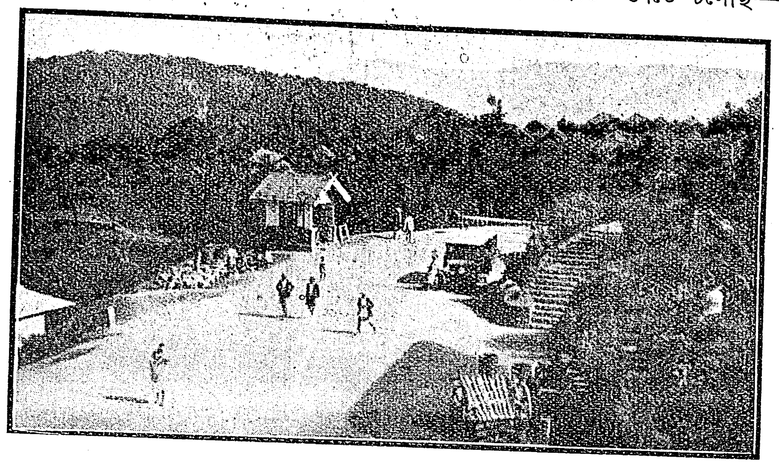

'মাও'—গেটের আগে R. M. S দাঁড়িয়ে আছে

১২-১৫তে গেট খুলল, দুদিক্‌কার সমস্ত আটকান গাড়ী ছেড়ে দিতে। ঘণ্টা পড়লে আগে বেরোল ডাক-গাড়ী; তার পর সব। অতএব আবার বাসে এসে মাও থেকে রওনা হওয়া গেল। এবার গাড়ী পাহাড় থেকে ক্রমশঃ নামতে লাগল। ইম্ফাল নদীর পাশ দিয়ে আমরা চলেছি—বেলা তখন পড়ে এসেছে।



মণিপুরী স্ত্রীলোক

তবু মণিপুর কই? মণিপুর এল, বেলা তখন চারটে।

মণিপুর উপত্যকায় রাজধানী ইম্ফালে পৌঁছিলাম বিকেল ৫টায়, কল্‌কাতা থেকে বাহান্ন ঘণ্টা পথ ভেঙ্গে। বন্ধুবর সর্ব্বজিৎ সিংএর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম, বাজারের নিকটেই। কাপড় চোপড় ছেড়ে, চা, খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা বাজারের দিকে। বাজারের অর্থে শুধু স্থায়ী দোকান নয়, নিত্যকার হাটও তখন বেশ জমে এসেছে। শুনলাম প্রত্যহ এই হাট বিকেল থেকে বসে, আর রাত্তিরে ভাঙ্গে। মস্ত হাট, রাত্তিরে সেদিন এর হদিস পাই নি, এত বড়। গম্ গম্ করছে ক্রেতা-বিক্রেতার গোলমালে। গন্ধকে ভেজান কাঠি জ্বালিয়ে জিনিষ বেচতে বসে গ্যাছে মণিপুরী মেয়েরা, খালি গায়ে। খ্যাঁদা আর তেলক-কাটা এই মেয়েদের কথা এক বর্ণও বোঝা যায় না। যা হোক, বন্ধুবরের সাহায্যে কিছু জিনিষপত্র কেনা হল—এ দেশের তুলনায় ওখানে অনেক কিছু সস্তা বলেই মনে হল। আসামের অন্য অন্য স্থানের মত এখানেও কলা, কমলালেবুর আমদানী বেশ। শুটকী কইমাছ থেকে, ভাল ভাল ও-দেশীয় তাঁতে-বোনা বেড-কভার, পর্দা, চাদর সব রয়েছে দেখা গেল। বাজার ঘুরে বাড়ী ফিরে

খাওয়া-দাওয়া সারা হল। তার পর সারাদিনের ক্লান্তি ঘুচাবার জন্যে বিছানায় শুয়ে লেপ মুড়ি দেওয়া গেল।

রবিবার সকালে সহর দেখ্‌তে বেরোন হল। চতুর্দ্দিকে পাহাড়—মাঝখানে এই নাতিদীর্ঘ ইম্ফাল। নদীটি একে বেঁকে সহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। স্থানে স্থানে তার ওপর সেতু তৈরী করা—সেকেলে ধরণের খড়ের চালে ঢাকা। কলের জল, বিজলী আলো, পোঃ এণ্ড্ টেলিগ্রাফ আপিস, ক্যাণ্টন-মেণ্ট, রাজবাটী, পোলো-গ্রাউণ্ড সবই আছে দেখলাম। পথগুলিও মন্দ নয়—দুপাশে সারি সারি বিলাতী ঝাউ আর বাগানওয়ালা বাড়ী। এখান থেকে কতকগুলি পথ আছে শীলেট, শিলচর ও বর্ম্মাসীমান্ত প্রভৃতি স্থানে যাবার।

মণিপুরের মহারাজার প্রাসাদ পড়ল সহরের এক প্রান্তে। রাজপ্রাসাদের কম্পাউণ্ডের ভেতর ৺গোবিন্দজীর মন্দির—মাথায় দুটী সোণালী গম্বুজ। প্রাসাদের পেছন দিকে মহারাজার নিজস্ব পোলো-গ্রাউণ্ড। এখানকার পোলো খেলা যে বিখ্যাত তা এই মাঠ দেখলেই বোঝা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাজ-ভবনে আমরা প্রবেশ করি নি; কারণ, সেই সময়ে মহারাজার মেয়ে মারা যান।

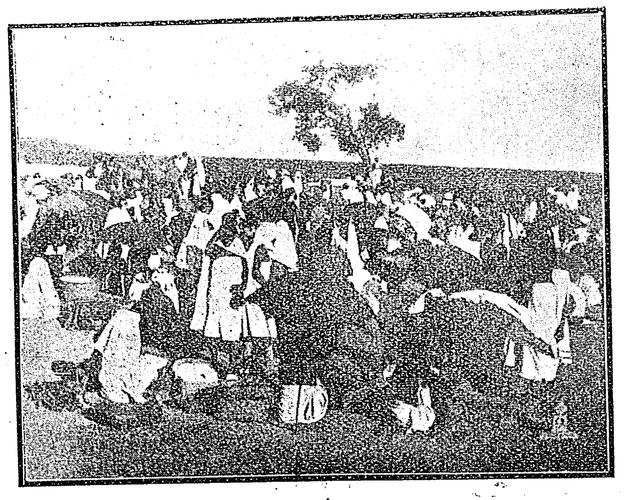

হ্রদের কিনারায় "মইরাং" হাট

বিকেলে আমরা গেলাম বাবুপাড়ার দিকে, যেখানে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা থাকেন। ষ্টেটের রেজিষ্ট্রার, স্কুলের শিক্ষক, ওভার-সিয়ার ও পুলিশ-কর্ম্মচারী কয়েকজন



"কুকি বালিকাদ্বয়"

বাঙ্গালী। তাঁরা সব এই পাড়ায় থাকেন। কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। তাঁরা তাঁদের স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, থিয়েটার-হল সব দেখালেন। সুদূর মণিপুরে এসেও যে তাঁরা এমন সুন্দর আছেন, দেখে বাস্তবিকই আনন্দ অনুভব করতে হল। বাবুপাড়ার রাজপথ ছাড়িয়ে আমরা পিচের রাস্তায় পড়লাম —তার পাশে-পাশে, আদালত, ট্রেজারী, পলিটিকেল এজেণ্ট ও দেওয়ান সাহেবের বাড়ী। আরও খানিকটা এগিয়ে বাজারের নিকটে সেনা-নিবাস।

পরদিন সোমবার সকালে আমরা চলে গেলাম এগিয়ে আরও ১৮ মাইল, সহর থেকে বিষ্ণুপুর বলে একটী গ্রামে। বিষ্ণুপুরের

নিকটেই মণিপুরের বিখ্যাত লোগ্‌টাক্ লেক্। জায়গাটীর নির্জ্জনতা বড় ভাল লাগ্‌ল। গাড়ী একেবারে ডাকবাংলোর দোরগোড়ায় এনে ফেল্‌লে। একেবারে পাহাড়ের কোলে আমরা আশ্রয় পেলাম। পাহাড়টী হচ্ছে 'নুসাই হিল'; নিকটেই এর গা বেয়ে একটা ছোট্ট নদী লোগ্‌টাকে গিয়ে মিশেছে। নদীর ওপর ঝোলা পোল দিয়ে, ডাকবাংলোর সামনের হাঁটা পথটী চলে গেছে শিলচর—শ'খানেক মাইলের ওপর।

এবার লেকের আর মণিপুরীদের বিষয়ে কিছু বলে আমার কাহিনী শেষ করব। একদিন, কবে মনে নেই, খুব প্রত্যূষে আমরা ভীষণ কুয়াসার ভেতর লোগ্‌টাকের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম। ছোট ছোট বোটই বেশী। তাতেই চেপে আমরা হ্রদের ওপর বেড়াতে বেরোলাম—উদ্দেশ্য কিছু শিকার করা; কারণ বন্ধুবর সর্ব্বজিৎ বন্দুক এনেছিলেন। সারা হ্রদটী কচুরিপানায় ভরা—এতবড় হ্রদ, যার হদিস্ আমরা ৬ ঘণ্টা ঘুরেও পেলাম না, তাকে কচুরীপানায় এত হতশ্রী করে রাখবে আশা করি নি। যাই হোক, কুয়াসা ভেদ করে আমরা এগোতে লাগ্‌লাম। খানিক দূরে কয়েকখানি ভাসমান জেলেদের কুটীর, আর মাঝে-মাঝে ছোট দ্বীপ। মাঝামাঝি এসে অসংখ্য পাখীর ঝাঁক মিল্‌ল—রাজহাঁস থেকে বন্যকুক্কুট পর্য্যন্ত। হ্রদের মাঝখানে কয়েকটী পর্ব্বতশ্রেণী মাথা উঁচু করে আছে, তার একটীতে আমরা গেলাম। এই পাহাড়ে দ্বীপগুলিতে কয়েকটী পল্লী আছে—সমস্ত পল্লীতে মণিপুরীর বাস। পাহাড়ের কোলে জল ভারী সুন্দর লাগ্‌ল। কুয়াসার জন্যে ভাল ছবি তোলা হল না।

লোগটাকের আর এক কিনারায় মইরাং, বিষ্ণুপুর থেকে আট মাইল দূরে। অনেক লোক থাকে এখানে এবং এক কালে এই মইরাংই না কি মণিপুরের রাজধানী ছিল। বিষ্ণুপুর পল্লী এই মইরাং থানা ও পোঃ অফিসের এলাকায় পড়ে, তাই বাড়ীতে চিঠি পাঠাতে বেশ মুস্কিল হত। কখনও কখনও বাসের ড্রাইভারকে দিয়ে সহরে পোষ্ট করানো হত।

মণিপুরে আমরা তিন রকম লোক দেখতে পাই—'নাগা', 'কুকী' ও মীথি, যাদের আমরা বলি মণিপুরী। সবার বিষয়ে বল্‌তে গেলে হয় ত পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে; তাই শুধু মণিপুরীদের কথাই বলি। এদের হাব ভাব পার্ব্বত্য আসামীদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এদের ধর্ম্ম হল বৈষ্ণব, রাজা হতে প্রজা পর্য্যন্ত। কুসংস্কার ও অনেক রকম দেবতারও মানত করা এদের ভেতর অনেক আছে। 'সেনামিহি', 'লামলাই' প্রভৃতি শক্তি ও স্থানীয় দেবতার ভয় এদের খুব। এ ছাড়া শ্রীগোবিন্দজীর পূজা সকলেরই করে থাকে, মন্দিরে।

মণিপুরের অধিবাসীরা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে নাগা, কুকীর তুলনায় সভ্য এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। পুরুষেরা প্রায়ই বাঙ্গলা ধাঁচে কাপড় পরেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা বুকে আঁটা, ডোরা লুঙ্গী, হাঁটু পর্য্যন্ত ও রঙ্গীন বা সাদা ওড়না ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব বেশী, সকলেই পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জ্জন করে; পর্দ্দা ও সতীত্বের শাসন কম। বিবাহবিচ্ছেদ (divorce) চলে; আবার পুরুষে একাধিক বিবাহও করতে পারে। বেশীর ভাগই মণিপুরী পুরুষের ২।৩টা করে স্ত্রী থাকে এবং সেই স্ত্রীরা তাদের স্বামীকে খাওয়ায়। বর্ম্মার নিকট বলেই বোধ হয় পুরুষেরা একটু কুঁড়ে, কিন্তু নারীরা কর্ম্মপ্রবণ।

অঙ্গশ্রীর মধ্যে এদের ছোট টানা চোখের সৌন্দর্য্য আছে—রং ময়লা নয়, হল্‌দেটে ফরসা। কুমারী মেয়েদের চুল বব্ করে ছাঁটা; বিবাহ হবার পর আর কাট্‌তে দেয় না। সৌষ্ঠবের মধ্যে পুরুষের দেহ বেশ শক্ত; কিন্তু মেয়েদের দেহ অত খাটলেও মোটেই আঁটসাট নয়। পায়ে জুতো মেয়েপুরুষ বেশী ব্যবহার করে না। বৈষ্ণবী বলে সকলেরই গলায় মালা;—মাছ মাংস খায় না। মাংস ত মোটেই নয়; তবে শুট্‌কি, কই মাছ কেউ কেউ খায়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদেরই বৈচিত্র্য বেশী বলে, তাদের চেহারার নিদর্শন একটী ছবিতে দিলাম। কুকী মেয়েরাও ধরেছিল তসবীরের জন্য, তাও সঙ্গে রহিল। এদের পোষাকে মৌলিকত্ব নেই—মণিপুরীদের ছাঁটেই করা।

মণিপুরের নৃত্যের খ্যাতি শুনেছিলাম, কিন্তু দেখবার সে রকম সুবিধে হয় নি। তাদের বিশেষ পরিচ্ছদ পরে নাচই নাকি খুব সুন্দর, এবং সে নাকি রাস ও বিশেষ কোন উপলক্ষ না হলে হয় না। তাই আমাদের খুবই হতাশ হতে হল। শুনলাম রাজবাড়ীতে খুব জাঁকজমক করে

রাসলীলা হয়, কিন্তু রাস পর্য্যন্ত থাকা আমাদের সম্ভব হয়ে উঠল না। শুধু একদিন নয় পূর্ণিমার ছ দিন আগে হতে উৎসব আরম্ভ হয় এবং রাসপূর্ণিমার দিন উৎসব শেষ হয়। মহারাজার সামনে মণিপুরী মেয়েদের নৃত্য দেখবার খুব লোভ হয়েছিল; কিন্তু অত দিন থাকা কি করে চলে,—ইউনিভার্সিটির ক্লাস খুলে যাবে তার আগে।

অতএব ১লা অঘ্রাণ মঙ্গলবার ফেরবার দিন ঠিক হল। আগের দিন রাত্তিরে ওখানকার রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত মনোমোহন কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। পরদিন সকালবেলা আমাদের host শ্রীমান সর্ব্বজিৎ সিংকে অনেক-গুলো ধন্যবাদ জানিয়ে বাসে চাপা গেল। কুয়াসার ভেতর ইম্ফাল ছেড়ে গাড়ী পাহাড়ের দিকে চল্‌ল—আমাদেরও আমোদে গলা দিয়ে গানের স্রোত বহিতে লাগ্‌ল।

বুধবার পথে ব্রহ্মপুত্রর ধারে আমিনগাঁওতে এক পিক্‌নিক করে রাত্তিরে শিলং মেল চড়ে পরদিন সকালে কল্‌কাতা—সেই জনাকীর্ণ কল্‌কাতায় ফেরা গেল।

পত্র

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট (পেরিস)

হাফিয হইতে। মূলের ছন্দের অনুকরণে)

আয্ খুনে। দিল্ নভিশ্‌তম্। নয্ দীকে। য়ার নামাঃ

লিখিনু দিলের খুনে বঁধুরে পত্রখানি,—
"পলকে বিয়োগ তব প্রলয়- মতন মানি।
কত না করি পরখ, হ'ল না লভ্য কিছু
পরখে পরখ-করার কেবলি পাইনু হানি।
তোমারি বিচ্ছেদে গো নয়নে চিহ্ন শত,
নিশানি নয় কি চোখে অঝোর এ চোখের পানি?
হকীমে জিজ্ঞাসিনু, 'জান কি বঁধুর ধারা?'
'দূরেতে নরক জ্বালা, নিকটে চোখ রাঙানি।'
বলিনু, 'খাই গালি তার পিছনে বেড়াই যদি;'
বলিল, 'খোদার কসম! গালি যে প্রেমের বাণী।'
ভিতরে দগ্‌দগি ঘা, মুখেতে কাজ কি ব'লে?
দেখ না কলম-চোখে ঝরিছে কতই পানি।
মলয়া ঘোম্‌টা খুলে দেখা'ল আমার চাঁদে
যেন গো মেঘ সরায়ে বেরুল সুরজ খানি
পরাণী বদল দিয়ে হাফিয মাগে,—
পিয়াসী পাত্রে তব পিয়িতে মেহেরবাণি।"

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দামোদরের সমস্যা

নদীয়া জেলার পালঘাটি গ্রামের থার্ড মাষ্টার দামোদর দত্ত মাত্র ত্রিশ টাকা বেতন পাইত। দামোদরের বিদ্যা-বুদ্ধির মূল্য অবশ্য ৩০৲ টাকার অনেক বেশী; অন্ততঃ তাহার সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ও অপর পাঁচ-জনের কাছেও তাহা অনেক সময়ে প্রতিপন্ন করিত। কিন্তু বাজার-দর খারাপ। তা' ছাড়া কতকগুলি বিশিষ্ট কারণের ফেরে পড়িয়াই দামোদরকে এই সামান্য স্কুল-মাষ্টারিতে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। কারণগুলি এই:—

দামোদরের পিতা বাঞ্ছারামের অবস্থা কোনকালেই ভাল ছিল না; পৈতৃক বিঘা সতের জমীই ভরসামাত্র ছিল। কিন্তু সংসারের এই আর্থিক অভাব মিটাইতেই বোধ হয় বাঞ্ছারাম দুই'টি দার-পরিগ্রহ করেন। দামোদর প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র পুত্র; কিন্তু বাঞ্ছারামের দ্বিতীয় সংসারটি ক্রমে সংখ্যাবহুলই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি একটি করিয়া দ্বিতীয় পক্ষে তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছিল। দুইটি ছেলে হইবার পর—তখন দামোদর কলিকাতায় কলেজে বি-এ পড়িতেছিল—বাঞ্ছারাম তাহাকে লিখিয়া জানান যে, দামোদরের বিবাহে প্রাপ্ত টাকা শেষ হইয়াছে, কাজেই তাহাকে পড়ার খরচ দেওয়া অসম্ভব। বলা বাহুল্য ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই দামোদরের বিবাহ হইয়াছিল। ইহাতে অবশ্য দামোদর আর পড়াশুনায় অগ্রসর হইতে পারিল না। কেমন করিয়া আর পড়িবে? একেই বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত পাঠ্য-পুস্তক হইতে তাহার মন একটু একটু করিয়া অপসৃত হইতেছিল; তাহার উপর এই অলঙ্ঘনীয় বাধা। দামোদর কলেজ ত্যাগ করিয়া দেশের বাড়ীতে আসিয়া বসিল। কিন্তু বাড়ীতেও আহারের অপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহার সুস্থির হইয়া বসিবার উপায়ও ছিল না। বাঞ্ছারাম ও দামোদরের বিমাতা, ইঁহারা তাহাকে বসিয়া থাকার বিরুদ্ধে অনেক প্রবল যুক্তি দেখাইলেন। শেষে বাঞ্ছারামই গ্রামের স্কুলের সেক্রেটারি অতুল চাটুয্যেকে ধরিয়া, অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়া, দামোদরের জন্য থার্ড মাষ্টারির কাজটি আদায় করিয়া দেওয়ায়, দামোদরকে বাধ্য হইয়া তাহা বজায় রাখিতে কষ্ট করিতে হইতেছে।

তবে বাড়ীতে শান্তি নাই। বাঞ্ছারামের দ্বিতীয় পক্ষ প্রবল; প্রথম পক্ষ আবার সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। দামোদরের মাতাঠাকুরাণী—জননী তারাসুন্দরী—অত্যন্ত শিথিল প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার নিজের স্বার্থ সুবিধা অধিকার সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা তাহার থাকিলেও, সে-সমস্ত রক্ষা করার বা দাবী করার মত কর্ম্ম-প্রবৃত্তি তা'র কখনো ছিল না। সপত্নীরূপ প্রত্যক্ষ ও সাবয়ব উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও, বাক্য ব্যতীত কার্য্যে তা'র উৎসাহ বড় দেখা যাইত না। দ্বিতীয় পক্ষ—দুর্গারাণীর প্রকৃতি ঠিক ছিল বিপরীত; বাক্য ও কার্য্য দুইই সে সমান নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিতে পারিত। কাজেই বাঞ্ছারাম যে স্বাভাবিক কারণেও দ্বিতীয় পক্ষের উৎসাহে সেইদিকেই ঝুঁকিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র-কন্যাদেরও যে দাবী ও জোর একটু সরব ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও স্বাভাবিক। দামোদরের বৈমাত্র ভাইগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি—সীতারাম, হরিপদ বড় হইয়া উঠিয়াছিল। সীতারামের বয়স প্রায় ১৬; সে দামোদরের চেয়ে ৫।৭ বৎসরের ছোট; গ্রামের স্কুলেই পড়ে বা পড়িবার নাম করিয়া যায়। দ্বিতীয়টির বয়স মোটে ১৩; সে কিছুই করিতে চাহে না। আগে পাঠশালায় যাইত—কিন্তু গুরুমহাশয়ের সহিত দ্বিতীয় ভাগ না শিশুপাঠ কি একখানা পুস্তকের পাঠ্য-বস্তু লইয়া মতান্তর হওয়ায় আর যায় না। দুর্গারাণী বলে, দোষটা গুরুমহাশয়েরই। মতান্তর যাহা

ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষ কিছু নহে; তবু গুরুমহাশয় না কি বেত্রচালনা করিয়াছিলেন। অথচ বিষয়টি সামান্য; গুরুমহাশয় যাহাকে পাঠ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, হরিপদ তাহাকে অপাঠ্য বিবেচনা করিয়াছিল, কেবল এইটুকু মতান্তরে অমন ক্ষমতার ব্যভিচার করা গুরুমহাশয়ের উচিত হয় নাই। কাজেই হরিপদ এখন ছিপ্ হাতে করিয়া পুকুর পাড়ে মৎস্য শিকারে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার পরে কন্যা শ্যামা। শ্যামার বয়স প্রায় ১১ বৎসর। সে মার কাছে তিরস্কার খায় ও পাড়ার ও গ্রামের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লোকনির্বিশেষে ও বিনা পুরস্কারে তাহা প্রচার করিয়া বেড়ায়। ছোট বৈমাত্র ভাইটি এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই; কিন্তু বাড়ী শুদ্ধ সকলের মতে তাহার বুদ্ধির কাছে না কি অনেক বৃদ্ধও পরাজয় না মানিয়া পারে না। এতগুলি অসামান্য প্রাণীর চেষ্টা ও ব্যবহার যে একটু অশান্তির কারণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ যখন আবার বাঞ্ছারামের মতে দামোদরের মাহিনার ৩০৲ টাকার উপর বাঞ্ছারামেরই পূর্ণ দাবী আছে, তখন দামোদরকে অন্তত ২৫৲ টাকাও পিতৃকরে সমর্পণ করিয়া অশান্তি ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু দামোদরের অশান্তির আরও গূঢ় কারণ ছিল। তাহার স্ত্রী রাধারাণী—বিবাহের পর একবার মাত্র স্বামীর বা শ্বশুরের ঘর করিতে আসিয়াছিল; প্রায় মাস ছয় সাত ছিলও। কিন্তু তার পর সেই যে পিত্রালয়ে গিয়াছে আর প্রত্যাবর্ত্তনের নামও করে না। দামোদর লোক মারফত ২।৩ খানা চিঠিও দিয়াছিল, কিন্তু কোনও জবাব পায় নাই। নিতান্ত পার্শ্বের গ্রামেই শ্বশুরালয় হইলেও, দামোদরের যাইবার উপায় ছিল না। কেমন লজ্জা করিত। শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়ার সংবাদটা সর্ব্বদাই সীতারাম ও শ্যামার কল্যাণে গ্রামময় এত বর্ণ-বিচিত্র হইয়া ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল যে, সে কথা মনে হইলেই দামোদরের সপ্রতিভ প্রকৃতি কুণ্ঠিত হইত। তাহার বিবাহের পর প্রথম যেবার সে শ্বশুরবাড়ী যায়, সেবারে আর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তাহার দুই দিনও তিষ্ঠান দায় হইয়াছিল। ভাগ্যে তখন সে কলিকাতায় পড়িত; তাই কলিকাতার মেসে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এখন ত' ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, দামোদরের শ্বশুর নিতাই ঘোষ না কি আর বাঞ্ছারামের সংসারে কন্যাকে পাঠাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ইহার উত্তরে বাঞ্ছারামও না কি প্রচার করিয়াছে, যে নিতাই ঘোষ কন্যাকে তাহার স্বামীর ঘরে যতক্ষণ না পৌঁছাইয়া দিয়া এই ব্যবহারের জন্য জবাবদিহি করিবে, ততক্ষণ পুত্রবধূকে আনা হইবে না। দামোদর সমস্তই শুনিতে পাইত। রাধারাণীও যে তাহার পত্রের উত্তর না দিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিত। অথচ স্ত্রীকে না লইয়া চলে কি করিয়া? সংসারে তাহার মন বসে না; সেখানে তাহার আপনার বলিতে কিছু নাই। এক জননী;—তা' জননীরও ত' আচার ব্যবহার তাহার পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ নহে। তা' ছাড়া, স্ত্রী এক বস্তু! বিশেষতঃ যখন কিছুদিন তাহার সহিত একত্র সংসার করিয়াছে, মিশিয়াছে ও দু'জনের ভিতর প্রণয় ঘটিয়াছে! দামোদরের নিকট সমস্ত জগৎটা সেই স্ত্রীর অভাবে বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে; কোন কাজেই আর স্পৃহা নাই। তার উপর স্কুলে ও গ্রামে সকলেই তাহাকে এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার মনকে আরও অশান্ত করিয়া তুলে। দামোদর সমস্যায় পড়িল, কি করিয়া স্ত্রীকে আনা যায়?

অনেক কিছু চিন্তা করিয়া শেষে প্রথমে সে কথাটা পাড়িল মা'র কাছে। তারাসুন্দরী তিন রকম বিভিন্ন মত প্রকাশ করিল। প্রথমে বলিল, "মেয়ে না পাঠায়, তা'দের মেয়ে তা'দের কাছে থাক্। তোর আবার বিয়ে দিচ্ছি, দেখ্।" পরক্ষণেই মনে পড়িল নিজের কথা; সপত্নী লইয়া ঘর করা কি সহজ ব্যাপার? কহিল, "পাঠাবে না কি রকম? বিয়ে দিতে পেরেছে, মেয়ে পাঠাবে না ত কি? আদালত কোর্ব্ব না?" কিন্তু আরও ভাবিয়া, আদালত করার উৎসাহ তার হ্রাস পাইল। শেষে রায় দিল, "তা' এখানে আর কি দেখে পাঠাবে? আমার কি চাল আছে না চুলা আছে? আমারই দুর্ভাগ্যে তোর এই লাঞ্ছনা। তা' একবার না হয় সেখানে যা'; অন্ততঃ কেন পাঠাচ্ছে না তা'ও ত জান্তে পার্‌বি!" দামোদরের মনের ভিতর এই ইচ্ছাটাই কয়দিন হইতে প্রবল হইতেছিল। সে বলিল, "আমিও তাই ভাব্‌ছি, মা। কিন্তু বাবা নাকি বলে বেড়িয়েছে যে

নিতাই ঘোষ মেয়ে পৌঁছে না দিলে, আর কৈফিয়ৎ না দিলে, তা'কে আন্‌বে না। যদি রাগ করে?"

তারাসুন্দরী রাগিয়া উঠিল, "রাগ করে, কর্ব্বে। এমন কথাও ত শুনি নি। নিজের বেলায় বুঝি মনে থাকে না?" তা'র পর তা'র প্রকৃতির নির্ভরশীলতা প্রকট হইল। বলিল, "একবার না হয় বলে যাস্ যাবার সময়।"

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় দামোদর বাঞ্ছারামের কাছে কথাটা পাড়িতেই, বাঞ্ছারাম একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "না, খবরদার না। কিছুতেই তোমার যাওয়া হবে না। এত তা'দের কিসের স্পর্দ্ধা? আমার ছেলেকে, আমাকে, অপমান করা? তুমি আবার যেতে চাইছ কোন্ লজ্জায়?"

দুর্গারাণীও যোগ দিল, "আজকালকার ছেলেদের লজ্জা-সরম কি কিছু আর আছে? কেন তুমি ওকে বাজে কথা বল্‌ছো? ওদের নিজেদের সম্ভ্রমও নেই; বাপ পিতা'ম'র সম্ভ্রমও রাখ্‌তে জানে না।" দামোদর ব্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। অনুযোগ করিল, "কিন্তু ব্যাপারটা কি একবার সন্ধান করা ত উচিত।" আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই দুইজনের সম্মুখে কেমন তাহার বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল এবং অদূরে শ্যামার মুখে হাসি দেখিয়া স্তব্ধ হইল।

দুর্গারাণী বলিল, "ব্যাপার আবার দেখতে যাবে কি? ব্যাপার ত দেখাই যাচ্ছে। তা'রা মেয়ে পাঠাবে না। এখানে নাকি মেয়ের অনাদর হয়! বাপ রে! দেখে আর বাঁচি না।"

বাঞ্ছারাম বলিল, "অনাদর হয় হবে। আমার সংসারে এলে যেমন ইচ্ছে সেই রকম আমি রাখবো। জমিদার দেখে বিয়ে দিতে পারে নি? মেয়ে হাতী ঘোড়া হাওয়াগাড়ি চড়ে বেড়াত!"

শ্যামা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তা' দাদার ইচ্ছে হয়েছে বৌদিকে দেখতে, যাক্ না বাপু!" দুর্গারাণী সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

দামোদর আর সেখানে দাঁড়াইল না। একেবারে বাড়ীর বাহিরে গিয়া হাঁফ ছাড়িল, 'উঃ! ঐটুক মেয়ে কি রকমই না কথা শিখিয়াছে। আচ্ছা করিয়া উহার কাণ মলিয়া দু' গালে দু' চড় দেওয়া হয়, তবে ঠিক হয়!' তাহার ক্রমশঃ রাগটা পড়িল বাঞ্ছারামের উপর। "এ কি জিদ্! তাহার স্ত্রী আসে না আসে সে বুঝিবে; পরের ইহা লইয়া ভাবনা কিসের? শুধু ভাবনা? সে স্ত্রী আনিবে, কি না আনিবে—এ বিষয়ে হুকুম করিবে অপরে, আর সে তাহা স্বীকার করিয়া তাহা পালন করিবে? কেন? যদি এখন নিতাই ঘোষ ২।৪ বৎসরই মেয়ে না পাঠায়? যদি একেবারেই না পাঠায়? দামোদর কি করিবে? পুনরায় সে বিবাহ করিবে? তাহার পর? বাঞ্ছারামের পুত্রও বাঞ্ছারামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, আর সমান ফলভোগ করিবে? দুইবার বিবাহ? প্রথম প্রণয়ের পর আবার কি প্রণয় হয়? ওসব অনাচার হইবে না; দামোদর প্রথম প্রণয়ের অবমাননা করিতে পারিবে না। কিছুতেই নয়। কিন্তু কর্ত্তব্য কি এখন?" দামোদর উভয় সঙ্কটে পড়িল। তাহার সমস্যা জটিল, কি করিয়া সমাধান করিবে? দিক্ নির্বিশেষে দামোদর চিন্তাকুল হইয়াই পথে চলিতেছিল; ইচ্ছা নির্জ্জনে বসিয়া এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা করিবে। কিছুদূর যাইবার পর দেখিল হরিপদ ছিপ হাতে ফিরিতেছে। দামোদরকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া, কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "ভূতো দিয়ে গেছে।"

'ভুতো' দামোদরের শ্বশুরবাড়ীর ভৃত্য। ভুতোর নাম শুনিয়া দামোদরের বুকের ভিতর রক্ত নাচিয়া উঠিল। দামোদর চিঠিখানি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন, কোথায়, দিয়ে গেল?"

হরিপদ তখন প্রায় দশ হাত দূরে গিয়াছে; সেইখান হইতেই উত্তর দিল, "দুপুরে; আমি খেয়ে যখন বেরুছিলুম। তুমি ইস্কুলে গিছলে, তাই আমি রেখেছিলুম।"

দামোদর চিঠিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিল। ইহা তাহার স্ত্রীর নহে। খোলা কাগজের টুক্‌রাতে নিতান্ত অস্পষ্ট জড়ান হাতে লেখা। ইহা নিতাই ঘোষের চিঠি। ভাঁজ খুলিয়া দামোদর পড়িল, "কল্যাণ-বরেষু, বাবাজীবন, বহুদিন তোমার কুশল খবর পাই নাই। পত্রপাঠ পার ত সোণাপুরে একবার আসিবার চেষ্টা করিবেক।—ইতি, নিতাই ঘোষ।"

চিঠি পড়িয়া দামোদর পিছন ফিরিয়া দেখিল যে হরিপদ

বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, যে এই চিঠি অন্য কেহ দেখিয়াছে কি না। কিন্তু সে বিষয়ে উপস্থিত কোনও সংবাদ পাইবার উপায় নাই। হরিপদ'র সময়ের অভাব। তাহাকে পাওয়াও মুস্কিল। তবু প্রশ্নটা সময়ান্তরে একবার করিবে, সে স্থির করিল।

নিতাই ঘোষের চিঠি তাহার মনে অত্যন্ত লোভ জন্মাইয়া দিল। যাহাই হউক, সে একবার যাইবেই। রাধারাণীকে না পাইলে, না দেখিলে তাহার কিছুতেই চলিবে না। মনে মনে সে একটি মতলব স্থির করিয়া লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"কন্যা পাঠাইব না"

উপরি-উক্ত ঘটনা যে সপ্তাহে ঘটে, তাহার পরের সপ্তাহের শনিবার স্কুলের ছুটি হইতেই, দামোদর তাড়াতাড়ি বাড়ী, আসিয়া বাঙ্গারামকে বলিল যে, সে বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতা যাইতেছে, সোমবার কি মঙ্গলবার ফিরিবে। বাঙ্গারাম সেইমাত্র দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া নিজের হাতে সাজা তামাক লইয়া বসিয়াছিল। এই সময়ই বাঙ্গারাম একলা থাকিত; কেন না অপর সকলে হয় দিবানিদ্রায় তখন মগ্ন থাকিত; না হয় বাড়ীর বাহিরেই আলাপ পরিচয়ে যাইত। এই সময়ই বাঙ্গারামের তর্ক, জেরা, প্রশ্ন করার মত কোনও উত্তেজনা থাকিত না, তাহা দামোদর জানিত। বাঙ্গারাম কোনও আপত্তি করিল না। কিন্তু দামোদর কলিকাতায় গেল না। গেল পার্শ্বের গ্রামে সোণাপুরে নিতাই ঘোষের বাড়ীতে। পৌঁছিতে তা'র প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনের পথে প্রায় ৩।৪ মাইল হাঁটিয়া, তার পর আবার অন্য পথে ঘুরিয়া আরও ৫।৭ মাইল চক্রাকারে তাহাকে হাঁটিতে হইল। তাহা না হইলে তাহার গ্রাম হইতে নিতাই ঘোষের বাড়ী যাইতে ১½ ঘণ্টার বেশী লাগে না। কিন্তু কলিকাতার পথ নিতাই ঘোষের বাড়ীর দিক দিয়া না যাওয়াতে তাহাকে লোকের চক্ষু এড়াইতে অনর্থক বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইল।

নিতাই ঘোষ তখন বাড়ী ছিল না। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র রমাই বাড়ীতে ছিল; তা' ছাড়া অন্য পুত্রেরা, বলাই, কানাই, ও যাদব সকলেই ছিল। রাধারাণী রমাই-এর নীচেই; রমাই-এর বয়স প্রায় দামোদরেরই বয়সের সমান। রাধারাণীর বয়স ষোল বৎসর হইবে, কি হইয়া গিয়াছে। দামোদর ঠিক জানিবার অবসর পায় নাই কখনো। দামোদরকে দেখিয়া রমাই, কানাই, ও যাদব সকলেই আনন্দিত হইল। রমাই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। যাদব ছুটিয়া গিয়া বাড়ীর ভিতরে খবর দিল। নিতাই ঘোষের স্ত্রী ও রাধারাণী তখন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিল। ব্যস্ততা আরও বাড়িয়া গেল। রাধারাণী এখন কি ভাবিয়া হঠাৎ মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। যাদব হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "দিদি, সুখবর দিলুম কি দিবি?" রাধারাণীর মা হাসিলেন। রাধারাণী যাদবকে কিল দেখাইল।

পা হাত মুখ ধুইয়া দামোদর বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া রমাইকে কুশল প্রশ্ন করিল। তার পর একে একে রাধারাণী ব্যতীত সকলের সংবাদ লইল। কেমন ধান হইয়াছে, গরুগুলি সব দুধালো কি না, পুষ্করিণীতে মাছ আছে কি না, পালঘাটিতে কেন বলাই ও রমাই মাঝে মাঝে যায় না, রমাইদের গ্রামের সখের থিয়েটার কেমন চল্‌ছে, ইত্যাদি সমস্ত খবর লইল। রমাই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া উল্টা প্রশ্ন করিল, "এত খবর 'ত নিচ্ছ; এতদিন আস্‌তে কি হয়েছিল? এই দু' ঘণ্টার রাস্তা ত। মাঝে মাঝে এলেই পার।"

দামোদর উত্তর দিল, "স্কুলে বড় কাজ। খেটে আর শেষ হয় না। একটা রবিবার; তা'ও সেক্রেটারী মশা'য়ের সমস্ত জরুরী চিঠিপত্র ইংরাজিতে লিখে দিতে হয়। সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি না। অনেক বলে কহে তবে এবার এসেছি।"

রমাই মাইনর স্কুলে ২।৪ বৎসর পড়িয়াছিল মাত্র। এখন সে পিতার সহিত ক্ষেতবাড়ি দেখে। নিতাই ঘোষের অবস্থা খুব ভাল। প্রায় ১০০।১৫০ বিঘা চাষের জমি; ৩।৪টা বড় বড় পুষ্করিণী; গোশালে গরু; বাড়ীর উঠানে বড় বড় ধানের মরাই। বাড়ীটি একতলা হইলেও পাকা। ৫খানি বেশ বড় বড় ঘর; ভিতরে প্রকাণ্ড আঙ্গিনা; এক পাশে প্রকাণ্ড দালান-দেওয়া রন্ধনশালা। বাহিরে একদিকে গোশালা, আর একদিকে চণ্ডীমণ্ডপ। সমস্তই শ্রীসম্পন্ন; পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। নিতাই ঘোষ নিজে

উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। রমাইও পিতার সহিতই সমানে কাজকর্ম্ম দেখিতে করিতে শিখিতেছে।

দামোদরের না আসার কারণ শুনিয়া রমাই সন্তুষ্ট হইল। দৈহিক পরিশ্রম সে করিতে পারে; কিন্তু লেখাপড়াতে যে মানসিক পরিশ্রম হয় তাহার প্রতি রমাই-এর সসম্মান ভয় ছিল। সে সায় দিল, "তা বটে। তবু একবার আস্‌তে হয়, দামোদর! কতদিন আস্ নি।"

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে জলযোগের জন্য দামোদরের আহ্বান আসিল। যাদব আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া একটি ঘর দেখাইয়া দিল। দামোদর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী একখানি থালায় নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়া, আসন পাতিতেছেন। আসন পাতা হইলে তিনি বলিলেন, "এসো বাবা।"

দামোদর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি আবার বলিলেন, "বোস। একটু জল খেয়ে নাও। এতটা পথ এসেছ। বাড়ীর সব ভাল ত? মা, বাবা, সীতারাম, হরিপদ, শ্যামা, সবাই বেশ ভাল আছে?"

দামোদর আসনে উপবেশন করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ, সবাই ভাল আছে।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী যাদবকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই এখানে বস্ জামাইবাবুকে খাওয়া। আমি আস্‌ছি।"

যাদব বসিয়া বলিল, "জামাইবাবু, খান।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। খাইতে বসিয়া দামোদর যাদবকে কত প্রশ্ন করিল; কিন্তু আসলে রাধারাণী সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে পারিল না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, রাধারাণী কোথায় ও কি করিতেছে। কিন্তু তাহা পারিল না। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, যাদব বলিল, "বাবা ফিরে এসেছেন যেন মনে হ'চ্ছে।"

দামোদর অকারণে চমকিয়া উঠিল। বলিল, "এসেছেন? তাই না কি?"

যাদব উত্তর করিল, "হাঁ। গলার আওয়াজ পাচ্ছি। দেখে আসবো? কিন্তু আপনি সন্দেশ ফেলে রাখ্‌ছেন কেন? ও আপনাদের সহরের দোকানের সন্দেশ নয়। বাড়ীর দুধের ছানা থেকে দিদি তৈরি করেছে।"

দামোদর সন্দেশ দুইটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিল, "বেশ হয়েছে, না? তোমার দিদি সন্দেশ কর্ত্তে শিখেছে?"

যাদব মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ। সন্দেশ, রসগোল্লা, নিম্‌কি, বোঁদে সব তৈরি কর্ত্তে পারে। আচ্ছা, জামাইবাবু, কল্‌কাতায় কি এ সব কিন্‌তে পাওয়া যায়?"

দামোদর হাসিয়া উত্তর দিতে যাইতেছে, এমন সময় নিতাই ঘোষ গাম্‌ছা হাতে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'এসেছ, দামোদর? বেশ করেছ! খাও, খাও। হাত গুটালে কেন? আমি এই বোস্‌ছি, এইখানে। মেঝেতে বসাই ভাল; এই গ্রীষ্মকালে ভারী আরাম লাগে। আমরা হ'চ্ছি চাষাভুষা মানুষ; মাটি ঘেঁটেই বেড়াই। এ বিলিতি মাটির মেঝে বড় লোকের বাড়ীতেই মানায়, বাবাজী।"

যাদব হাসিয়া বলিল, "তুমি তবে বড়লোক, না বাবা? তোমার বাড়ীতে বিলিতি মাটির মেঝে রয়েছে।"

নিতাই ঘোষ তাহাকে ধমক দিলেন, "তুই কি করছিস্? পালা। বড়লোক না ত কি গরীব? হাত পা' যা'র আছে, খাট্‌তে যে পারে সেই বড়লোক। বুঝ্‌লি? এখন পালা।"

যাদব উঠিয়া গেল। দামোদর অন্যমনা হইয়া তখনও সন্দেশ দুইটি লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল; নিতাই ঘোষ তাহা দেখিয়া বলিল, "ও ঘরে তৈরী সন্দেশ, বাবাজী। খেয়ে ফেল। ভাব্‌বার কিছু নেই।"

দামোদর একটু ভাঙিয়া মুখে দিয়া বলিল, "আপনি চিঠি দিয়েছিলেন, পেয়ে আমি আস্‌ছি।"

নিতাই ঘোষ জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওঃ।"

তা'র পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি পেয়েছিলে? ওঃ। তাই এসেছ?" শ্বশুরের ভাব দেখিয়া অস্বস্তিতে দামোদর ক্রমশই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছিল। সভয়ে উত্তর করিল, "হাঁ। চিঠি পেয়েছিলুম। তবে আস্‌তে একটু দেরী হ'য়ে গেল!"

নিতাই ঘোষ হাতের ভিজা গাম্‌ছা দিয়া বেশ করিয়া মুখ, হাত, বুক ও পিঠ মুছিয়া যেন আপন মনে বলিল, "ওঃ! তাই এসেছ?"

দামোদর আর এক টুক্‌রা সন্দেশ মুখে দিয়া বাকীটা

নিরীক্ষণ করিয়া যেন তাহা লইয়া গভীর গবেষণায় মনঃসংযোগ করিল।

নিতাই ঘোষ ঘরের চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর ঘরের ভিতরকার ছাদ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিল; শেষে সেখান হইতে দৃষ্টি নামাইয়া ঘরের দরজা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা ছিল, বাবাজী। তা' চিঠি পেয়েছিলে, তুমি? ওঃ।" সে গামছা লইয়া আবার মুখ ও বুক মুছিয়া লইল।

দামোদর গবেষণা হইতে মন আকর্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

নিতাই ঘোষ বলিল, "তাড়া কি? সব হবে, সব হবে। এসেছ যখন তখন কথা কি আর বাদ যাবে? এমন কথা কইব, তখন দেখ্‌বে। চাষাভুষো মানুষ বলে কি কথা কইতে পারি না? বিশেষ জামাই-এর সঙ্গে। তা' মনেও করো না, বাবাজী। এখন সন্দেশটুকু খেয়ে জল খেয়ে জিরিয়ে নাও। দু'দিন আছ ত? কথা হবে বৈ কি।"

দামোদর জবাব দিল, "পরশুই আবার ফির্‌তে হবে। স্কুলে ছুটি ত' পাই নি। পরশু গিয়ে স্কুল কোর্ব্ব।"

নিতাই ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল আছ 'ত? কাল? কাল?"

দামোদর উত্তর করিল, "কাল থাক্‌তে পারি। কিন্তু কথাটা বলুন না কি? আমারও মনটা বড় অশান্ত হয়েছে।"

নিতাই ঘোষ কি ভাবিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল "তাই বটে! তাই বটে! ওঃ! মন কি হয়েছে? কি বল্লে?"

দামোদর নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মনের সমস্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগ তাহাকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। এইমাত্র আসিয়াছে; এখনও রাধারাণীর সহিত দেখা হয় নাই। রাত্রে—কে জানে কত রাত্রে তাহার সহিত দেখা হইবে, এখন আর কোনও গোলযোগ তুলিয়া কাজ নাই। শ্বশুর মহাশয়ের আকৃতি ও প্রকৃতি সুবিধার নহে। নিতাই ঘোষ গামছা লইয়া হাত, মুখ ও বুক মুছিয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে খাইতে দামোদরের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া অপ্রয়োজনে আবার হাত, মুখ ও বুক মুছিয়া, বলিল, "কথাটা কি জান বাবাজী? কথাটা এই যে, রাধারাণীকে পাঠাবো না। বুঝ্‌তে পার্লে? রাধারাণীকে তোমাদের ঐ বাড়ীতে আর পাঠাবো না। বুঝ্‌তে পার্লে না? তোমার স্ত্রীকে—রাধারাণীকে তোমার বিমাতার ঘর কর্ত্তে পাঠাবো না। নিতাই ঘোষ পাঠাবে না; বুঝেছ? এ আর বুঝ্‌তে পার না?"

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া নিতাই ঘোষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, যেন একটা মস্ত কাজ শেষ হইল। যেন আর কিছু বলিবার বা করিবার নাই। দামোদর ইহারই আশা ও ভয় করিয়াছিল। তবু কথাটা শুনিয়া তাহার মনে যেন একটা গুরু আঘাত লাগিল। হাত সন্দেশ হইতে আপনিই গুটাইয়া আসিল। কিন্তু 'কেন?' এ প্রশ্ন করিবার সাহস তাহার হইল না। সে নতমুখে ভীতভাবে বসিয়া রহিল।

নিতাই ঘোষ উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময় বলিল, "খাও, খাও, সন্দেশটুকু খাও, বাবাজী! কিছু ভাব্‌বার নেই; কোনও অসুখ কোর্‌বে না। কিন্তু কথাটা ঐ বুঝেছ? রাধারাণীকে পাঠাবো না।"

দামোদর শির আন্দোলনে জানাইল সে বুঝিয়াছে। কিন্তু সন্দেশের উপকারিতায় সন্দেহ না করিলেও, তাহাতে আর তাহার আগ্রহ রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রণয়

রাত্রে আহারাদির আয়োজন প্রথামত হইলেও, দামোদরের মন বিকল হওয়ায় তাহাতে আর সে আনন্দ পাইল না। লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, মাছের কালিয়া, কিস্‌মিসের চাট্‌নি, ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা—চর্ব্ব্যচোষ্যের সমস্ত সমারোহ তাহার কাছে পরিহাস হইয়া না গেলেও, তাহাতে কোনও প্রকার রস সে পাইল না। তাহার মনের মধ্যে কেবল প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল, "রাধারাণীকে পাঠাবো না।" সে খাইবে কি করিয়া? শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ও রমাই-এর বহু অনুরোধে সে মাত্র মাছের কালিয়া দিয়া ৪।৫ খানা লুচি খাইল। কেন না রমাই খবর দিল যে তাহার জন্যই সন্ধ্যার পর

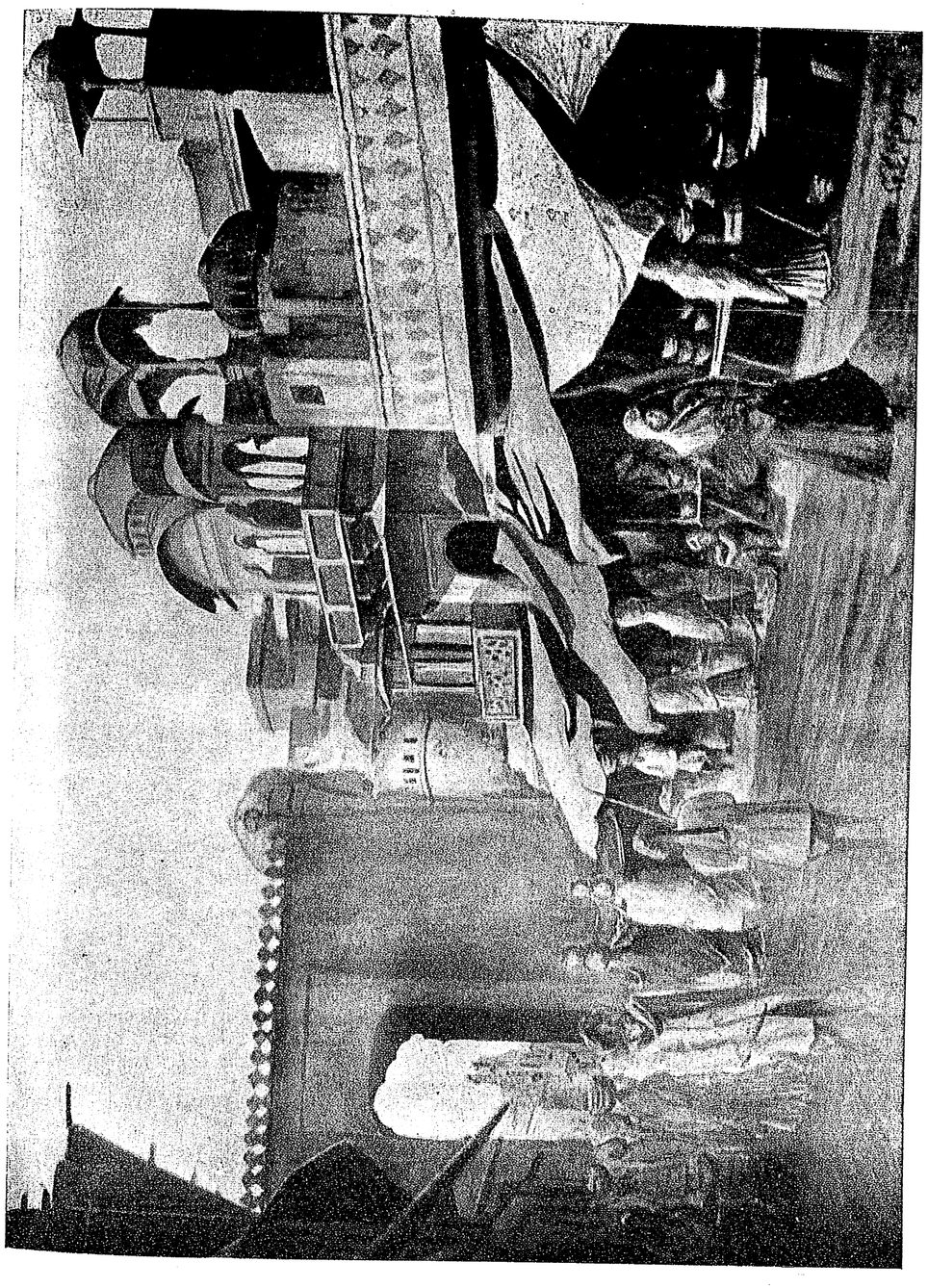

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল

যোধপুরের বাজার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

নিতাই ঘোষ জাল দেওয়াইয়া তাজা রোহিত মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অতি সুস্বাদু মৎস্য। যে পুষ্করিণী হইতে মৎস্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা না কি নিতাই ঘোষের অত্যন্ত যত্নের ও পরিশ্রমের জিনিস। তাই সে পুষ্করিণীর মাছ না খাইয়া নূতন অপরাধ করার ভয়ে দামোদর মাত্র কালিয়াই খাইল। আর কিছু খাইতে পারিল না। তাহার রুচিল না। আহারাদির পর সে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে একলা শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করিবে? রাধারাণী আসিলে তাহাকে কি বলিবে? নিতাই ঘোষ কি প্রকৃতির লোক তাহা সে জানে না। রাধারাণী ত' নিশ্চয়ই জানে। তাহার নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ সে লইতে পারিবে—পরে যা' হয় কর্ত্তব্য স্থির করিবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল; সারা অপরাহ্ণের পথ হাঁটার পরিশ্রম যেন এখন নিদ্রার উপহার লইয়া আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। অথচ নিদ্রা যাওয়াও ঠিক নয়। রাধারাণী কি মনে করিবে? এত দিনের বিরহ আজ মিলনে অবসান হবে, আর আজই কি না ঘুম? দামোদর উঠিয়া বসিল। ঘরের কোণে একটি পাত্রে জল ছিল; চোখে মুখে জল দিল। পাছে বিছানায় বসিলে শুইতে ইচ্ছা করে, তাই জানলার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আর মনে মনে কি ভাবে রাধারাণীকে সম্ভাষণ করিবে, কি কি কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। নিশ্চয়ই প্রথমে সে কথা বলিবে না; তাহার চিঠির কোনও জবাব সে দেয় নাই কেন? যদি সাধা-সাধির পর কথাই বলে, তা' হলে কি প্রথমে বলিবে? বলিবে "এ অভিনয় আর কেন? প্রেমের প্রণয়ের ত' শেষ হয়েছে! তবে আর কেন?" নাঃ। প্রথমেই এ'রকম বিদায়ের রাগিণী ভাল নয়। বরং জিজ্ঞাসা করিবে, "এত প্রেম যদি, তবে এতদিন ছিলে কেমন ক'রে!" কিন্তু নাঃ! তা'ও ঠিক হয় না। দূর ছাই! নভেল উপন্যাস মাথা খেয়েছে। রাধারাণী শুনিয়া যদি হাসে! এ-রকম অবস্থার অভিজ্ঞতা তাহার নাই; কি ভাবে আলাপ সুরু করা যায় তাহা ত' সে বুঝিতে পারে না।

দামোদরের আলাপের উপায় স্থির হইবার পূর্ব্বেই রাধারাণী ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। দামোদর ফিরিয়া দেখিল না বটে; কিন্তু সে বুকের স্পন্দনে বুঝিতে পারিল যে রাধারাণী আসিয়াছে ও তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া তাহার কাছে আসিতেছে। সে জোর করিয়া দৃষ্টি দিয়া বাহিরের অন্ধকার ভেদ করিতে চেষ্টা করিল। ক্রমশঃ তাহার পৃষ্ঠদেশে ঘাড়ে পিছনের দিকে কাহার উষ্ণ নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করিল। সে অচল হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

রাধারাণী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "এসো, আর রাগ কর্ত্তে হবে না। শুন্‌ছো? এসো, বস্‌বে এসো। অনেক কথা আছে বল্‌বার। আমি কি কোরবো? আমার উপর কেন তুমি রাগ কোরছ?"

দামোদর ঘুরিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমার রাগে আর কা'র কি এসে যায়?"

রাধারাণী তাহার উত্তর না দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া, তক্তপোষের বিছানার উপর বসাইয়া, নিজে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিল, "রাগ করেছ? আমার মুখের দিকে চাও না! মুখ তোল! দেখ চেয়ে; সত্যি, বল না। রাগ করেছ?" সে হাত দিয়া দামোদরের মুখ তুলিয়া ধরিয়া চোখে চোখ রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বল!"

দামোদরের সমস্ত চিন্তা, দুর্ভাবনা, প্রশ্ন, সমস্যা মুহূর্ত্তের জন্য যাদুকরের মোহন স্পর্শে শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে রাধারাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল। তাই 'ত! রাধারাণী ত' আর সে রাধারাণী নাই। এই কয়েক মাসের ভিতর মাধুরী বাড়িয়া গিয়াছে; মুখের কমনীয়তা, চোখের দৃষ্টির আকর্ষণ, সে বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতেছে। তাহার শ্যামবর্ণ রূপের ছটাকে যেন কোমল, স্নিগ্ধ আবরণে রমণীয়, বরণীয় করিয়া ফেলিয়াছে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। এই রাধারাণীকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া জীবন কাটাইবে?

রাধারাণী স্নিগ্ধকণ্ঠে অনুযোগ করিল, "রাগ পড়্‌ছে না বুঝি? তুমি কথা বল। তা'হলে রাগ পড়ে যাবে। বুঝেছ? বল। খুব বকো আমাকে, আর রাগ থাক্‌বে না।"

দামোদর তাহার হাত দুইটি ধরিয়া নামাইয়া তাহাকে কাছে আনিয়া বলিল, "রাগ নয়, রাণী; ভাব্‌ছি এ সব কি গোলযোগেই পড়্‌লুম। তোমার বাবা তোমাকে পাঠাতে চান না। কি করা যায়? ওখানেও যাওয়ার

কথা উঠ্‌লেই হাঙ্গামা পড়ে যায়। কার দোষ, কিসের জন্যে এত হো'ল, বুঝ্‌তে পারি না।"

রাধারাণী একটু চুপ করিয়া বলিল, "বাবা কিন্তু কিছুতেই পাঠাবে না। কেন, জান? ওখানে সত্যি আমার কষ্ট হয়। তুমি'ত থাক্‌তে না বড়; মাঝে মাঝে আস্‌তে; ২।৪ দিন থাক্‌তে, বড় জোর না হয় ১০।১৫ দিন। আর সব কথাও কিছু তোমাকে বলা যায় না, কিন্তু ওখানে আমি থাক্‌তে পারবো না।"

দামোদর বলিল, "তা' বুঝি। কিন্তু উপায় কি?"

"উপায়?" রাধারাণী দামোদরের চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, "উপায়? তুমি এইখানে এসে থাকো।"

দামোদর প্রশ্ন করিল, "কিন্তু স্কুল? চাক্‌রি!"

"এইখান থেকে কোর্‌বে। পার্‌বে না? দেড় দু' ঘণ্টার রাস্তা বৈ 'ত নয়। আমার জন্যেও পার্‌বে না!"

দামোদর বলিল—"তা' দেড় দু' ঘণ্টার রাস্তাও না হয় হাঁট্‌লুম, তোমার জন্যে। কিন্তু জান 'ত আমার বাবাকে। এই নিয়ে এমন গোলযোগ কেলেঙ্কারি করে তুল্‌বে যে চাক্‌রিও শেষে না যায়। তখন যদি চাক্‌রি যায় কি হ'বে?"

রাধারাণী উত্তর দিল, "সে যখন হবে দেখা যাবে। তেমন যদি হয়ই, তা'হলে কি আর বাবা এখানে তোমাকে দু'টি খেতে দিতে পার্‌বে না? সে খুব পার্‌বে।"

দামোদর ইহার জবাব দিয়া উঠিতে পারিল না। সে রাধারাণীকেই দেখিতেছিল, তাই ত' রাধারাণীকে ছাড়িয়া কি করিয়া সে ছিল এতদিন?

রাধারাণী বলিতে লাগিল, "আর আমাদের এখানেও ত' স্কুল আছে; সেইখানেই না হয় কাজ নেবে। বাবাকে বলে তোমার ব্যবস্থা করে দেওয়াব। পালঘাটিতে চাক্‌রি করাও যা' না করা'ও তাই। একটা পয়সা 'ত নিজের কাছে রাখ্‌তে পাও না। উল্‌টে আমার বিয়ের সময় বাবা যা' কিছু যৌতুক দিয়েছিলেন, তা'ও গেছে। এখানে থেকে চাক্‌রি কর্‌লে, তোমার সবই জম্‌বে। না কি না, বল না?"

দামোদর উত্তর দিল, "তা' বটে।"

"তবে? তোমার কোনও আপত্তি আমি আর শুন্‌বো না। সেখানে থেকে আর ভূতের বেগার খেটে দেহপাত কর্ত্তে হবে না তোমাকে। কেন কোর্‌বে? সীতারাম, হরিপদ 'ত বড় হয়েছে, কাজকর্ম্ম কর্ত্তে পারে না? কেন শুধু শুধু তা'দের ঘরে বসিয়ে খাওয়ান আর উল্টে জুতোর তলায় থাকা?"

দামোদর ভক্তের মত শুনিতে লাগিল। কিম্বা হয় ত' তাহার কাণে কোন কথাই প্রবেশ করিতেছিল না।

রাধারাণী বলিল, "জবাব দিচ্ছ না কেন? বল না 'হাঁ।' আমি কি মন্দ কিছু বল্‌ছি?" সে দামোদরকে নাড়া দিল।

দামোদর তাহাকে আকর্ষণ করিয়া উত্তর দিল, "ঠিক কথা তুমি বল্‌ছো, রাণী। এ খুব ঠিক কথা।"

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "দেখ, কি কষ্টই না এতদিন শুধু শুধু দিলে? একবার এলে কি তোমার খুব অপমান হোত? আমার কি যাবার উপায় আছে যে যাবো? তোমার মত পুরুষ মানুষ হ'লে যেতুম। কিন্তু তুমি কি বলে এতদিন খোঁজ-খবর না নিয়ে চুপ ক'রে ছিলে? একবারও মনে হো'ত না? একবারও না? বল না।"

দামোদর কহিল, "আমারও কি সুখে দিন কেটেছে, রাণী? তোমায় ২।৩ খানা চিঠি দিয়েছিলুম পাঠিয়ে—পাও নি?"

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "চিঠিতে কি মন উঠে? চিঠিতে কি হয়? না দেখ্‌লে—"

রাধারাণী পুরাদস্তুর প্রণয়িনীর মতই কথা সমাপ্ত করিল। দামোদর বলিল, "তা' ঠিক, রাণী। তবু খোঁজটি দিতে পারতে ত? কেমন আছ না আছ, তা' জান্‌তেও ত' আমার মন চাইতে পারে?"

"যে আমার হস্তাক্ষর, লিখ্‌তে লজ্জা ক'রে। আর এতই যদি আমার জন্যে দুর্ভাবনা হয়েছিল, ত' একবার এলে কৈ? তোমার কোন কথায় বিশ্বাস হয় না। এইখান থেকে এইখানে—আমার ভাব্‌লেই এমন রাগ ধরে যে কি বল্‌বো। আর যে তুমি আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দেবে, তা' আর হবে না। তোমাকে আর আমি ছেড়ে দেব না, কিছুতেই দেব না। কি বল, যাবে? ছেড়ে যাবে?"

দামোদর প্রথম প্রণয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উত্তর দিল, "না, রাণী, আর যাবো না।"

"ঠিক? আমার মাথা ছুঁয়ে বল।"

দামোদর মাথা ছুঁইয়া বলিল, সে আর রাধারাণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না।

রাধারাণী বিছানার উপর উঠিয়া শয়নের উদ্যোগ করিয়া বলিল, "বাঁচ্‌লুম। এতদিনে তুমি যে মুখ তুলে চাইলে তাইতে আমার মাথা থেকে বোঝা নেমে গেল। এখানে থাক্‌লে তোমার আরও অনেক সুবিধা হবে। বাবা বলেছে, যে আমার বিয়ের সময় তোমার বাবা নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর অর্দ্ধেক জমি আর বাড়ীর অর্দ্ধেক এক বৎসরের মধ্যেই তোমাকে লেখাপড়া করে দেবেন। তা' দেন নি। তোমাকে সহায় পেলে সেটার একটা কিনারা বাবা করে দেবেন বলেছেন। কেন তুমি বঞ্চিত হবে? তোমার হক্ যা' তা' ত' নেবে। কথা দিয়ে কথা রাখেন না এই বা কেমন? ওখানে থাক্‌লে তোমায় শেষে পথে দাঁড়াতে হবে। তুমি না হয় দাঁড়ালে, আমি তখন কোথায় যাবো? বল্‌তে পার?"

দামোদরের সে অবস্থায় অত বড় গূঢ় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। সে সেই প্রশ্নই দিয়া রাধারাণীর ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা দূর করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিষয় না বিষ?

দামোদর সোমবারে আসিয়া পালঘাটি হাইস্কুলে পৌঁছিতে পারিল না। অবশ্য ইহার ব্যবস্থা সে হেড্-মাষ্টারকে বলিয়া কহিয়া গিয়াছিল। মঙ্গলবার আসিয়া বাড়ীতে না গিয়া সে যথারীতি স্কুলের কাজ করিল; কিন্তু পড়ান তাহার হইল না—সে সমস্ত স্কুলের সময়টি ভাবিয়া কাটাইল, যে নূতন ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবে কি করিয়া। একবার ভাবিল যে, হেড্‌মাষ্টারকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলে ও একটা পরামর্শ করে। কিন্তু কে জানে যদি কার্য্যারম্ভের আগে মন্ত্রণাভেদ করিলে কার্য্য ব্যাহত হয়? সে নিজেই একটা পথ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিল।

স্কুলের ছুটির পর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সে বিস্মিত হইল। বাড়ীর হাওয়া যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে; যেন তাহার মন্ত্রণা ইতিমধ্যেই কে ভেদ করিয়াছে। সে গম্ভীর ভাবে নিজের ঘরে গিয়া জামা জুতা খুলিতেছে, এমন সময় তারাসুন্দরী আসিয়াই প্রশ্ন করিল, "কোথায় গিছ্‌লি? শ্বশুরবাড়ী?"

দামোদর এরূপ সোজা প্রশ্নের আশা করে নাই। সে উত্তর দিল না। জুতা জামা খুলিতেই ব্যস্ত রহিল।

তারাসুন্দরী কটু কণ্ঠে বলিলেন, "তা' স্পষ্ট বলে গেলেই ত' হো'ত। কল্‌কাতা যাচ্ছি বলে যাওয়া কেন? এ নিয়ে আমায় কেন কথা শুন্‌তে হয়? যা'র যা' খুসী বলে।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কে কি বলেছে?"

"কে কি বলে নি? আমি তো'কে পরামর্শ দিয়েছি; আমি তো'কে ভাঙিয়ে নিচ্ছি; সংসার ভাঙ্‌বার জোগাড় কোর্‌ছি; সকলে যা'তে উপোসী থেকে মরে তারই ব্যবস্থা কোর্‌ছি; এই সব কথা কেন শুন্‌তে হয় আমাকে? আমি তো'কে কি পরামর্শ দিয়েছি?"

দামোদর মনে মনে সকলের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু কোনও কথা বলিল না।

তারাসুন্দরীর নিজের অধিকারের কথা স্মরণ হওয়ায় কহিল, "তাই যদি দিয়েই থাকি, অন্যায়টা কি? আমার ছেলের ভালমন্দ আমি দেখ্‌বো না ত' কে দেখ্‌বে? আমার ছেলে আমায় দেখ্‌বে না ত কে দেখ্‌বে? বলুক্ ত' দেখি কি অন্যায় হয়েছে।"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল, "দাদা, বৌদি কি বল্লে?"

বলিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। তারা-সুন্দরী তাহাকে ধমক দিল, "তো'র এসব কথায় কি দরকার রে? ছোট আছিস্ ছোট থাক্—বড়দে'র কথায় দিনরাত থাকিস্ কেন? কি শিক্ষাই হ'চ্ছে?"

শ্যামা রাগিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "তা', বাবু, ঘুরিয়ে নাক দেখান কেন? হাস্‌বার কাজ কর্লেই লোকে হাসে। কে না হাস্‌বে? দেখ না কাল গাঁ শুদ্ধ লোক হাসে কি না।" বলিয়াই শ্যামা ক্রোধভরে প্রস্থান করিল।

দামোদর বিরক্তি ও রোষ দমন করিয়া ঘরের বাহিরে দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দুর্গারাণী তাহার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। সে দালান হইতে নামিয়া বাড়ীর সদর দরজায় পা' দিয়াছে, পিছন হইতে বাঞ্ছারাম ডাকিল, "দামোদর! ও দামোদর!"

দরজায় দাঁড়াইয়াই দামোদর উত্তর দিল, "কি ?"

"একবার এ দিকে এসো 'ত।"

দামোদর আস্তে আস্তে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইল। বাঞ্ছারাম তখন বসিয়াই ছিল। বসিয়াই তাহার সমস্ত দিন কাটিত। দামোদরকে বসিতে বলিল।

দামোদর বসিলে বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কল্‌কাতা গিছ্‌লে ?" দামোদর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তর করিল, "না। নিতাই ঘোষের বাড়ী গিছ্‌লুম।"

বাঞ্ছারাম উত্তপ্ত স্বরে বলিল, "কেন ? কি জন্যে সেখানে তুমি গিছলে শুনি ? তোমায় না পঞ্চাশ বার বারণ করে-ছিলুম যেতে। তবু কেন গিছ্‌লে ?"

দামোদর উত্তর না দেওয়ায় দুর্গারাণী তাহার হইয়া উত্তর দিলেন, "তা' যাবে না কেন ? তুমি বড়, না স্ত্রী বড় ?"

বাঞ্ছারাম কহিল, "আমার চেয়ে স্ত্রীই তোমার বড় হো'ল ? এতদিন মানুষ কর্‌লুম, চাক্‌রি করে দিলুম,—কি এই জন্যে ? স্ত্রী পেলে কোথা থেকে শুনি ? কে তোমার বিয়ে দিয়ে স্ত্রী এনে দিয়েছিল ? সে এই শর্ম্মা থাক্‌তে তবে না হয়েছিল ! আমি না দাঁড়ালে, নানা রকম ভাঁওতা না দিলে, নিতাই ঘোষ তোমায় মেয়ে দিত ? তোমার কি যোগ্যতা, বাবু ? এখন তোমার স্ত্রীই বড় হো'ল ? আমার মাথা হেঁট কর্ত্তে তাই গিয়েছিলে ?"

দামোদরের বিরক্তি শেষ সীমায় উপস্থিত হইল। সে বলিল, "মাথা হেঁট নিজের দোষেই হয়। কেউ তা'র জন্যে দায়ী নয়। আপনি কেন ভাঁওতা দিয়ে প্রতারণা করেছিলেন তা'দের ? কথা দিয়ে কথার খেলাফ কেন করেছেন ? তা'দের সঙ্গে কি সদ্‌ব্যবহার করেছেন ? কেবলই ত' নানা ছলে ফন্দিতে যা' পেয়েছেন আদায়ই ক'রে এসেছেন। তা'তে মাথা হেঁট হয় না ?"

দুর্গারাণী যেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাঞ্ছারাম তিরস্কারের ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। দামোদর সাধারণতঃ নিরীহ প্রকৃতির লোক ; কিন্তু রাগিলে তাহার রাগ অনেক দূর যাইত। তাই সে দুর্গারাণী, বাঞ্ছারাম সকলকেই অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "আমার অর্দ্ধেক জমি ও বাড়ীর অর্দ্ধেক দিন—যেমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচজনের সাম্‌নে—আমি আলাদা হয়ে থাক্‌বো। আমার কোন সংস্রবে আর দরকার নেই।"

দুর্গারাণী বাঞ্ছারামকে বলিলেন, "কেমন, যা' বলেছি তাই না ? ডুবে ডুবে অনেক দূর যায় বড়গিন্নী।"

বাঞ্ছারাম সায় দিয়া বলিল, "দেখছি তাই।" তার'পর দামোদরকে কহিল, "এক সিকি কড়ার বিষয়ও তোমায় দেব না। দূর করে দেব। দেখবো কে তোমায় খেতে দেয়, থাক্‌তে দেয়। বিষয়ের ভাগ চাও—আমি বেঁচে থাক্‌তেই, বটে ? এই পরামর্শ করে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয়েছিল ? একটা আদ্‌লাও দেব না। দেখি তুমিই বা কি কর আর তোমার নিতাই ঘোষই বা কি কর্ত্তে পারে।"

দামোদরের রাগ কতকটা পড়িয়া গিয়াছিল ; তবু সে বলিল, "বেশ দেখা যাবে।"

সেইদিনই আবার দামোদর রাগের মাথায় শ্বশুর-বাড়ী ফিরিল। সেখানে পৌঁছিতেই নিতাই ঘোষ বলিয়া উঠিল, "বেশ ; ঠিক্, আচ্ছা করেছ, বাবাজী ! এইবার নিজের ভাল দেখ। কেন থাক্‌বে সেখানে, কেন ? কেন শুনি। আমার মেয়েকে কি আমি জলে দিয়েছি ? তা'কে ত' তোমার হাতে দিয়েছি—তোমার হাতে, বুঝেছ ? তবে ? তুমি তাকে জলে ফেল্‌বে কেন ? কিসের জন্যে ? বুঝেছ ? জলে ফেল্‌তে পাবে না। এইখানে থাক—এই-খানে থাক। আমি তোমার সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। ঐ বাড়ীর অর্দ্ধেক আর জমির অর্দ্ধেক আদায় করে তবে কথা। তোমায় ঐ বিমাতার গ্রাস থেকে উদ্ধার করেছি দেখ না।" দামোদর তখন আর ইহা লইয়া আলোচনা করিল না। রাত্রে রাধারাণী তাহাকে খুব আদর, যত্ন করিল। দামোদর তাহার কথামত চলিতে পুনরায় প্রতিশ্রুত হইল।

রাধারাণী বলিল, "দেখ, যেই বল, স্ত্রীর চেয়ে ত' তোমার আপনার কেউ হ'তে পারে না !"

দামোদর তখন সে কথার অনুমোদন না করিয়া পারিল না। তাহার সমস্ত বিরক্তি ও দুঃখে এমন স্নেহ-প্রলেপ কেহ-ই আর দিতে পারে নাই। বিশ্ব-সংসারে রাধারাণীই কেবল তাহার আপনার।

পরদিন দামোদর স্কুলের কাজে যাইবে কি না যাইবে তাহা লইয়া নানা বিতর্ক আপনার সহিত করিয়া, শেষে নিতাই ঘোষের পরামর্শে গেল। কিন্তু ৪।৫ মাইল পথ হাঁটিয়া যাওয়া ক্লান্তিজনক। তার উপর স্কুলে পৌঁছিয়াই

সে শুনিতে পাইল যে, তাহার প্রসঙ্গটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। হেডমাষ্টার, সেকেণ্ড মাষ্টার আসিয়া কেহ তামাসা করিলেন, কেহ উৎসাহ দিয়া গেলেন। সমস্ত ছাত্রেরা দূর হইতে ইসারা ইঙ্গিতে তাহাকে লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। পড়ান কাজে তাহার মন আর বসিল না। সে ভাবিল যে কাজ ছাড়িয়া দিবে। নিতাই ঘোষের মত জমি লইয়া চাষবাস করিবে। সে যদি চাষবাস করে—কি রকমে করিবে, তাহার কিছু কল্পনা করিল। কিন্তু তাহার লেখাপড়ার কি হইবে ? এত যে শিক্ষা করিয়াছে, সাহিত্যে এত যে দখল জন্মিয়াছে তার—সাহিত্যকে এত ভালবাসে—সব বিসর্জ্জন দিবে ? না ; তা' হয় না। সে কি করিয়া নিরক্ষর চাষা হইবে ? ছুটির পর দামোদর আবার শ্বশুরালয়ে ফিরিতে উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় হেডমাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন, "দামোদরবাবু, চাটুয্যে মশায় ডেকে পাঠিয়েছেন। একবার হ'য়ে যাবেন।" দামোদরের মনটা আশঙ্কিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?" হেডমাষ্টার উত্তর দিলেন "ঠিক বল্‌তে পার্‌লুম না। তবে সম্ভব এই ব্যাপার নিয়েই কোনও একটা প্রাইভেট আলোচনা কর্ত্তে চান। আপনার বাবাকে আজ সকালে ওদিকে যেতে দেখেছিলুম।"

দামোদর আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই সে চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়ীতে দেখিল। চাটুয্যে মহাশয় সামাজিক সভায় বসিয়াছেন ; বাঞ্ছারামও উপস্থিত ছিল।

চাটুয্যে মহাশয় দামোদরকে বসিতে বলিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "দামোদর, তোমার নামে এসব কি শুন্‌ছি ? আমরা গ্রামের সমস্ত প্রবীণ লোক এখানে আছি। বাঞ্ছারাম যাই করুক্, বলুক, সে তোমার বাপ্। তা'কে এমন করে অবজ্ঞা করে, উপেক্ষা ক'রে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি। তুমি তার কাছে মাফ্ চাও—সকলের সামনে ; আর নিজের বাড়িতে গিয়ে থাক। শ্বশুরবাড়ি থাকা অত্যন্ত গর্হিত। পথে ভিক্ষা করা ভাল, তবু শ্বশুরের অন্নে থাকা উচিত নয়। আর তোমার স্ত্রীর আনা সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করে একটা ব্যবস্থা কোর্ব্ব।"

দামোদর একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল, "এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখে আপনাদের জানাবো।"

চাটুয্যেমশা'য় কহিলেন, "তোমার ভাব্‌না-চিন্তার দরকার নেই'ত বাবু। এতে তোমার বলাবলিরও কিছু নেই। যা' আমরা পাঁচজনে তোমার গুরুজনেরা মীমাংসা করেছি—তাই তোমাকে মান্‌তে হবে। না মান আমরা তা'র ব্যবস্থাও কর্ত্তে পারবো।"

দামোদরের মনে পড়িল যে রাধারাণীর নিকট সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে ; এখানে পালঘাটিতে থাকার অর্থ রাধারাণীকে ত্যাগ করা, একেবারে চির-বিচ্ছেদ। আর নিতাই ঘোষ চাটুয্যেমশা'য়ের স্কুলের মাষ্টার নহে যে ধ'মকে ভয় খাইবে। বিশেষতঃ এতগুলি প্রাচীন লোকের সমবেত বিরোধ তাহার পছন্দ হইল না, সে একে গোলযোগ ভালবাসে না।

দামোদর বলিল, "উনি যদি বাড়ির অর্দ্ধেক ও জমিজমার অর্দ্ধেক আমাকে লিখিয়া আলাদা করিয়া দেন, তবেই আমি আপনাদের কথামত কাজ কর্ত্তে পারি।"

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই একসঙ্গে একটা প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিলেন। চাটুয্যেমশা'য় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ! আঃ ! থাম না তোমরা। আমি সব বল্‌ছি যখন, তোমরা আবার 'হাঁ' 'হাঁ' কর কেন ?" তা'র পর দামোদরকে কহিলেন, "দামোদর, এ তোমার অতি অন্যায় কথা। তোমরা লেখাপড়া জানা ছোক্‌রা, তোমাদের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আক্কেল বিবেচনা ত থাকা চাই। তোমার পিতার অবস্থায় কি ক'রে তোমাকে আর্দ্ধেক জমিজমা ও আর্দ্ধেক বাড়ি সে তোমাকে দেবে শুনি। তোমাকে আলাদা করে দিয়ে ওরা কি বাকী সবাই শুকিয়ে মর্‌বে ? সেটা কি বিবেচনার কাজ ? তোমার মা, বাপ, ভাই, বোন সব না খেয়ে মর্‌বে—আর তুমি আলাদা হয়ে স্ত্রী নিয়ে সংসার কোরবে, এ কি আক্কেলের কথা ? ছিঃ ! ছিঃ ! একেবারে বয়ে গেছে ! স্ত্রীলোকের কথা অনর্থকর ; তাই শুনে তুমি হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব বিস্মরণ হ'তে বসেছ।"

চাটুয্যেমশা'য়ের কথায় উপস্থিত সকলে শির আন্দোলনে সায় দিলেন। মিত্তিরমশা'য়, মুখুয্যেমশা'য় ও রায়মশা'য় বলিয়া উঠিলেন "ঠিক ! ঠিক !" আর সকলে একসঙ্গে বিস্ময় বিরক্ত দৃষ্টিতে দামোদরের দিকে চাহিলেন, যেন

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে চান, "এইবার? একেবারে বয়ে গেছ? স্ত্রীলোকের কথায় মজেছ?"

সমবেত দৃষ্টিতে কুণ্ঠিত হইয়া দামোদর বলিল, "তা না হ'লে, শ্বশুরমহাশয় যে পাঠাবে না। সুতরাং সেটা দরকার। আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি।"

বাঞ্ছারাম মন্তব্য করিল, "শুন্‌লেন ত' চাটুয্যে মশা'য়, শুনুন।"

মিত্রমশা'য় প্রশ্ন করিলেন, "কলিকাল আর কিসে? পাঁজির কথা মিথ্যে হয়?"

চাটুয্যে মশা'য় বলিয়া উঠিলেন, "ঐ তোমরা আবার গোল কর্ত্তে সুরু কর্লে? বলি, আমায় যখন কথা কইতে তোমরা বলেছ, তখন আমি কি কথা কইতে জানি না যে তোমরা মাঝখানে পড়ে হট্টগোল করছো?" তার পর দামোদরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা কি তোমার স্থির, পাক্কা কথা? সেইটাই আমাদের জানিয়ে দাও। তুমি ত' উৎসন্ন গেছই; তবু পরিষ্কার করে সব বলে দাও। আমাদের ত' সেইরকম ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। যখন বাঞ্ছারাম আমাদের কাছে মীমাংসার জন্যে এসেছে, তখন মীমাংসা কর্ত্তে হবেই ত।"

দামোদর চুপ করিয়া রহিল। মিত্র মশা'য়, মুখুয্যে মশা'য়, প্রভৃতি সকলে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল। সে ঘামিয়া উঠিল। দরজার দিকে তাকাইয়া দেখিল, পলায়নের পথ আছে কি না। দেখিল তাহারও উপায় নাই। ও-পাড়ার শ্যাম কর আর মন্মথ সরকার দু'জনে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। দামোদর হতাশ হইল।

চাটুয্যে মশা'য় বলিলেন, "উত্তর দাও না হে, দামোদর!"

বাঞ্ছারাম আপনাকে সংযত করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, "ওর গোষ্টীর মাথা উত্তর দেবে! ও কি আর মানুষ আছে? ভেড়া, ভেড়া হয়েছে। এর বিহিত একটা কর্ত্তেই হবে, চাটুয্যে মশা'য়। নিতাই ঘোষকে একবার দেখে নিতে হবে! এটা আপনাদের গাঁয়েরই অপমান!"

চাটুয্যে মশা'য় এবার রাগিলেন; বলিলেন, "বাঞ্ছারাম, তোমাদের ঐ বড় দোষ! মাঝে পড়ে কথা বলা তোমাদের স্বভাব! কি কর্ত্তে হবে না হবে আমি কি জানি না? আমি কি খোকা?" তা'র পর শ্যাম কর ও মন্মথ সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা ওখানে কি কর্‌ছো? এখানে এসে বস্‌তে পার না? এত বড় একটা ব্যাপারের মীমাংসা হচ্ছে, তোমরা বাইরে কি কোচ্ছ, শ্যাম?"

চাটুয্যে মশা'য়ের প্রশ্ন শুনিয়া শ্যাম কর ও মন্মথ সরকার বৈঠকখানার ভিতরে আসিয়া বসিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, চাটুয্যে মশা'য়, এই 'ত আমরা আছিই। আপনি যখন মীমাংসার ভার নিয়েছেন, তখন আমাদের জন্যে কি আট্‌কায়?"

চাটুয্যে ম'শায় উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দামোদর এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে দরজা ফাঁকা দেখিয়া, উঠিয়া এক লম্ফে বাহিরে পড়িল, তা'রপর জুতা হাতে করিয়া ছুটিল। চাটুয্যে মশা'য় কথা আরম্ভ করিতেই পারিলেন না। বাঞ্ছারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওকে ধর না কেউ!"

দামোদর একেবারে একছুটে প্রায় এক মাইল পথ উত্তীর্ণ হইল। তা'রপর দাঁড়াইয়া, একটু জিরাইয়া লইল। ধীরে ধীরে জুতা পরিয়া, কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছিয়া, সে শ্বশুর বাড়ির অভিমুখে চলিল। তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "বিষয় না বিষ! এর জন্যে এত কাণ্ড!" সে গ্রামের সমস্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের উপর রাগিয়া উঠিল। তাহাদের কি? তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, তবু এখনও পরের কথা লইয়াই সব ব্যস্ত! তাহারা কি কেহই স্ত্রী লইয়া সংসার করে না? একটার জায়গায় কাহার কাহারও ত দুই জন স্ত্রী। আর তাহার বেলাতেই যত দোষ! কেন? তাহার স্ত্রী কি স্ত্রী নহে? রাধারাণীর মত স্ত্রী কাহার আছে? সে মনে মনে গ্রামের সমস্ত পরিচিত রমণীর আলোচনা করিয়া বলিল, "না! রাধারাণীর মত আর দ্বিতীয় কেহ নাই।"

(ক্রমশঃ)

卐

জৈন সাধক চিদানন্দ

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহু সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া লোকশিক্ষায় নিরত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম লোকসমাজে প্রচলিত আছে; কিন্তু যাঁহারা একান্তে নিজ সাধনায় মশ্‌গুল থাকিয়া লোকলোচনের বাহিরে অবস্থান করেন, তাঁহাদের পরিচয় জনসাধারণে বড় পায় না।

জৈনসমাজেও এরূপ সাধকের অভাব হয় নাই। গত ১৩৩৮ কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় জৈন-সাধক 'আনন্দঘনের' পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আর একজন জৈন-সাধক 'চিদানন্দের' পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

'চিদানন্দ' কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ও কবে কোথায় দীক্ষাগ্রহণ করেন জানা যায় না। মাত্র এইমাত্র জানা যায় যে, ইনি একজন জৈন সাধু ছিলেন ও ইঁহার আসল নাম 'কর্পূরচন্দ্র' ছিল—'চিদানন্দ' উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ কথাই অজানা থাকিয়া গিয়াছে। ইঁহার পদগুলির মধ্যে একটীতে উল্লিখিত আছে যে "যুগ-পূরণ-নিধান-শশী সংবত, ভাবনগর ভেটে গুণধামী" অর্থাৎ ১৯০৪ সংবতে ভাবনগরে পার্শ্বনাথের প্রতিমার দর্শন করেন। সেই সময় যে ভজন রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সংবত দেওয়া আছে। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইঁহার আবির্ভাব হয়। কথিত আছে যে ভাবনগর হইতে একজন জৈন গৃহস্থের সহিত তীর্থপর্য্যটনে ইনি গিরণার পাহাড়ে গিয়াছিলেন ও সেইখান হইতে হঠাৎ এক-দিন কোথায় চলিয়া যান। এই ঘটনার পর চিদানন্দ প্রায়ই লোকালয়ে আসিতেন না; যদি হঠাৎ কোন স্থানে উপস্থিত হইতেন, আবার সেইরূপ হঠাৎই অন্তর্হিত হইতেন। পার্শ্বনাথ পাহাড়ে ইঁহার দেহান্ত হয়, এরূপ প্রবাদ আছে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এরূপ লোক ছিলেন যাঁহারা চিদানন্দকে দেখিয়াছেন, কিন্তু ইঁহার জীবন সম্বন্ধে কোন সংবাদ কেহ দিতে পারেন নাই। এরূপ কথিত হয় যে, ইঁহার বহু অলৌকিক শক্তি ছিল ও ইনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ ইঁহার রচিত পদগুলির মধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। জৈনদর্শনে গভীর জ্ঞানের পরিচয় ইঁহার বহুপদে পাওয়া যায় ও অন্যান্য দর্শনও ইঁহার অধিগত ছিল, তাহাও কোন কোন পদে জানা যায়। ইঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে "পুদ্গল গীতা," "প্রশ্নোত্তর-মালা," "স্বরোদয় জ্ঞান", "বহোত্তরী" প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, জৈনধর্ম্মে কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা মুক্তি পাইবার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া হয় নাই। জ্ঞান, ভক্তি ও চারিত্রের সমন্বয়ে মোক্ষ পাওয়া যায়, কথিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের জৈন সাধকগণের রচনায় যে ভক্তিভাব ও প্রেমের উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহা সেই যুগের বিশেষত্বের ছাপ মাত্র। বৈষ্ণব ও সহজিয়া ভাবের প্রবল প্লাবনের ছাপ জৈনদের মধ্যেও পড়িয়াছিল ও জৈন সাধকগণ উপাস্যদেবকে ভক্তি ও প্রেম দ্বারা সাধনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু জৈনসম্প্রদায়ের সংস্কারগত বিশেষত্ব-জ্ঞানের প্রভাব সাধকগণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাতেও জ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এই যুগে রচিত জৈন স্তব ও ভজনগুলির অনেকটীতে ভক্তিভাবের উক্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

এই যুগের জৈনসাধকগণের রচনায় আত্মাকে 'প্রিয়', 'প্রাণনাথ', 'বল্লভ' প্রভৃতি শব্দদ্বারা যেরূপ সম্বোধন করা হইয়াছে, 'শ্যামসুন্দর', 'বংশীধারী', প্রভৃতি শব্দদ্বারাও সেইরূপ সম্বোধন করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে 'শ্যামসুন্দর',

'বংশীধারী' প্রভৃতি শব্দ প্রেম-প্রকাশক সম্বোধন রূপে মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সময় এই সমস্ত শব্দ এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল যে, তাহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে কোনও দেব বা ব্যক্তির প্রতি প্রেমপ্রকাশ করিতে হইলে এই শব্দগুলি সম্বোধন রূপে ব্যবহৃত হইত। জৈন ভক্তগণের রচনাতেও এই শব্দগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনেক জৈন-স্তবনে তাঁহারা নিজেদের উপাস্যদেবকে 'শ্যাম', 'শ্যামসুন্দর', 'কনহিয়া' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। আত্মাকে সম্বোধন করিয়াও এইরূপ শব্দের বহুপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 'আনন্দঘন' ও 'চিদানন্দ'ও এরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। চিদানন্দের এরূপ ধরণের উক্তি বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া এস্থলে এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হইল।

চিদানন্দ যোগাভ্যাসী ছিলেন। কোন কোন পদে ইঁহার যোগাভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

"সোহং সোহং সোহং সোহং,
সোহং সোহং রটনা লগিরী।
ইঙ্গলা, পিঙ্গলা, সুখমনা সাধকে,
অরুণ প্রতিথী প্রেম পগীরী ;
বঙ্কনাল, ষট্‌চক্র ভেদকে,
দশমদ্বার শুভ জ্যোতি জগিরী।" ইত্যাদি।
২৩ (বহোত্তরী)

"সোহং সোহং এর রটনা লাগিয়াছে। ইঙ্গলা, পিঙ্গলা, সুষুম্না সাধন করিয়া অরুণের ন্যায় জ্যোতিঃ সম্পন্ন আত্মার সহিত প্রেম দৃঢ় করে! বঙ্কনাল ও ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া দশমদ্বারে শুভজ্যোতি জাগ্রত হয়।" ইত্যাদি। ৫০ সংখ্যক পদেও পিণ্ডস্থাদিক ধ্যান, রেচক, পূরক, কুম্ভক, শান্তিকের কথা এবং প্রাণ, সমান, উদান, ব্যানকে অধীন করিয়া অনাহত নাদ-শ্রবণ করার কথা আছে। অন্যান্য সাধকের ন্যায় ইঁহার রচনাতেও প্রেমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ অনেক পদ দৃষ্ট হয়। যথা :—

অবলাগী, অবলাগী, অবলাগী, অবলাগী,
অবলাগী, অবলাগী, অব প্রীত সহিরী।
অন্তর্গতকী বাত অলী শুন,
মুখথী মোপে ন জাত কহিরী ;
চন্দ্র চকোরকী উপমা ইন সমে,
সাঁচ কহুঁ তোঁহে জাত বহিরী।
জলধর বুন্দ সমুদ্র সমানী,
ভিন্ন করত কোউ তাস মহিরী ;
দ্বৈত ভাবকী টেব অনাদি,
ছিনমে তাকুঁ আজ দহিরী।
বিরহ ব্যথা ব্যাপত নহি আলী,
প্রেমধরী পিয়ু অঙ্ক গহিরী ;
চিদানন্দ চুকে কেম চাতুর
ঐসো অবসর সার লহিরী।" ২৪

"এইবার আমার প্রীতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে। হে সখি, আমার অন্তরের কথা শুন—মুখে ইহা আমি বলিতে অপারগ। আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি যে চন্দ্র চকোরের যে প্রীতি তাহা আমার প্রীতির সহিত কোনরূপে উপমিত হইতে পারে না—অর্থাৎ তাহা আমার প্রীতির সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। জলধরের জলবিন্দু সমুদ্রে মিশিয়া গেলে তাহাকে কি কেহ পৃথক করিতে পারে? আজ আমি অনাদিকালের দ্বৈতভাবকে ক্ষণমাত্রে ধ্বংস করিয়াছি। হে সখি, আমি প্রেমপূর্ব্বক প্রিয়তমের ক্রোড় গ্রহণ করিয়াছি, আর আমার বিরহ ব্যথা নাই। চিদানন্দ কহিতেছেন হে চতুর, তুমি এরূপ প্রশস্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া তাহা কেন বৃথা নষ্ট করিবে।"

আবার ৪৬ পদে বলিতেছেন :—

"অনুভব মিত্ত মিলায় দে মোকুঁ,
শ্যামসুন্দর বর মেরা রে।
শিয়ল ফাগ পিয়া সঙ্গ রমুঁগীঁ,
গুণ মানুগীঁ মেঁ তেরা রে॥" ইত্যাদি

"হে অনুভব মিত্র, আমার স্বামী শ্যামসুন্দরকে (আত্মা) মিলাইয়া দাও। আমার প্রিয়তমের সঙ্গে শীলরূপ (সচ্চারিত্র রূপ) হোলী খেলিব ও তোমার গুণ স্মরণ করিব।" ইত্যাদি। এস্থলে 'শ্যামসুন্দর'এর অর্থ 'প্রিয়তম' —ইহা কোন দেব বা ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। আনন্দ-ঘনের পদেও 'শ্যামসুন্দর' 'ব্রজনাথ' প্রভৃতি শব্দ ঠিক এই ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

আত্মার প্রতি অগাধ প্রেম ইঁহার পদে পরিলক্ষিত হয়। ৩২ সংখ্যক পদে তিনি বলিতেছেন :—

"অবধু পিয়ো অনুভব রস প্যালা,
কহত প্রেম মতবালা ;
অন্তর সপ্তধাত রসভেদী পরম প্রেম উপজাবে,
পূরব ভাব অবস্থা পালটী, অজবরূপ
দরসাবে।" ইত্যাদি।

"হে অবধু, অনুভবরসের পেয়ালা পান কর এরূপ প্রেমমত্ত বলিতেছে। অন্তরের সপ্তধাতুর রসভেদ করিয়া পরমপ্রেম উৎপন্ন হইবে ও পূর্ব্বের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া অপূর্ব্বরূপ দর্শন করাইবে।" ইত্যাদি।

এইরূপ প্রেমে মতওয়ারা হইয়া তিনি অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিবার জন্য গাহিয়াছেন :—

"অলখ লখ্যা কিম জাবে হো, অয়সী কোউ জুগতি বতাবে,
অলখ লখ্যা কিম জাবে।
তনমন বচনাতীত ধ্যানধর, অজপা জাপ জপাবে ;
হোয় অডোল লোলতা ত্যাগী,
জ্ঞান সরোবরে হ্যাবে হো!
শুদ্ধ স্বরূপমে শক্তি সম্ভারত,
মমতা দূর বহাবে ;
কনক উপল-মল ভিন্নতা কাজে,
যোগানল সলগাবে হো।
এক সময় সমশ্রেণী রোপী,
চিদানন্দ ইম গাবে ;
অলখরূপ হোই অলখ সমাবে
অলখ ভেদ ইম পাবে হো॥" ৪৫

অলক্ষ্যকে কি করিয়া লক্ষ্য করা যায়—এরূপ কোন উপায় কেহ বলিয়া দিবে কি? তনু, মন, বচন—এই তিন যোগের অতীত হইয়া যে যোগাতীত ধ্যান ধারণ করিয়া অজপা জপ জপে এবং আসক্তি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্থির হইয়া জ্ঞানসরোবরে স্নান করে। শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজ শক্তির সন্ধান লয় ও মমতাকে দূরে ত্যাগ করে এবং আত্মারূপ স্বর্ণ হইতে প্রস্তরমল পৃথক করিবার জন্য যোগানল জ্বালাইয়া দেয়। চিদানন্দ এরূপ গাহিতেছেন যে একসময়ে সমশ্রেণী করিয়া স্বয়ং অলক্ষ্য হইয়া অলক্ষ্যে প্রবেশ করে এবং এইরূপে অলক্ষ্যের সন্ধান পায়।" ('এক সময়ে সমশ্রেণী' করা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সিদ্ধ-শিলায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বাবস্থা—ইহা জৈন শাস্ত্রের একটী বিশেষ কথা, বাহুল্যভয়ে বিস্তারিত অর্থ করা হইল না।)

চিদানন্দের সংসারের প্রতি বিরক্তিও তীব্র ছিল। ৭১ পদে তিনি গাহিয়াছেন :—

"ক্যা তেরা ক্যা মেরা,
প্যারে সহু পড়াই রহেগা।
পংছি আপ ফিরত চহুঁ দিশথী, তরুবর রৈন বসেরা,
সহু অপনে অপনে মারগতে,
হোত ভোরকী বেরা।
ইন্দ্রজাল গন্ধর্ব্বনগর সম, ডেঢ়দিনকা ঘেরা ;
স্বপন পদারথ নয়ন খুল্যা জিম,
জড়ত ন বহুবিধ হের‍্যা।
রবিসুত করত শীশপর তেরে, নিশদিন ছানা ফেরা ;
চেত শকে তো চেত চিদানন্দ,
সমঝ শব্দ এ মেরা।" ৭১

"হে প্রিয়, তোমার ও আমার সমস্ত এখানে পড়িয়া থাকিবে। পক্ষীসকল চারিদিক হইতে আসিয়া বৃক্ষতে রাত্রিবাস করে ও সকাল হইলে সকলে আপন আপন মার্গে চলিয়া যায়। ইন্দ্রজাল ও গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় এ সমস্ত দেড় দিনের জন্য থাকে, স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ চক্ষু খুলিবার পর অনুসন্ধান করিয়াও আর পাওয়া যায় না। তোমাদের মস্তকের উপর রবিসুত যম দিবারাত্রি লুকাইয়া ভ্রমণ করে। হে চিদানন্দ, আমার এই কথা বুঝ ও সাবধান হও।"

গূঢ়ার্থক সমস্যাপূর্ণ পদও ইঁহার আছে :—

"সন্তো অচিরজা রূপ তমাসা,
কিড়ীকে পগ কুঞ্জর বাঁধ্যো
জলমে মকর পিয়াসা।
করত হলাহল পান রুচিধর,
তজ অমৃতরস খাসা,
চিন্তামণি তজ ধরত চিত্তমে,
কাচ শকল কী আশা।
বিন বাদর বরসা অতি বরষত,
বিনদিগ বহত বতাসা ;

বজ্রগলত হম দেখ্যো জলমে,
কোরা রহত পতাসা।
বৈর অনাদি পন উপরথী,
দেখত লগত বগাসা ;
চিদানন্দ সোহী জন উত্তম
কাপত যাকা পাসা॥" ২০।

"হে সাধো, আশ্চর্য্য তামাসা। পিপীলিকার পায়ে হস্তীকে বাঁধা হইয়াছে, জলে থাকিয়াও মকর পিপাসিত। উত্তম অমৃতরস ত্যাগ করিয়া রুচি পূর্ব্বক হলাহল পান করিতেছে। চিন্তামণি রত্ন ত্যাগ করিয়া কাচের টুকরার আশা রাখে। বাদল নাই অথচ অত্যন্ত বর্ষা হইতেছে, দিক্ নাই অথচ বাতাস প্রবাহিত হইতেছে, আমি বজ্রকে জলে গলিয়া যাইতে দেখিলাম, অথচ বাতাস যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। অনাদিকালের বৈরভাব আছে, অথচ বাহির হইতে দেখিতে বকের ন্যায় স্নেহময় দেখায়। চিদানন্দ কহিতেছেন সেই জনই উত্তম যাহার পাশ-বন্ধন—কর্ত্তিত হইয়াছে।" আবার ঃ—

"অয়সা জ্ঞান বিচারো প্রীতম
গুরুগম শৈলী ধারো রে।
স্বামী কি শোভা করে সারী
তে তো বালকুমারী রে ;
যে স্বামী তে তাত তেহনো
কহ্যো জগত হিতকারী রে।
অষ্টদিকরী জায়ী বালা
ব্রহ্মচারিণী ভোবে রে,
পরনারী পূরণ চন্দা থী,
এক সেজ নহি শোবে রে।"
ইত্যাদি ৪০।

"হে প্রিয়, গুরুর নিকট শিক্ষা লইয়া জ্ঞানের বিচার কর। স্বামীর শোভা বর্দ্ধন করে এরূপ স্ত্রী অথচ সে বালকুমারী, আর তাহার যে স্বামী সেই তাহার পিতা এবং সে জগতের হিতকারী। বালা আটটী কন্যার জন্ম দিয়াছে অথচ তাহাকে ব্রহ্মচারিণী বলা হয়, পূর্ণচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাদ হইয়াছে—অথচ স্বামীর সহিত এক শয্যায় সে শয়ন করে না" ইত্যাদি। এই পদটী আনন্দঘনের ৯৯ সংখ্যক পদের সহিত তুলনীয়। আনন্দঘন বলিয়াছেন—

* * * *

"নহি হুঁ পরণী নহি হুঁ কুঁবারী,
পুত্র জনাবন হারী।
কালি দাঢ়িকো মেঁ কোঁই নহি ছোড়্যা,
তো হজুয়ে হুঁ বালকুমারী।" ইত্যাদি

"আমি বিবাহিতা নহি, আমি কুমারী নহি, অথচ পুত্রের জননী। কালো দাড়ি বিশিষ্ট কোন লোককে আমি ছাড়ি নাই অথচ এ পর্য্যন্ত আমি বালকুমারী।"

নানক ও দাদুপন্থী সাধকগণের গুঢ়ার্থক সমস্যাপূর্ণ রচনা ভারতে অনেক প্রচার লাভ করিয়াছিল। জৈন সাধকগণও তাহার অনুকরণ করিয়া এইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন। আমি বাল্যকালে "ভরথরী" ও "সুথরা" গানে এইরূপ সমস্যাপূর্ণ অনেক গান শুনিয়াছি।

আনন্দঘনের অন্যান্য পদের সহিতও চিদানন্দের পদের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

চিদানন্দের রচনায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা উপরে যে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার এই সকল শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হইতেছে, তবুও আরও ২।১টী পদ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"জাগ অবলোক নিজ শুদ্ধতা স্বরূপকী।
জামেঁ রূপরেখ নাহিঁ, রঞ্চ পরপঞ্চ নাহি,
ধারে নহিঁ মমতা—সুগুণ ভবকূপকী।
জাকে হৈ অনন্ত জ্যোত, কবহু ন মন্দ হোত,
চার জ্ঞান তাকে সোত, উপমা অনুপকী।
উলট পুলট ধুব জান, সত্তামে বিরাজমান,
শোভা নাহি কহি জাত, চিদানন্দ ভূপকী॥" ৩৯।

"হে আত্মা, জাগো, নিজ স্বরূপের শুদ্ধতা অবলোকন কর। যাহাতে রূপের রেখামাত্র নাই, সামান্যও প্রপঞ্চ নাই, সেই সুগুণ, ভবকূপের প্রতি মমতা রাখে না। যাহার অনন্তজ্যোতিঃ আছে যাহা কখন ও ম্লান হয় না, প্রথম চারি জ্ঞান (মতি, শ্রুতি, অবধি, মন ও পর্য্যায়) সুপ্ত অবস্থায় থাকে (পঞ্চম জ্ঞান—কেবল জ্ঞান—প্রকাশ পাইলে অন্যান্য জ্ঞানের পৃথক সত্তা থাকে না) এবং এই জ্ঞানের কোন উপমা নাই, তাই ইহাকে অনুপম কহে। যাহার পর্য্যায়ের

পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও সভায় যাহা ধ্রুব থাকে এরূপ চিদানন্দ ভূপের শোভা বর্ণনা করা যায় না।"

৩৫ পদে ঃ—

* * * *

"নলিনী ভ্রমর মর্কটমুঠি জিম,
ভ্রমবশ অতি দুখ পাবে রে,
চিদানন্দ চেতন গুরুগম বিন,
মৃগতৃষ্ণা ধরি ধ্যাবে রে।"

"নলিনীর মধ্যে বদ্ধ ভ্রমর ও কলসের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্ত-মর্কট ভ্রমবশে যেরূপ কষ্ট পায় সেইরূপ হে চিদানন্দ, লোকে গুরুর নিকট শিক্ষা না পাইয়া মৃগতৃষ্ণা ধরিয়া দৌড়িয়া বেড়ায়।"

৫৮ পদে ঃ—

"জাগরে বটাউ, অব ভয়া ভোর বেরা,
ভয়া রবিকা প্রকাশ, কুমুদহু খয়ে বিকাশ,
গয়া নাশ প্যারে, মিথ্যা রৈন কা অঁধেরা।" ইত্যাদি

"হে পথিক, জাগো, সকাল হইয়াছে। রবির প্রকাশ হইয়াছে, কুমুদ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, মিথ্যা জ্ঞানরূপ রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়াছে।"

৫৯ পদে ঃ—

"ধ্যানঘটা ঘনছায়ে,
সুদেখো মাঈ, ধ্যানঘটা ঘনছায়ে,
দম দামিনী দমকতি দহুঁদিশ অতি,
অনহদ গরজ সুনায়ে।
মোটী মোটী কুন্দ গিরত বসুধা সুচি,
প্রেম পরম জড় লায়ে।
চিদানন্দ চাতক অতি তল্লত,
শুদ্ধ সুধা জল পায়ে।"

"হে মাতঃ, দেখ ধ্যানরূপ ঘনঘটা চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয় দমনরূপ দামিনী দশদিকে চম্‌কাইতেছে ও অনাহত নাদের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। মোটা মোটা পবিত্র জলবিন্দু পৃথিবীতে পড়িতেছে ও পরমপ্রেমরূপ বৃক্ষের শিকড় গজাইতেছে। অত্যন্ত তৃষাতুর চিদানদচাতক শুদ্ধ সুধাজল পান করিল।"

এইরূপ বহুসংখ্যক পদে ইঁহার সুললিত বর্ণনাশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইঁহার রচিত ৫২টী দোঁহা বা সবৈয়াও পাওয়া যায়। এগুলিও পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে পদগুলির অনুরূপ। আমরা এস্থলে মাত্র একটী উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ওঁকার অগম অপার প্রবচন সার,
মহাবীজ পঞ্চপদ গর্ভিত জানিয়ে ;
জ্ঞান ধ্যান পরম নিধান সুখ খান রূপ,
সিদ্ধি বুদ্ধি দায়ক অনুপ এ বখানীয়ে।
গুণ দরিয়াব ভব জলনিধি মাহে নাঁব,
তত্ত্বকে লিখাব হিয়ে জ্যোতিরূপ ঠানিয়ে ;
কীনো হৈ উচ্চার আদ আদিনাথ তাতে থাকো,
চিদানন্দ প্যারে চিত্ত অনুভব আনিয়ে। ১।

সায়াহ্নের অভিসার

শ্রীরাধারাণী দেবী

সায়াহ্নের অভিসারে এনু তব দ্বারে
অঞ্চল আড়ালে ধরি সন্ধ্যাদীপ খানি!
জীবনের মহোৎসবে ডেকেছিলে যারে,
অসময়ে এসেছে সে, পরাজয় মানি।
গিয়াছে প্রভাত, গেছে দীপ্ত-দ্বিপ্রহর,—
তখন আসিনি আমি তোমার মন্দিরে!
সহসা গোধূলি-লগ্নে হে চিরসুন্দর!
উত্তরিল তরী মোর তব নদী-তীরে।
সারানিশি এখনো তো রহিয়াছে বাকী,—
মধ্যাহ্ন গিয়াছে তাহে কিবা ক্ষতি প্রিয়!
পুষ্পগন্ধী শুক্লারাতে চন্দ্রালোক ছাঁকি'
সর্ব্বাঙ্গে জড়াবো তব নব-উত্তরীয়।
নিশা-শেষে হ'ব দোঁহে সর্ব্ব বাধাহীন,
অনন্ত ঘুমের ঘোরে র'ব স্বপ্নলীন।

ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"বগল্লুপ"।

এই প্যাঁচটী অনেক অবস্থা হইতেই করিতে পারা যায়। কখনও একটী হাত লেঙ্গটে ও অপর হাতটী ঘাড়ে রাখিয়া, কখনও দুইটী হাতই লেঙ্গটে রাখিয়া বা কখনও হাতে হাত দিয়া, যে কোন অবস্থাতেই নিজের শরীরটী অপরের বগলের মধ্য দিয়া গলাইয়া লইয়া গিয়া পিছনে যাওয়াকেই "বগল্লুপ" বলে। তাহার যে পা পিছনে থাকিবে সেই-দিকেই প্যাঁচটী করিতে হইবে। যদি তাহার ডান পা পিছনে থাকে তবে নিজের বাঁ পা-টী তাহার ডান দিকে আগাইয়া দিয়া উপরিউক্ত ভাবে শরীরটী একটু নীচু করিয়া তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া গলাইয়া লইয়া পিছনে যাইতে হয়। পিছনে যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান পা টী পিছাইয়া লইতে হইবে।



বগল্লুপ
১ম

"বগল্লুপ নিকাল"।

ঠিক "বগল্লুপ" প্যাঁচের ন্যায়, অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া, যদি তাহার বাঁ পাঁয়তারা থাকে, নিজের বাঁ পা টী তাহার ডান দিকে আগাইয়া দিয়া, শরীরটী একটু নীচু করিয়া তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া পিছনে যাইবার পূর্ব্বেই যদি বাম পায় তবে বাঁ হাতটী তাহার পিছন দিক দিয়া পা ছা র মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া ঐখানেই আ ট কা ই য়া রাখিয়া হাতের জোরে তাহার

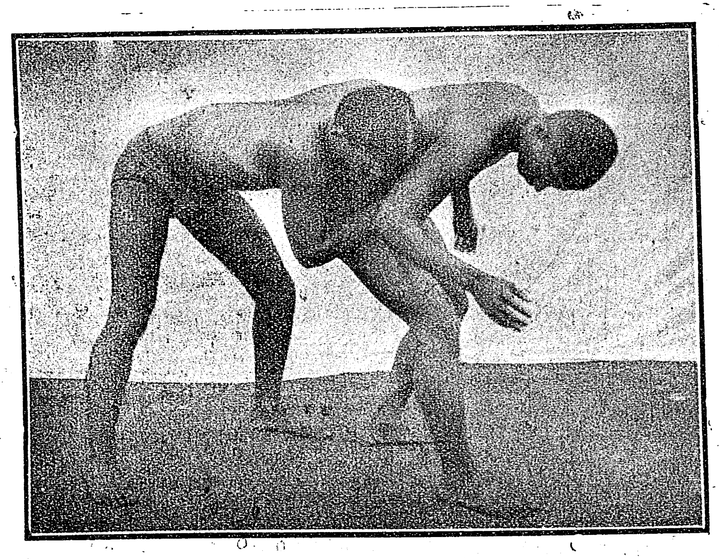

বগল্লুপ
২য়

শরীরটী ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলাকে "বগল্লুপ নিকাল" বলে।

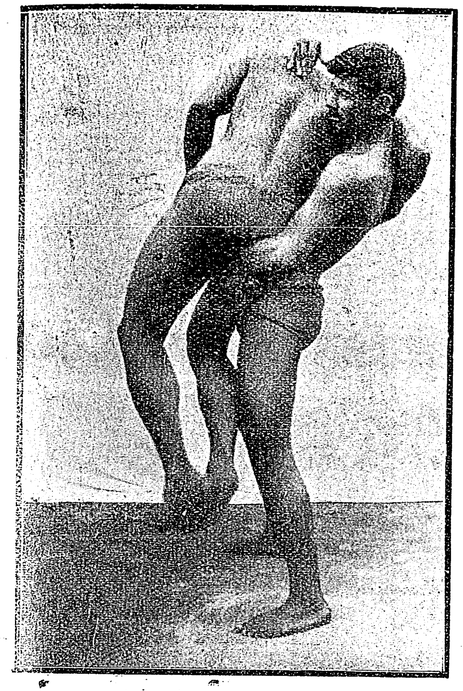

বগল্লুপ
নিকাল

"কালা জাং"।

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে বাঁ হাতটী তাহার ডান গুলির উপর দিয়া লইয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু নীচু হইয়া নিজের বাঁ দিকে ঘুরিয়া ডান হাতটী তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান পা-টী জড়াইয়া ধরিয়া, মাথাটী তাহার বগলের নীচে রাখিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সাম্‌নে ঝোঁক্ দিয়া চিৎ করাকে "কালা জাং" বলে।

"মুচ্ছীফোটা"

অপরের পিছনে যাইয়া বাঁ হাত

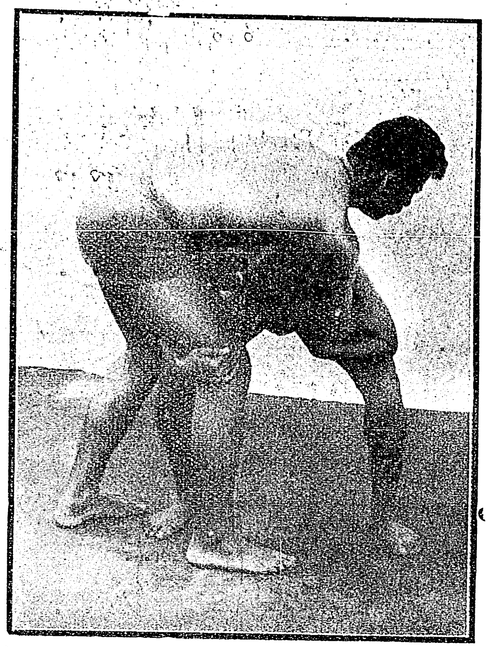

কালা জাং—১ম

তুলিয়া পাঁয়তারা করিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথাটী তাহার পাছায় লাগাইয়া ডান হাতটী দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া দিয়া তাহার বাঁ পায়ের মোজাটী ধরিয়া টানিবার

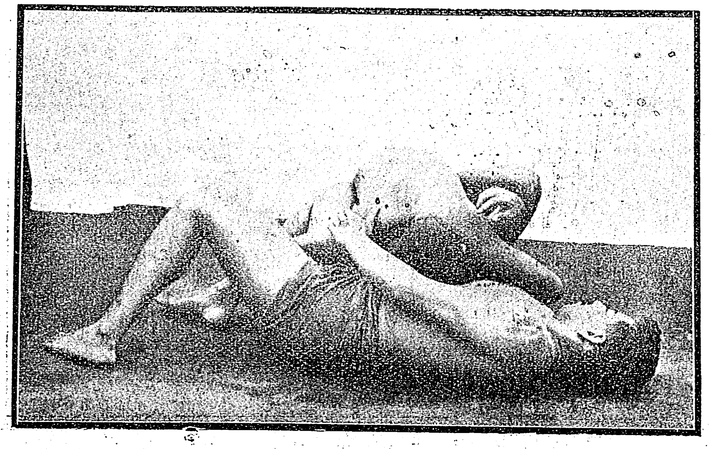

কালা জাং—২য়

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া কোমরটী পিছন দিকে টানিয়া চিৎ করাকে "মুচ্ছীফোটা" বলে।

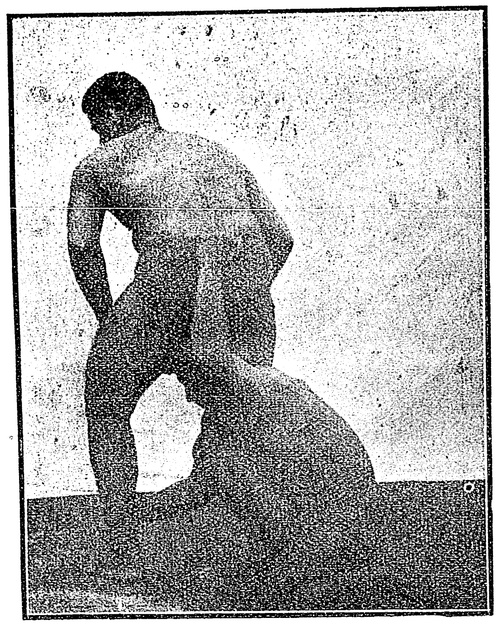

"মুচ্ছীফোটা—১ম"

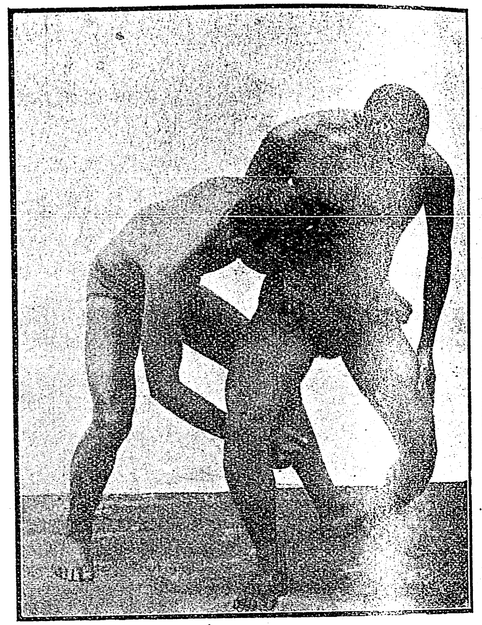

"গিরা—১ম"

"গিরা"।

অপরের পিছনে যাইয়া, যদি তাহার ডান পাঁয়তারা থাকে, বাঁ হাত দিয়া তাহার কোমরটী জড়াইয়া ধরিয়া কিম্বা লেঙ্গট্টী ধরিয়া তাহার ডান ধারে ঘুরিয়া আসিয়া ডান হাত দিয়া তাহার ডান হাঁটুর পিছনে ও সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা দিয়া তাহার বাঁ গোড়ালীর কাছে মারিবার সময় বসিয়া তাহার শরীরটী পিছনে উল্টাইয়া দিয়া চিৎ করাকে "গিরা" বলে।

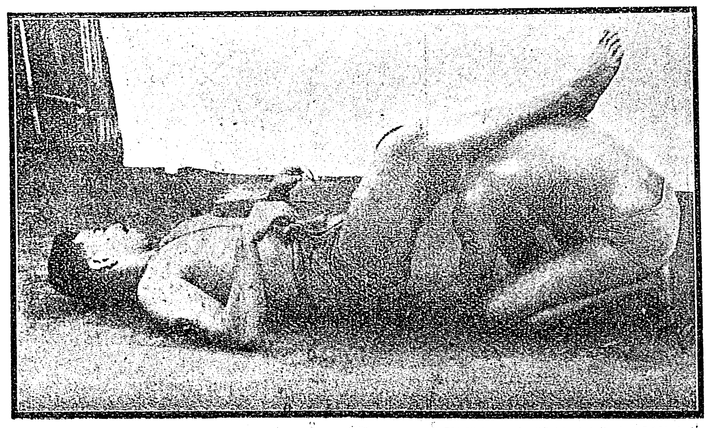

মুচ্ছীফোটা—২য়"

"খাপা"।

যে কোন অবস্থা হইতেই অপরের মাথাটী নিজের বগলের নীচে পাইলে বাহু দ্বারা তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া চাড় দেওয়াকে "খাপা" বলে।

"ছিপ্পি"।

অপরে যদি পিছনে যাইয়া কোমরটী জড়াইয়া ধরে তখন তাহার পাঁয়তারা দেখিয়া তাহার যে পা আগে আছে নিজের সেই পা-টী বাহির দিয়া লইয়া গিয়া তাহার বাহিরের গাঁটের কাছে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ধারের হাতটী দুই হাত দিয়া ধরিয়া বিপরীত ধারে জোরে ঘুরিয়া চিৎ করাকে "ছিপ্পি" বলে।

"ঘিম্বা"

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে রসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে, তবে ডান হাঁটুটী তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার উরতে রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া, বাঁ হাতটী তাহার বাঁ দিক দিয়া লইয়া গিয়া পেটের কাছে লেঙ্গট্টী চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাত দিয়া কিম্বা ডান পায়ের

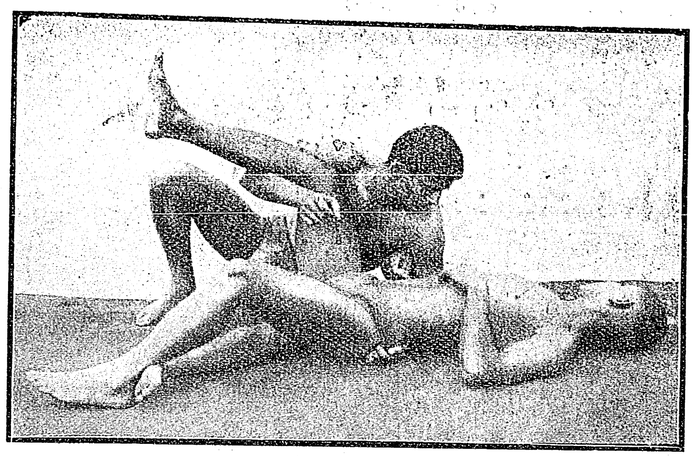

"গিরা—২য়"

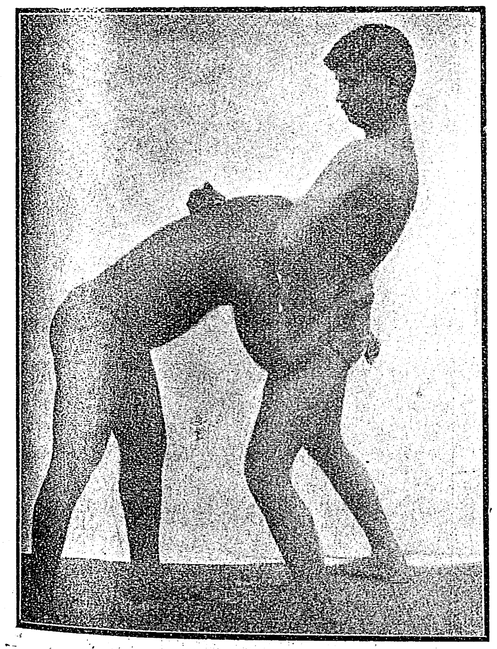

"খাপা"

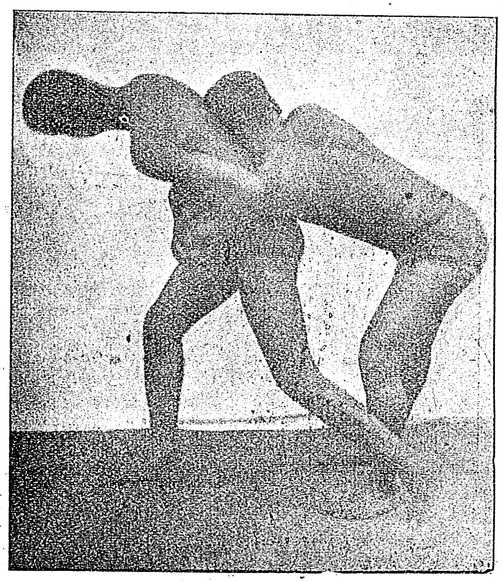

"ছিপ্পি—১ম"

চেটো দিয়া তাহার ডান কনুইয়ে জোরে ধাক্কা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া তাহার শরীরটী উল্‌টাইয়া দিয়া চিৎ করাকে "ঘিম্বা" বলে। অপরের শরীরটী উল্‌টাইয়া দিয়া নিজের বাঁ পা-টী ঘুরাইয়া তাহার পেটের উপর চাপাইয়া রাখিতে হয়।

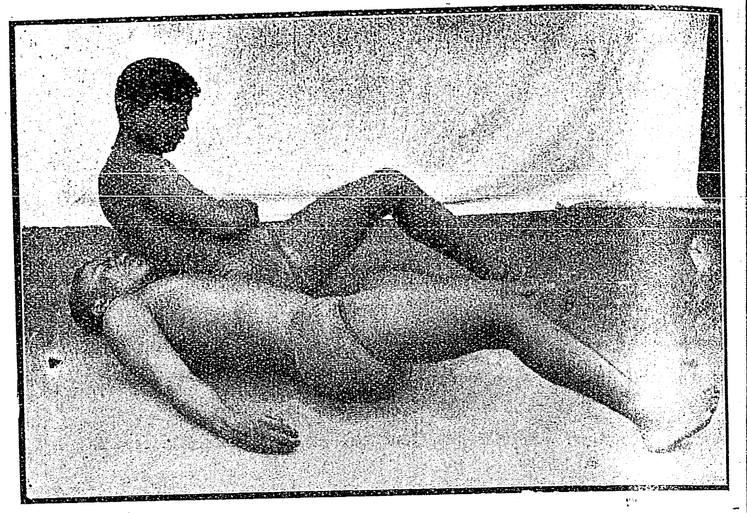

"ছিপ্পি—২য়"

"গাঁড়সা" বা "গাঁড় হাতী"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে, তবে ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান মুটো বা কব্জীটী ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটী তাহার পাছার মধ্য দিয়া ভিতরে চালাইয়া

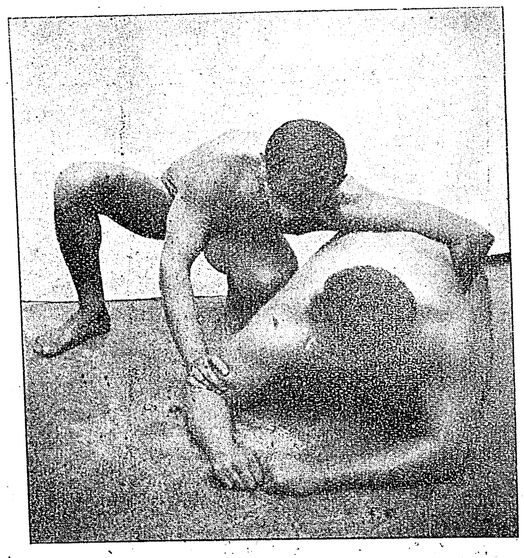

"ঘিম্বা—১ম"



"ঘিম্বা—২য়"

তাহার উরতে রাখিয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গট্‌টী চাপিয়া ধরিয়া, জোরের সহিত বসিয়া, ডান হাতটী

দিয়া পেটের কাছে লেঙ্গট্‌টী চাপিয়া ধরিয়া, সেই হাতে তাহার শরীরটী উল্‌টাইয়া দিয়া চিৎ করাকে "গাঁড়সা বা "গাঁড় হাতী" বলে। উল্‌টাইয়া দিবার সময়, নিজের গায়তারা ঠিক রাখিবার জন্য ডান পাটী উঠাইয়া রাখিতে হইবে। শরীরটী উল্‌টাইয়া দিয়া নিজের বাঁ পা-টী ঘুরাইয়া তাহার পেটের উপর চাপাইয়া রাখিতে হয়।



"গাঁড়সা" বা "গাঁড়হাতী"—১ম,

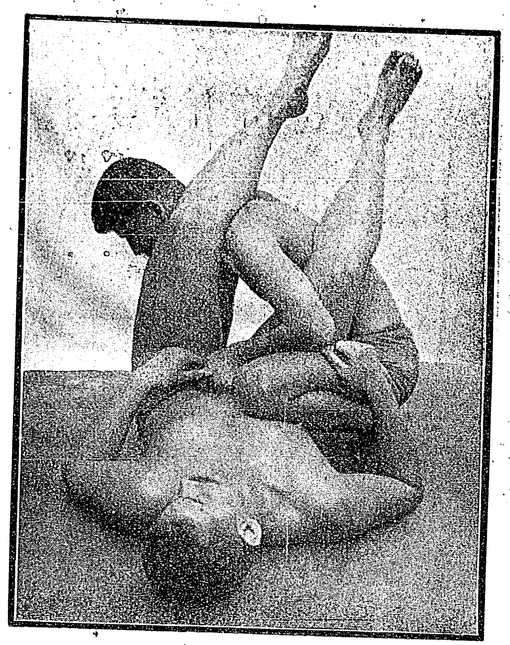

"গাঁড়সা" বা "গাঁড়হাতী—২য়

"দচ্চা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডানদিকে থাকে তবে ডান বাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান হাঁটুর সাম্‌নে মাটীতে রাখিয়া, জোরের সহিত

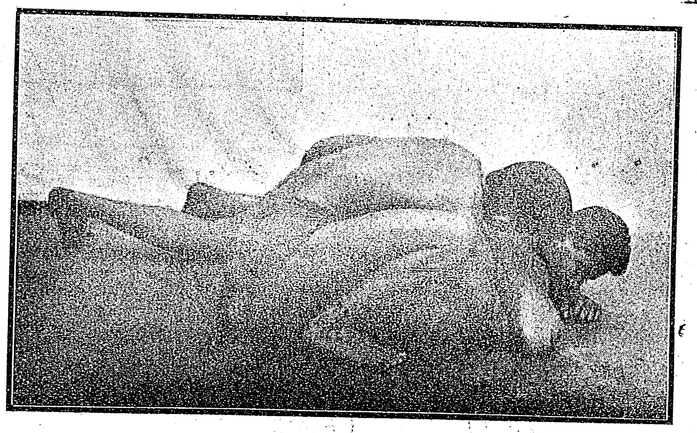

"দচ্চা"

উপুড় হইয়া, ডান কনুই দিয়া তাহার ডান কনুইয়ের কাছে জোরে ধাক্কা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাঁটু দিয়া তাহার ডান

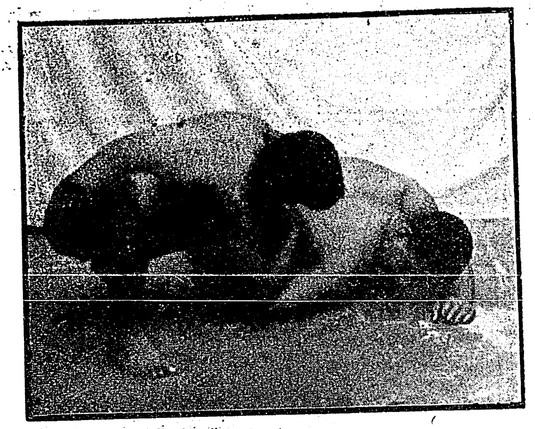

"ইন্দিরা"

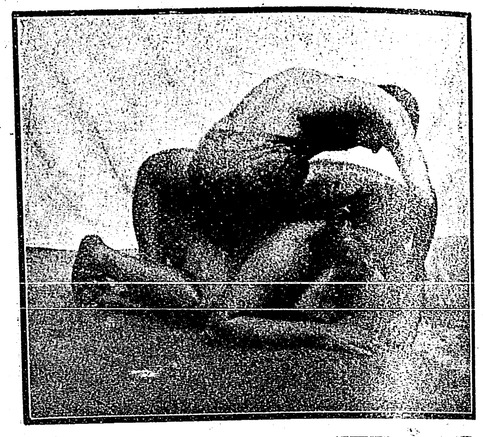

"চরকা—১ম,"

প--টী ও বাঁ হাত দিয়া বাঁ পা-টী লম্বা করিয়া, তাহার শরীরটিকে লম্বা করাকে "দচ্চা" বলে।

"ইন্দিরা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি ডানদিকে থাকে তবে ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার উরতে রাখিয়া, জোরের সহিত বসিয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গট্‌টী চাপিয়া ধরিয়া, পরে ডান হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ডান মুঠো বা কব্জীটী ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া ঘুরাইয়া তাহার পিঠে তোলা বা আট্‌কাইয়া রাখাকে "ইন্দিরা" বলে।



"চরকা—২য়"

"চরকা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডানদিকে



"শোয়া
১ম

থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গট্‌টী চাপিয়া ধরিয়া, পরে নিজের বাঁ পা দিয়া বাহির কিম্বা

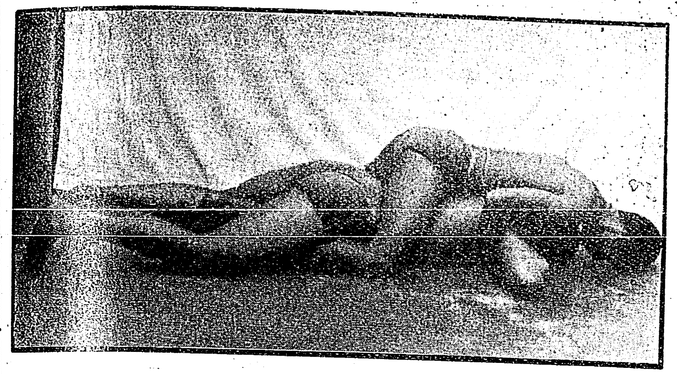

"শোয়ারী—২য়"

ভিতর দিক হইতে তাহার ডান পা টী জড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা দিয়া তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া, নিজে সামনে ঝোঁক দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া চিৎ করাকে "চরকা" বলে।

"শোয়ারী"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটিতে বসে, তখন তাহার শরীরের উপর চাপিয়া বসিয়া, ভিতর দিক হইতে তাহার দুই পায়ের মধ্যে নিজের দুইপা চালাইয়া দিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে দুইহাত তাহার দুই বগলের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া, মুঠো কিম্বা কব্জী দুইটী চাপিয়া ধরিয়া ভিতর দিকে টানিতে টানিতে, পায়ের জোরে তাহার শরীরটী লম্বা করিয়া আট্‌কাইয়া রাখাকে "শোয়ারী" বলে!

"পেটী"

অপরকে নিচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে তখন তাহার শরীরের উপর চাপিয়া বসিয়া, "শোয়ারী" প্যাচের ন্যায় হাতের ও পায়ের কাজ করিয়া তাহাকে লম্বা করিয়া পরে একটী পা তাহার পেটের নিচু দিয়া চালাইয়া দিয়া

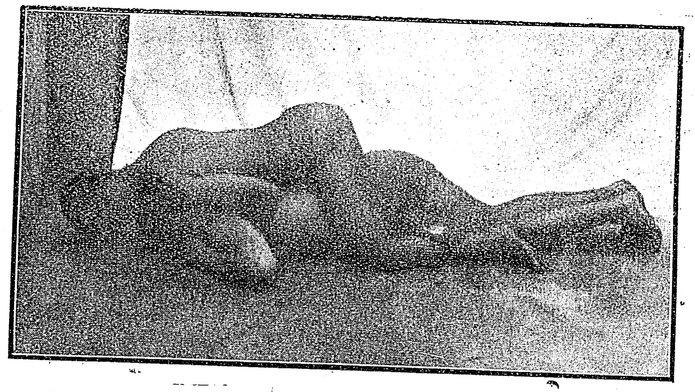

"পেটী"

অপর পায়ের সহিত আট্‌কাইয়া রাখিয়া তাহার পেটে চাপ দেওয়াকে "পেটী" বলে।

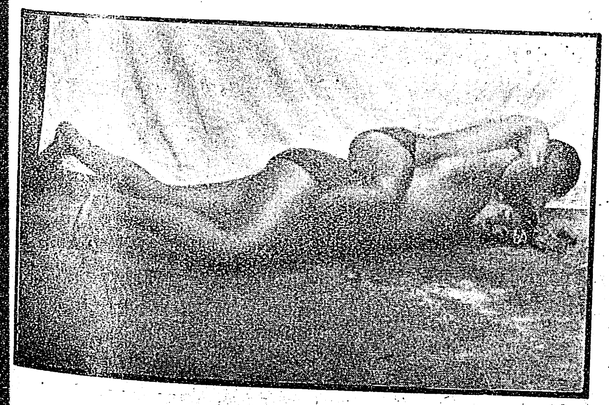

"হপ্তা"

"হপ্তা"

অপরকে নিচে লইয়া আসিয়া "শোয়ারী" দিয়া নিচে আট্‌কাইয়া রাখিয়া পরে তাহার ডান বগলের মধ্যে দিয়া বাঁ হাত চালাইয়া দিয়া হাতটী তাহার ঘাড়ের উপর আট্‌কাইয়া রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মোড়াটী মোচড় দিয়া তুলিয়া লইয়া চিৎ করিতে পারা যায়। এইরূপে হাতটী তুলিয়া লওয়াকে "হপ্তা" বলে।

যে জীবন দীন

শ্রীআশীষ গুপ্ত

লিমিটেড কোম্পানী,—অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিষের,—ঘুঁটের। চার জন অংশীদার,—মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসী। বড় স্কেলে ব্যবসা,—ঘুঁটে বিক্রি করে, বর্ষাকালের জন্য ষ্টক করে;—বৃষ্টি যখন নামে, তখন অংশীদারেরা গম্ভীরমুখ করিয়া বলে, "এত বিষ্টি,—ঘুঁটে শুকোই কোতা, মা'ঠান্—?" একখানা ঘুঁটে চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া বলে, "এতবড় ঘুঁটে এ তল্লাটে নেই,—এই ভরা বাদল, কিন্তু শুকিয়ে খট্‌খট করছে যেন ঝুনো নারকোল,—পয়সায় আটখানা,—এ তুমি বলেই দিচ্ছি, মা'ঠান্, লোক্‌সান করে'—"

গোয়ালাবাড়ীতে গোবর বন্দোবস্ত,—মাসে দেড়টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিতে হইত,—পরিবর্ত্তে গোবর পাইত প্রতিজনে রোজ দুই ঝুড়ি। লোকের বাড়ীর দেয়াল বন্দোবস্ত,—মাসে চার আনা করিয়া ভাড়া,—চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া জায়গা।—মানদা বলিত, "সরযূ, তোর হাত দু'খানা ঢ্যাঙ্গা আছে, তুই-ই মাপ্ না হয় ছ্যাল্‌টা,—আমার হাতে বড্ড কম হয়—"

দেয়াল মাপিতে মাপিতে, সরযূ মুখ টিপিয়া হাসিত, বলিত, "তোর ত হাত নয়, যেন দাঁতন-কাঠি—"

মানদা বলিত, "বেশ লো বেশ, তোর হাত যেন আঁক্‌ষী—"

জংলীর মাসী বলিত, "মা'ঠান্, লাভ হ'ত যদি না ছ্যালের ভাড়া দিতে হ'ত,—মাঠে শুকোতে দিতে পারি,—পয়সাও দিতে হয় না,—কিন্তু ছোঁড়ারা সব বল খেলে, লাপালাপি করে,—দেয় সব ঘুঁটে ভেঙ্গে; তাই—"

পয়সা ভাগ-বাটোয়ারা হইত মাসকাবারে,—সমস্ত মাসটা ঝগড়া বিবাদের মধ্যে দিয়াও একপ্রকার নির্ব্ঝাটে কাটিত,—কিন্তু পয়সা ভাগ করিবার সময়েই মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইত। সরযূ কহিত, এ মাসে বেশী পয়সা না আনিলে, স্বামী তাহাকে অতিরিক্ত প্রহার দিবে বলিয়াছে। মানদা বলিত, তাহার অভাব, তাহাকে কিছু বেশী না দিলে চলিবে না। হাব্‌লার মা বলিত, কম কম বিড়ী খাইয়া হাব্‌লার পেট ফুলিয়াছে, এ মাসে স্বচ্ছন্দ পরিমাণে বিড়ী না খাইতে পাইলে হাব্‌লা আর বাঁচিবে না। জংলীর মাসী কহিত, জংলী একদিন ফিলিম না কি দেখিতে যাইতে চায়,—ছবিতে নাকি হাঁটে, ছবিতে নাকি কথা কয়,—জংলীর মাসীও জংলীর সহিত যাইবে; বুড়া বলিয়া কি তাহার প্রাণে সখ নাই?

সরযূ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "আবার সখ? এ মাসের পয়সা ত সব তোর কাছেই ছিল, তুই তার থেকে কত চুরি করেছিস, আগে তার হিসেব দে, তারপরে ফিল্ম দেখ্‌তে যাস্—" বলিয়া সরযূ জংলীর মাসীর নাকের কাছে হাত দুইটা আনিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে নাড়িয়া দিল।

জংলীর মাসী কোমর হইতে পয়সার থলিটা খুলিয়া লইয়া সরযূর দিকে ছুড়িয়া দিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মানি বলে ঠিক, হাত নয়, আঁক্‌ষী,—নে না তোর হিসেব,—খ্যাংরা মারি অমন হিসেবের মুখে—"

মানদা আন্নার "বকুলফুল"। ও-পাড়ায় কোথায় একখানা নূতন বাড়ী তৈরী হইবে,—তাহারই ভিত খোঁড়া হইতেছিল। ভালো মাটি দেখিয়া, নিজের দাওয়া সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে মানদা সেখান হইতে ঝুড়ি মাথায় করিয়া মাটি লইয়া আসিতেছিল! পথে আন্নার সহিত দেখা।

আন্না কহিল, "কি ভাই বকুলফুল, মাটি নিয়ে যাচ্ছিস্?"

প্রশ্নটা অনাবশ্যক,—কিন্তু ওটা আলাপ জমাইবার পূর্ব্বাভাস, এবং বৃহত্তর পরিচয়ের পক্ষে অপরিহার্য্য।

মানদা কহিল, "হ্যাঁ, তুই কোথায় যাচ্ছিস্, আন্না?"

আন্না বলিল, "বেশ মাটি ত, বকুলফুল,—খোলামকুচি টুচি নেই,—দে না আদ্দেকটা, উনুন গড়্‌ব—"

মানদা কহিল, "না বাপু, তা পার্‌ব না,—আমি কত কষ্ট করে' আন্‌ছি বলে'—"

আন্না আসিয়া হাত বাড়াইয়া মানদার মাথার উপরকার ঝুড়িটা ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল, "নামা না ভাই বকুলফুল, ঝুড়িটা একবার, একটুখানি মাটি নিই,—এট্টু—"

এক ঝট্‌কা টানে আন্নার হাত হইতে ঝুড়িটা ছাড়াইয়া লইয়া, মানদা কহিল, "বারণ কর্‌লেও শুনিস্ না ক্যান্ লা? —এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছিস্ নাকি?"

অভিমানে কাঁদ-কাঁদ মুখ করিয়া আন্না বলিল, "একটুখানি মাটি চাইলে তেড়ে আসিস্, তুই এম্‌নিতর বকুলফুল?"

অভ্রান্ত বিষয়ী লোকের মত মানদা বলিল, "মাটি দিয়ে আমি 'বকুলফুল' পাতাতে পার্‌ব না, এ আমি তোমাকে সিধেসিধি বলে' দিচ্ছি,—"বকুলফুল' থাক্, আর যাক্, মাটি আমি দিতে পার্‌ব না।—আর আজ তুই মাটি চাইতে এসেছিস্, কাল যখন একটু নাউশাক চাইতে গেসনু তোর কাছে, তুই দিয়েছিলি?—নিজের বেলা আঁটিসুঁটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি—?"

আন্না কহিল, 'সে হ'ল নাউশাক, আর এ মাটি—"

মানদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "তোর নাউশাকের বেলা 'বকুলফুল' নয়, আর মাটি চাইবার সময় 'বকুলফুল',—বাঃ রে আব্‌দার!—"

আন্না কহিল, "আচ্ছা যাস্ আজ্‌কে, লাউশাক দেব'খন,—এখন মাটি দে—"

অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে মানদা বলিল, "ঠিক দিবি? ভাঁড়াচ্ছিস্ না ত?"

"ঠিক না ত কি মিথ্যে?—আচ্ছা যাস্ তুই চাইতে, যদি না দিই তখন বলিস্—"

অত্যন্ত উদারভাবে মানদা কহিল, "তবে না হয় খানিকটা মাটি নে—"

মাটি ভরিবার মত একটা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া, পথের ধারের আঁস্তাকুড়ের নিকট হইতে একটা ভাঙ্গা কড়া টানিয়া লইয়া, মানদার ঝুড়ি হইতে আন্না মাটি তুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

মানদা কহিল, "কিন্তু খবরদার আন্না, লাউশাক যদি না দিস্—তাবলে' অতটা নিস্‌নে যেন,—তাহ'লে তেরাত্তিরের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মর্‌বি, সে কথা বলে' দিচ্ছি—"

কড়াটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে আন্না কহিল, "শাপমন্যি কর্‌ছিস্ ক্যান্ লা মানি?"—কিছুদূরে যাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "যেয়ো'খন নাউশাক আন্‌তে, দেব'খন ভালো করে', নাউশাক দেবে, না কচুপোড়া দেবে—?"

আন্নার রকম-সকম দেখিয়া মানদা স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল।—

* * *

মানদাকে সবাই ঠকায়;—সে যদি কোন কিছু বিক্রি করিতে যায়, তাহা হইলে সে লোককে দশ আনার জিনিষ দিতে গিয়া, বারো আনার দিয়া, আট আনা পয়সা লইয়া আসিবে, ইহা একরকম জানা কথা; এবং এ কথা মানদার অংশীদার তিনজনের অপেক্ষা ভালো করিয়া কেহই জানিত না। তাহারা বহুবার ঠকিয়া এবং ঠেকিয়া শিখিয়াছিল যে, মানদাকে অর্থ-সংক্রান্ত কাজের ভার দিলে, তাহাদের লিমিটেড কোম্পানীর লোকসান অনিবার্য্য।

—সেদিনকার ব্যাপার;—বড়বাবুদের বাড়ী ঘুঁটে বিক্রী করিয়া মানদার তিন টাকা পাঁচ আনা আনিবার কথা। সে ফিরিয়া আসিয়া সরযূর কাছে বসিয়া হিসাব করিতে লাগিল; কহিল, "পয়সায় চার গণ্ডা করে' হ'লে, তোমার এক আনায় হ'ল গে,—হ্যাঁ লা সরি, কত হয় লা?"

সরযূ কহিল, "গিন্নীমা তোকে যা পয়সা দিয়েছে, তুই আগে বার কর্, তার পর দেখ্ আমি হিসেব করে' দিচ্ছি—"

মানদা সন্তর্পণে কাপড়ের আঁচলের গিরা খুলিল; মস্তবড় গ্রন্থি, অনেকবার করিয়া কাপড়টা জড়াইয়া বড় করিয়া বাঁধা হইয়াছে! অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেটা খুলিয়া সে দেখিল, আঁচলের মধ্যে কিছুই নাই! সরযূ কহিল, "টাকা কি হ'ল লা, মানি—"

স্তম্ভিত মানদা বলিল, "ভেল্কী লাগিয়ে দিলে বাছা—পয়সা নিয়ে এনু আঁচলে বেঁধে; গেরো ঠিক রয়েছে, পয়সা নেই!"

অসংখ্য রকমে মানদার মুণ্ডপাত করিবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে সরযূ ছুটিল। বড়বাবুদের বাড়ী গিয়া দেখে, মানদা যেখানে বসিয়া ঘুঁটে গণিয়াছিল, তাহারই পাশে তিন টাকা পাঁচ আনা পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে! —মানদা শূন্য আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়া বাড়ী গিয়া হিসাব করিতেছিল, এক পয়সায় চার গণ্ডা ঘুঁটে হইলে, চার পয়সায় কত হয়!

আর একবারের ঘটনা,—গোয়ালা-বাড়ীতে গোয়ালার সহিত মানদার একদিন বচসা হইল'—মানদা এক জায়গা হইতে গোয়ালাকে কয়েক আঁটি খড় কিনিয়া আনিয়া দিয়াছিল, গোয়ালা বলিল, তাহার হিসাব-মত তিন আঁটি খড় কম হইতেছে।

মানদা কহিল, তাহার অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু চুরি-বিদ্যা তাহার আছে এ কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলে নাই।—কথাটা সত্য; সেই জন্যই গোয়ালা আর কিছু বলিল না।

—ইহার কিছুদিন পরে, মাস-প্রথমে গোয়ালা বলিল, "মাসকাবার ত হ'ল মানদা, তোমার টাকা দেড়টা কবে দিচ্ছ?"

মানদা একেবারে ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল,—গোয়ালা যেদিন তাহাকে আকার-ইঙ্গিতে চোর বলিয়াছিল, সেদিনও সে এতটা রাগ করে নাই! সে কহিল, "আমায় চোর বলে' আবার দেড়টা টাকা চাইতে এসেছ? হারামজাদা বিট্‌লে কোথাকার—! এবার তিন্‌টে টাকা দেব,—দেখি তুই আর কেমন আমায় চোর বলিস্—দেড় টাকা চেয়ে আমায় অগেরাহি করা!"

গোয়ালা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিল না,—কিন্তু টাকা দিবার সময়ে, মানদা তিন টাকাই দিল,—দিয়া এতটা অহঙ্কারের সহিত একটি কথাও না কহিয়া চলিয়া গেল যে, গোয়ালা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল, এবং ততোধিক বিস্মিত হইল মানদার অংশীদারেরা তিনজন। নিজের সততা প্রমাণ করার এই অদ্ভুত প্রণালী দেখিয়া সরযূ কহিল, "তোর বুদ্ধিসুদ্ধি নেই মানি,—ওকে তিন টাকা দিলি কি বলে?"

মানদা কহিল, "আমায় বলে চোর, হারামজাদার সাহসটা একবার দেখ, সরযূ,—ঘুঁটে বিক্রি করে' খাই,—কিন্তু তাই বলে' কেউ যে আমায় শুধু-মুধু চোর বলে' যাবে, আর আমি মুখ বুজে সহি কর্‌ব, তেমন মেয়ে আমি নই!—ওর নাকের ওপর দিনু ছুড়ে টাকা,—কি রকম চিট্ হ'য়ে গেল, দেখ্‌লি সরি?—আর কথাটি কইতে পার্‌লে না—"

* * * *

জংলীর মাসীর প্রাণে সখ খুব,—যাত্রা দেখিতে চায়, ফিলুম দেখিতে চায়, থেটার দেখিতে চায়! পূজাবাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে, জংলীর মাসী যেন সেই। ভাগ্যবানদের জুতার ঠোক্কর, লাঠির তাড়া, সশব্দ হুঙ্কার এ সকল অগ্রাহ্য করিয়া যে কুকুরটা নিমন্ত্রণ-গৃহের আশপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কলাপাতার লোভে, জংলীর মাসী যেন তাই!—থেটার, ফিলুম, যাত্রা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বড় বেশী;—জংলী ছিল উৎসাহিত করিবার জন্য। সরযূ হাসিত, মানদা মুখ বিকৃত করিত, হাব্‌লার মা নিন্দা করিত; কিন্তু জংলীর মাসীর সখ মিটিত না।

সরযূর স্বামী ছিল,—স্বামী ত নয়, ইষ্টদেব,—কাজের মধ্যে ছিল দুটি, খাওয়া আর ঘুমান। ঘুম থেকে উঠিয়া খাইত, খাইয়া আবার ঘুমাইত, জাগিয়া উঠিয়া আবার খাইত, ভোজনশেষে পুনরায় নিদ্রা যাইত।

সরযূ বলিত, "থাক্ যত খুসী, কিছু বল্‌ছি না,—ঘুমোক্ যত ইচ্ছে, মানা কর্‌ছি না,—কিন্তু গালমন্দ করে কেন?—বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি, আবার চোখ রাঙ্গানি,—সরি কারও কথার ধার ধারে না—"

কিন্তু নিদ্রাতে বোধ হয় পরিপাক ভালো হয়,—সরযূর স্বামী সাধন খাইতে পারিত হাতীর মতন;—হাতী যে কতটা খায়, তাহা সরযূ জানিত না,—কিন্তু সাধনের আহার দেখিলে হাতীর কথা ছাড়া সরযূর অন্য কিছু মনে হইত না।

শুধু ঘুঁটের রোজগারে সাধনের খোরাক সংগ্রহ করা অসম্ভব। সরযূ বড়-বাড়ীর বাসন মাজার কাজে নিযুক্ত হইল; কহিল, তাহার নিজের ভাত সে বাড়ীতে লইয়া গিয়া আহার করিবে।—কিন্তু সেদিন যখন প্রায় পৌনে দু'সের চালের ভাত একটা কাঁসিতে স্তূপাকারে সাজাইয়া, সরযূ দুপুরবেলা বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন সিঁড়ির মাথায় বড় গিন্নীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল অকৃত্রিম

বিস্ময়ের সহিত বড় গিন্নী কহিলেন, "এই এতগুলো চালের ভাত তুমি একা খাবে নাকি সরযূ?".

অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে সরযূ কহিল, "আমি একটু বেশী খাই, মা'ঠান্,—খাটুনীর শরীল, ভাত একটু বেশী না খেলে—"

বড়গিন্নী অতিশয় বুদ্ধিমতী,—তিনি কহিলেন, "কাল তোমাকে নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়াব সরযূ,—তুমি কি খেতে ভালবাস, বল,—ঠাকুরকে বলে' দেব'খন। আহা গরীব মানুষ,—তোমাদের পেট ভরিয়ে খাওয়াতে পার্‌লে বড় তৃপ্তি পাই—"

সরযূ বুঝিল, তাহাকে খাওয়ার পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর, পরশু হইতে তাহার ভাতের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে। বাড়ী ফিরিয়া সরযূ নির্জ্জলা উপবাস করিল;—কাল বেশী করিয়া না খাইতে পারিলে, অধিক পরিমাণে ভাত পাওয়া যাইবে না,—সাধনের আহারের জোগাড় করা শক্ত হইবে। কিন্তু উপবাস করিয়াও সে একা যে অতগুলা ভাতের সিকি অংশও আহার করিতে পারিবে না, সেটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি সরযূর ছিল।—কিন্তু তবুও যতটা পারা যায়! পরদিন বড়গিন্নী সরযূর কাছে বসিয়া, তাহার খাওয়া দেখিতে লাগিলেন।—সে যেন জীবন-মরণ পণ করিয়া ভাত গিলিতে আরম্ভ করিল। বড়গিন্নী তাহার আহারের পরিমাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন;—কিন্তু এত করিয়াও কূলে আসিয়া তরী ভিড়িল না। ভোজনের ব্যাপারে শ্রীমান সাধন একেবারে যাহাকে বলে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাই। সরযূ যখন খাওয়া শেষ করিল, তখন আর তাহার নড়িয়া বসিবার মত সামর্থ্যটুকুনও অবশিষ্ট নাই; কিন্তু সাধনের প্রয়োজনের তুলনায় তাহার নিজের খাদ্যের পরিমাণ যে কত অল্প, কত তুচ্ছ হইয়াছে, সে ব্যাপারটা অত্যন্ত ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে অস্পষ্ট স্বরে সরযূ বলিল, "আজকে আমার শরীরটা ভালো নেই, মা'ঠান্, নইলে আমি আরও বেশী খেতে পারি,—ঢের বেশী এর চাইতে, মা'ঠান্,—অনেক বেশী—"

দেখিয়া বড়গিন্নীর দয়া হইল;—তিনি কহিলেন, "এখানেই এখন থাক্, সরযূ, রোদ পড়্‌লে বিকেলবেলা বাড়ী যাস্'খন—"

সরযূর স্বামীপ্রীতি তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে সন্তুষ্ট করিয়াছিল,—তাহার প্রতি বড়গিন্নীর মনটা পূর্ব্বাপেক্ষা কোমল হইয়া উঠিল। পরদিন হইতে সরযূ আবার আগেকার মতই নিজের এবং সাধনের ভাত একত্র করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল; বড়গিন্নী আর তাহা লইয়া বাক্যব্যয় করিলেন না।

* * * *

যে জীবন দীন, যে জীবন হেয়,—যাহাদিগকে কেহ কোনদিন একটা কথা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, এ কাহিনী তাহাদের।—তাহাদিগের ক্ষুদ্র পরিসরের বাহিরে যে মানুষ থাকে, বুকে আনন্দ লইয়া, দেহে স্বাস্থ্য লইয়া, হাসিতে মুখ ভরিয়া, মাথায় দুর্ব্বুদ্ধি পূরিয়া,—মানুষে মানুষে যে কাটাকাটি, খাওয়াখায়ি করিয়া মরে, এ কথা তাহারা জানে না। ঝগড়া তাহারাও করে,—দিবারাত্র, চব্বিশপ্রহর,—কিন্তু মুখের উপরে মুখোস আঁটিয়া মনের মধ্যে বিষের ছুরী তাহারা শানায় না। কলহ বিবাদ তাহারাও করে বটে, কিন্তু তাহার ভিতরকার হুলটির অভাব, শিক্ষা ও সভ্যতা নাই, বোধ হয় সেইজন্যই।—

* * * *

মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসীর সভা বসিয়াছিল,—মাঠের মাঝখানে। বড়গিন্নীর বড় ছেলেটা সাইকেল চড়া শিখিতেছে। মাঠটা বেশ নিরাপদ,—অবশ্য সাইকেল চড়ার পক্ষে। সাইকেল জিনিষটা মানুষের অদ্ভুত প্রতিবেশী-প্রীতির কথা অনেক সময়ই স্মরণ করাইয়া দেয়,—ঘণ্টা হয় ত একটা লাগান থাকে, চেষ্টা করিলে হয় ত কখনও ক্রিং করিয়া বাজেও।—কিন্তু যে গাড়ীর তলায় অন্য লোক পড়িলে, যে চাপা পড়ে তাহার অপেক্ষা, চালকেরই চিৎপাত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা ঢের বেশী, সে গাড়ীর ঘণ্টা বাজাইয়া সাইকেল-আরোহী যে কাহাকে সাবধান করে, সে কথা মনে করিলে হাসি পায়। মনে হয় যেন, সাইকেলের ঘণ্টাটা মিনতি করিয়া বলে, "দোহাই তোমাদের, একটু রাস্তা ছাড়িয়া দাও, নহিলে মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িব—"

রাস্তার লোকেরা কিন্তু সতর্ক হয় না,—হাসে, "ভারী ত গাড়ী,—পড়ুক্ বেটা উল্‌টে—"

সেদিন বড়গিন্নীর বড়ছেলে উল্টাইয়া পড়িল, একেবারে

জংলীর মাসীর ঘাড়ে। জংলীর মাসীর হাতের কনুইটা গেল ছড়িয়া,—সামান্য একটু আঁচড়, একরকম কিছু-না বলিলেই হয়।

ওধারের আমড়াগাছের গুঁড়ির উপরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া বড়গিন্নীর বড়ছেলে মাথা কাটিয়া ফেলিল;—কিন্তু চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ডাহিনে বাঁয়ে না তাকাইয়াই ছেলেটা নিজের মাথার যন্ত্রণা ভুলিয়া এমন প্রচণ্ড দৌড় দিল যে, চোখের পলক ফেলিতেও তর সহিল না। সাইকেলটা রহিল মাঠের মাঝখানে পড়িয়া।

জংলীর মাসী উঠিয়া বড়গিন্নীর কাছে গেল; কহিল, "তোমার ছেলের কীর্ত্তি দেখ, মা'ঠান্,—হাতটা ভেঙ্গে দিলে। ওপরে শুধু একটুকুন্ ছড়ে' গেছে বটে, মা'ঠান্, —কিন্তু ভেতরের হাড় আমার একেবারে ছাতু হ'য়ে গেছে—" বলিয়া জংলীর মাসী চোখের জল মুছিল।— "আমরা ছোটলোক মা'ঠান্, গরীব মানুষ,—হাতখানা গেল! এ কি বাইসিকিল চড়া বাপু তোমার ছেলের—" বলিয়া জংলীর মাসী আবার চোখ মুছিল, "তোমার ছেলে বলেই কিছু বলিনে, মা'ঠান্,—অপর কেউ হ'লে, এতক্ষণে মুখখিস্তিতে—"

বড়গিন্নী কহিলেন, "কিছু মনে করিস্‌নে বাছা, ছেলেটাও হ'য়েছে একটা বাঁদর।—এই পাঁচটাকার নোটখানা ধর্ জংলীর মাসী,—ওষুধ-টষুধ কিনে হাতে মালিশ করিস্, কেমন থাকিস্ আমায় একবার বলে' যাস্ কাল—"

জংলীর মাসী ভারী খুসী;—কহিল, "সোনার চাঁদ ছেলে তোমার, মা' ঠান্,—একটু অশান্ত, তা' হ'ক্; ও-বয়সে ছেলেরা একটু দুষ্টুমি করেই থাকে। তুমি যেন ওকে মার-ধোর কোরোনি,; নেগেছে, নেগেছে, আমার হাতে নেগেছে, ও আমি গেরাহ্যি করিনে।"

সেদিন রাত্রিতে জংলীর মাসীর বাড়ীতে দস্তরমত মহোৎসব। ঘুঁটে বিক্রীর পয়সায় আর অমনতর উৎসব করিতে হয় না। জংলীর মাসীর দাঁত আর ঠোঁটচাপা থাকিতে চায় না,—সে কহিল, "দাঁতের মিশি ফুরিয়ে গেছে, জংলী, দোক্তাপাতা কাল কিন্‌ব—"

জংলী কহিল, "আর ফিলিম দেখ্‌তে যাবিনে?"

জংলীর মাসী বলিল, "হ্যাঁ, তাও যাব,—আর একটা হারিকেন কিন্‌ব, আর নেপের জন্যে তুলো, আর একটা ক্যাঁথার জন্যে পুরোন কাপড়,—তোর জন্যে গেঞ্জী—"

জংলী কহিল, "তোর জন্যেও একটা কিনিস্, মাসী—"

* * *

বড়গিন্নীর শরীরে মায়াদয়া আছে,—অত যে বড় ঘরের বউ, কিন্তু লেশমাত্র অহঙ্কার নাই। সমস্ত সংসারটা কড়ে আঙ্গুলের ইঙ্গিতে চলে,—প্রকাণ্ড একটা কলের মত, নিয়ম-মাফিক। সংসার-যন্ত্রের কোথাও একটি স্ক্রু অবধি ঢিলা নাই। তাঁহারই স্নেহচ্ছায়ায় যেন আত্মীয়-স্বজন, ছেলেপুলেগুলা বাস করে,—দাসী চাকর, গরীব দুঃখীগুলাও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হয় না। অতএব বড়গিন্নী লোক ভালো!—

* * *

হাব্‌লার মা'র যা গলা, শুনিলে ভয় হয়। মোটা নয়, সরু,—কিন্তু এক কথায়, শঙ্কাজনক। সে যখন কথা কয়, তখন মনে হয় যেন সমস্ত শব্দগুলা তাহার গলার ভিতরে একপাশে কাৎ হইয়া পড়িয়াছে;—তাহার কথা শুনিলেই বোধ হয় যেন, তাহার জিভ্‌টা নৌকার খোলের মত করিয়া লইয়া, গলার একপাশের চড়ায় আট্‌কাইয়া সে কথা কহিতেছে,—অত্যন্ত পাত্‌লা একটা কাঁসার থালায় লোহা দিয়া আঘাত করিয়া যেন তাহার কাৎ-হইয়া-পড়া শব্দগুলা বাহির হয়।

হাব্‌লার মা জানে না, পৃথিবীতে এমন সংবাদ নাই! লাটসাহেবের দরবারের সর্ব্বাপেক্ষা টাট্‌কা খবর হাব্‌লার মা জানে,—দুনিয়ার কোথায় কি ঘটিতেছে, এবং কেন ঘটিতেছে, তাহা জানিতে হইলে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না, হাব্‌লার মা'কে কেবলমাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে! বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের পাটের আমদানী-রপ্তানী হইতে আরম্ভ করিয়া, দেশালাইয়ের কল, বিড়ীর ফ্যাক্টরীর কোন ইতিবৃত্ত তাহার অজ্ঞাত নাই। হাব্‌লার মা এতবড় কালোয়াৎ!—

বিড়ীর ফ্যাক্টরীর কথা হাব্‌লার মা জানিবে না ত কি জানিবে ও-পাড়ার গদাইয়ের পিসি?—হাব্‌লার বিড়ী খাওয়া একটা দেখিবার জিনিষ;—সে যখন চোখ বুজিয়া বিড়ী টানে, তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভিড় জমিয়া যায়। সম্মুখে বসিয়া হাব্‌লার মা গর্ব্বিতমুখে সকলের দিকে

চাহিয়া বলে, "লোকে মনে করে মুখ দিয়ে ধোঁয়া নিয়ে নাক দিয়ে বার করে' দেওয়াটা আর অমন কি শক্ত? —কিন্তুন্ করুক দিগিনি তারা এম্‌নিতর,—সাত হাত জিভ্ বেরিয়ে যাবে বাবা,—অম্‌নি নয়! চার্‌টে বিড়ী একসঙ্গে খেলেই মাথা ধরে', পেট ফুলে' ঢোল হ'য়ে যাবে, —আর এ কি খেলা কথা! হাব্‌লার আমার কোনদিন কপালটি পর্য্যন্ত টিপ্‌টিপ্ করেনি—"

হাব্‌লার দিকে চাহিয়া পুনরায় বলে, "একবার জলন্ত দিকটা দিয়ে টান্‌না বাবা, এরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌বে বলে'—"

সেদিন গোটা সাতেক বিড়ী একসঙ্গে সূতা দিয়া বাঁধিয়া লইয়া, হাব্‌লা তাহাই টানিতে টানিতে লোকগুলার কাছে কেরামতী দেখাইতেছিল,—মায়ের কথায় বিড়ীগুলা ঘুরাইয়া লইয়া, আগুনের দিকটা মুখের ভিতর পুরিয়া দিয়া উল্টা টানিয়া, নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।—

হাব্‌লার মা কহিল, "আমার ষষ্ঠীর বাছা হাব্‌লা, ওর দৌলতে কতগুলো বিড়ীর দোকান চল্‌ছে! কত লোকের ভাত কাপড় জোগায় ও—"

অর্থনীতির বড় কথা,—চাহিদা ও জোগান দেওয়ার সরল ব্যাখ্যা! সাধে কি আর সরযূ বলে, হাব্‌লার মা সব জানে!—

হাব্‌লা যেন বিড়ী মুখে লইয়া, দেশালাই হাতে করিয়াই পৃথিবীতে জন্মিয়াছে!—

* * * *

ইহাদের বৈঠক বসিত, ঝগড়া হইত, পয়সা ভাগ হইত, হিসাব-নিকাশ হইত। দূরে বড়গিন্নীদের প্রকাণ্ড বাড়ীটা মাথা উঁচু করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিত,—সেই বাড়ীটা ছিল ইহাদের মস্ত ভরসা,—বাড়ীটা নয়, বড়গিন্নী! —মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসীর মধ্যে যখন ঝগড়া বাধিত, তখন বড়গিন্নী জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেন। মাঠের ভিতরকার গোরুগুলা তখন লেজ তুলিয়া দৌড় মারিত; গাছের উপরকার কাকগুলা কলরব করিতে করিতে উড়িয়া পলাইত। চারিজনের গলা যখন সম্মিলিত-ভাবে উপরের দিকে উঠিত, তখন এক বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি হইত। বড়গিন্নী জানালায় দাঁড়াইয়া বিরক্তি-কুটিল মুখে, ইসারা করিয়া ডাকিতেন,—মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসী নিঃশব্দে বড়বাড়ীতে প্রবেশ করিত, যেন তাহারা উঁচু গলায় পরস্পরের সহিত কোনদিন আলাপটি পর্য্যন্ত করে নাই, ঝগড়া ত পরের কথা। বড়গিন্নী বলিতেন "ফের আবার তোরা কোঁদল করছিস্?"

প্রত্যেকেই তাহার নালিশ জানাইত; বড়গিন্নী মীমাংসা করিয়া দিতেন।—বড়বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় মানদা বলিত, তাহার স্বামীকে হাঁপানিতে ধরিয়াছে; সরযূর কাছে সে পরামর্শ চাহিত, এখন সে কি করিবে।

সরযূ বলিত, "আর বলিস্‌নে মানি; আমিও ত খেটে খেটে হন্যে হ'নু,—এখন মরণ হ'লেই বাঁচি—"

জংলীর মাসী কহিত, "হাঁপানির ভালো ওষুদ জানে শেত্‌লাতলার পুরুত,—একদিন চ'না সেখানে যাই—"

সরযূ বলিত, "আমিও না হয় যাব'খন—"

হাব্‌লার মা কহিত, "শুধোব'খন বুনোর খুড়ীকে হাঁপানির ওষুদ,—সেদিন বল্‌ছিল বটে একটা অব্যর্থ শেকড়ের কথা—"

ভারী বন্ধুত্ব কয়জনে,—বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বেকার কণ্ঠস্বর আর নাই!—

* * * *

জংলীর মাসীর আজকাল কেবলই সাইকেল চাপা পড়িতে ইচ্ছা করে। জংলীর তখন ধুম জ্বর;—মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা আসিয়া তাহারকাছে বসে,—নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া ওষুধ আনে, পথ্য আনে। জংলীর মাসীর পয়সার বড় টানাটানি;—সে ভাবে, একবার সাইকেল চাপা পড়িয়া বড়গিন্নীর কাছে যাইতে পারিলেই ত পাঁচ টাকা—! সে বহুবার তাঁহার কাছে গিয়াছিল, টাকা চাহিতে, সাহায্য চাহিতে। বড়গিন্নী লোক ভালো, কিন্তু তাই বলিয়া যখন তখন, যাহাকে তাহাকে, যা তা করিয়া যে টাকাগুলা খয়রাৎ করিবেন, এতবড় আহম্মক তিনি নন্! গরীবের ছেলের অসুখ বলিয়া যে তিনি ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইয়া বেড়াইবেন, বড়গিন্নী সে মেয়ে নয়। কিন্তু নিজের ছেলে অপরাধ করিলে, তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে তিনি প্রস্তুত,—সে উদারতাও কিন্তু কম নয়, কয়জনেরই বা সেটুকু থাকে?—অতএব বড়গিন্নী যে লোক ভালো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই!

জংলীর মাসী গিয়া বলিল, "দাও না মা'ঠান্ পাঁচটা

টাকা,—দেব শোধ করে' শীগ্‌গিরই,—আমরা একটা গোরু কিন্‌ব মা'ঠান্ আস্‌ছে হপ্তায়,—রোজ দুধ দেব তোমাদের বাড়ী, তার দাম থেকেই কেটে নিয়ো না হয়—"

বড়গিন্নী কহিলেন, "গোরু ত আর তোর একার হ'বে না, যে, দুধের দাম থেকে টাকা শোধ দিবি ভাব্‌ছিস? দুধের দাম যদি না দিই, তুই ওদের পয়সা কোত্থেকে দিবি শুনি—"

জংলীর মাসী বলিল, "সে হ'বে'খন মা'ঠান্, তুমি দাও না আমায় ক'টা টাকা,—জংলী আমার ওষুদ পাচ্ছে না, পথ্যি পাচ্ছে না এমন কর্‌লে আর বাঁচ্‌বে না ও—" বলিয়া জংলীর মাসী হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বড়গিন্নী খুব মিষ্ট কথা কহিতে পারেন,—কহিলেন, "কাঁদিস্‌নে জংলীর মাসী,—অসুখ হ'য়েছে, সেরে যাবে, তার জন্যে এত ভাবনা কিসের? একটু সাবধানে থাকিস্, ভালো করে' সেবাশুশ্রূষা করিস্, অনিয়ম হ'তে দিস্‌নে যেন,—ভয় কি?"

জংলীর মাসী বলিল, "টাকা কি দেবে মা'ঠান্?"

বড়গিন্নী কহিলেন, "আমার হাতে ত এখন কিছু নেই, তা দেখ্‌ব কর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞেস্ করে,'—রাজী হ'বেন বলে' ত মনে হয় না। তুই আসিস্ একবার দিন পাঁচ সাত পরে,—আমার প্রত্যাশায় থাকিস্‌নে যেন, অন্য কোথাও চেষ্টা দেখিস্, বাছা—" বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "গরীব দুঃখী মানুষ তোরা, এত খরচ চালিয়ে চিকিৎসা করা কি তোদের কাজ? আহা, জংলী তোর শীগ্‌গির ভালো হ'য়ে উঠুক—"

* * * *

জীবনের প্রতি ইহাদের আকর্ষণ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়,—মনে হয়, কিসের লোভে ইহারা এমন করিয়া বাঁচিতে চায়। এ পৃথিবীর কোন্ জিনিষের টান ইহাদিগকে এমনভাবে অহরহ ধূলার পানে টানিতেছে। ইহাদের জীবনীশক্তিরও যেন শেষ নাই,—নুইয়া পড়ে বটে, কিন্তু ভাঙ্গে না, যেন কচিগাছের ছোট চারা। জীবন ইহাদের কঠিন হইয়া ওঠে নাই,—নমনীয়তা আছে, সেইজন্যই বোধ হয় ঝড়ের ঝাপ্‌টায় কাহিল হয়, কিন্তু সহজে উপ্‌ড়াইয়া পড়ে না।

ওষুধ জুটিল না, পথ্য জুটিল না,—বড়গিন্নী দুঃখ করিয়া বলিলেন, "কর্ত্তা টাকা দিতে রাজী হ'লেন না, জংলীর মাসী—" কিন্তু তবুও জংলী দিব্য সুস্থ হইয়া উঠিল। আবার সে "ফিলুম" দেখিতে চায়, রাঙা গেঞ্জী পরিতে চায়, জংলীর মাসী পুলকিত হইয়া ওঠে।

বিপদের দিনে মানদা, সরযূ, হাব্‌লার মা একেবারে জংলীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—দূরে বসিয়া মিষ্ট কথা শুনায় নাই। জংলীর মাসী অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলিল, "তোরা আমার জংলীর জন্যে কত করলি, ভগবান তোদের ভালো কর্‌বেন—"

সমস্বরে তাহার অংশীদারেরা জবাব দিল, "তোর যেন ঢং, - জংলী কি আমাদের পর?"

* * * *

মানুষের ভাগ্য যেন পুকুরপাড়ের সূর্য্য—ডুবিতে ভোলে না, কিন্তু উঠিতেও দেরী করে না,—হিসাব ঠিক আছে। জংলী ভালো হইয়া উঠিল, এইবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ধরিল সরযূর স্বামী সাধনকে। মানদা, হাব্‌লার মা, জংলীর মাসী আসিয়া দাঁড়াইল। বড়গিন্নীর নিকট টাকা ধার চাহিতে গিয়া সরযূ শুনিল,—"অসুখ হ'য়েছে, ভালো হ'য়ে যাবে, তা'র জন্যে অত ভাবনা করিস্‌নে সরযূ,—কর্ত্তাকে টাকার কথা বল্‌ব'খন, কিন্তু রাজী হ'বেন বলে' ত মনে হয় না।—" এবং শেষ অবধি কর্ত্তা রাজীও হইলেন না।

জংলীর মাসীর মনে সাইকেলচাপা পড়িবার ইচ্ছাটা প্রবল হইয়া উঠিল।

সেদিন সাধন জ্বরের ঘোরে ধুকিতেছিল,—সমস্ত দিন বার্লীর পয়সাটুকু পর্য্যন্ত জোটে নাই। সাধনের সম্বন্ধে ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা কল্পনা করা যায় না। তাহার আহার ছিল একটু বেশী, এবং সেইজন্যই সাধনের রোগের কষ্টের অপেক্ষা তাহার অনাহারের কষ্ট সরযূকে ঢের বেশী পীড়িত করিতেছিল। স্বামীর মাথার ধারে বসিয়া সরযূ ভাবলেশহীন চোখে চাহিয়া ছিল। ওর মনটা যেন এখন মস্ত বড়,—ও যেন আর এখন বাসন-মাজা ঝি নয়, ও যেন আর ঘুঁটেকুড়ুনীও নয়,—ওর হৃদয়ের ভাষা লইয়া এখন কাব্য রচনা করা চলে;—অলস, কর্ম্মবিমুখ, ভোজনবিলাসী, স্বামীর প্রতিও তাহার ভালবাসা সরযূকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। তাহার চিন্তার ধারা এখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল

জয় করে; কোন কল্পনা করিতেই সে আর আজ ভয় পায় না। সাবিত্রী যেদিন সত্যবানকে কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছিল মরণদেবতার গ্রাস হইতে, সেদিনের কথাও সরযূ ভাবে।—

সাধন চিরকালের অবুঝ,—কেবলই খাইতে চায়। সরযূ তাহার দিকে চাহিয়া মনে করে, ইহার প্রাণটা এমনই করিয়া "ভাত দে, ডাল দে, মুড়ি দে, রুটি দে, জল দে" করিতে করিতেই হয় ত এক সময় বাহির হইয়া যাইবে!—

মানদা আসিল, হাব্‌লার মা আসিল, জংলীর মাসী আসিল,—নিজেদের সকল সঞ্চয় উজাড় করিয়া সরযূর হাতে ঢালিয়া দিল। কিন্তু পয়সা আসিল সুঁচের ডগায়, বাহির হইয়া গেল হাঙ্গরের মুখে।—এ যেন অতলস্পর্শ গহ্বর, ঢিল ফেলিয়া আন্দাজ করিতে হয়, কয়টা টুক্‌রায় গহ্বরটা ভর্‌বে!—

দেখিয়া দেখিয়া জংলীর মাসী মাঠে গেল।—

* * * *

বড়গিন্নীর বড়ছেলেটার উৎসাহ আছে,—সাইকেলচড়া শেষ করিয়া মোটর চালাইতে শিখিতেছে; এবার আর মাঠে নয়, মাঠের পাশের বড় রাস্তায়। জংলীর মাসী গিয়া ফুটপাথের উপরে দাঁড়াইল,—সাইকেলচাপা পড়িয়া যদি পাঁচ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে মোটরচাপা পড়িলে নিশ্চয়ই বেশী টাকা পাওয়া যাইবে! বেচারী সরযূ, স্বামীর জন্য তাহার কত কষ্ট! বেচারা সাধন,—পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই, মহারাজ!

—বড়গিন্নীর বড়ছেলে সাহসী হইয়া উঠিয়াছে।—সাইকেল ছাড়িয়া মোটরে চড়িলে পদমর্য্যাদাও বাড়ে, ভরসাও বাড়ে! তাহার কাকার বেবি প্যজো গাড়ীখানা সে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে গারাজ্ হইতে লুকাইয়া বাহির করিয়া আনে;—কিন্তু গাড়ীটা যেন তাহার হাতে পড়িয়া স্বরাজ লাভ করে,—থামাইতে গেলে চলিতে চায়, চালাইতে গেলে নড়ে না,—ডানদিকে ঘুরাইতে গেলে যায় বাঁ-দিকে এবং বাঁ-দিকে ঘুরাইতে গেলে সোজা সম্মুখে অগ্রসর হয়!

বড়গিন্নীর বড়ছেলে চারিদিকে চাহিয়া দেখে চেনা অচেনা কয়জন লোক তাহাকে দেখিল।—রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন, রাস্তার আশপাশে জনমানবের চিহ্ন নাই,—গোরুগুলা ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে। বড়গিন্নীর বড়ছেলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। এমন সময় জংলীর মাসীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উৎসাহিত হইয়া উঠিল; অপ্রয়োজনে হর্ণটা একবার বাজাইয়া বলিল, "এত কম বয়সে বাঙ্গালীর ছেলেকে আর কখনও মোটর ড্রাইভ কর্‌তে দেখেছিস্ জংলীর মাসী? —আমিই প্রথম,—একে বলে পাইয়োনীয়ার—" কথাটা নূতন শিখিয়াছে, সেইজন্যই ব্যবহার সম্বন্ধে স্থান-অস্থানভেদের বিচার-বোধ এখনও সুস্পষ্ট নয়।

জংলীর মাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে শুধু চাহিয়া রহিল। বড়গিন্নীর বড়ছেলে মোটর লইয়া রাস্তার মাঝখানে তাহার কসরৎ দেখাইতে লাগিল। জংলীর মাসী অত্যন্ত ভীতপদে ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিল, ভাবিল, একটু কায়দা করিয়া গাড়ীচাপা পড়িতে হইবে, চাকাটা একেবারে গলার উপর দিয়া না যায়, একটু পাশে দাঁড়াইতে হইবে,—নহিলে—

বেবি প্যজো গাড়ী হঠাৎ জংলীর মাসীর ঠিক সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল,—ফুটব্রেক চাপিতে গিয়া ছেলেটা চাপিল এ্যাক্‌সেলারেটার। ষ্টিয়ারীং ডানদিকে ঘুরাইতে গিয়া ঘুরাইল বাঁদিকে।

জংলীর মাসী শুধু একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাস্তার উপর পড়িয়া গেল,—তাহার চোখ দুইটা স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল, বড়গিন্নীর বড়ছেলের দিকে নয়, আকাশের পানে। বড়গিন্নীর কাছ হইতে টাকা লইয়া আর সরযূকে দেওয়া হইল না! বেচারী সরযূ, অসুস্থ স্বামী লইয়া কি যে করিবে! বেচারা সাধন,—কোনদিন একটা পয়সা রোজগার করিল না, চিরকাল মেয়েটাকে জ্বালাইয়া খাইল! জংলীর মাসী বোধ হয় এই সব চিন্তাই করে, অত্যন্ত গভীরভাবে, ভারী দরদীর মতন, চোখের পলকে ফেলিবারও অবসর পায়না, নিশ্চয় সেই জন্যই।—



বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এইবার আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়—স্বপ্নের আলোচনার অবসর পাওয়া গেল।

স্বপ্ন দর্শন করিবার সময় মনের যে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) মনে যে সকল ভাব বা দৃশ্যের উদয় হয়, তাহা তখনকার মত বাস্তব এবং বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জাগ্রত অবস্থায় চিন্তাকালে বাহ্য বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ থাকে, নিদ্রাবস্থায় তাহা থাকে না—ভ্রান্ত বিশ্বাস সংশোধিত হয় না।

(২) সাহচর্য্যের ক্রম অনুসারে কাল্পনিক দৃশ্য বা বিষয় সকল ক্রমান্বয়ে পর পর মনশ্চক্ষে উদিত হইতে থাকে; অথচ, ঐ সাহচর্য্যের উপর আমাদের কোনই হাত থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় আমরা ইচ্ছা করিলে চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন করিয়া এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারি; কিম্বা চিন্তা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারি; স্বপ্নাবস্থায় এ সকল কিছুই পারি না। স্বপ্নের দৃশ্য সকল অবাধে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আসা-যাওয়া করে।

স্বপ্নাবস্থায় কোন একটা বিশেষ বিষয় কিম্বা কতকগুলি দৃশ্য কি ভাবে দেখা দেয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া মানুষের মনে একটা অদম্য কৌতূহল সদা জাগ্রত রহিয়াছে এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, স্বপ্নের ভিতর অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অনুসন্ধানের ফলে এ বিষয়ে এ যাবৎ, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, অনুমিত হইয়াছে বা সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটা পাঠক-পাঠিকাগণের অবধানের জন্য এখানে উপস্থিত করা গেল।

১। সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে কিম্বা যে সকল ভাব মনের ভিতর ক্রিয়া করিয়াছে, সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া জড়াইয়া এক হইয়া যায়। কিম্বা সম্প্রতিকার ঘটনাবলীর সঙ্গে কিছু দিন বা বহু দিন পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনা সমূহও মিশিয়া যাইতে পারে। এই মিশ্রিত ঘটনা ও ভাবগুলি এক অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন ঘটনায় পরিণত হয়। মনের অবস্থা তখন এইরূপ দাঁড়ায় যে, এই সকল ঘটনা যেন একই এবং পরস্পরের সহিত অল্প-বিস্তর সম্বন্ধযুক্ত। অথচ বাস্তব পক্ষে তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে, এবং প্রায়ই থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা হয় ত কোন শোকাবহ দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করিলাম; হয় ত বিদেশগত কোন আত্মীয়ের সম্বন্ধে কোন দুঃসংবাদ পাইয়াছি। কিম্বা আমাদের কোন ব্যবসায়ের অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে মন বেশ রীতিমত চঞ্চল রহিয়াছে। রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রা প্রগাঢ় হইল না। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলির পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বপ্নে একটি অখণ্ড ঘটনায় পরিণত হইল। যে দুর্ঘটনা পরের উপর দিয়া ঘটিয়াছে, স্বপ্নে তাহা আমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা গেল। যে আত্মীয়ের সম্বন্ধে দুঃসংবাদ পাইয়াছি, স্বপ্নে তিনি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আর, যে ব্যক্তিকে লইয়া ব্যবসায় সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে, তিনিও স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যের অন্যতম ব্যক্তি। এই তিনটি নিঃসম্পর্কীয় ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র বিষয় সাধারণ—তিনটির দ্বারাই মনে একই প্রকার ভাব বা চাঞ্চল্যের উদয় হইয়াছে। স্বপ্ন যখন দেখা গেল, তখনকার শারীরিক অবস্থাও হয় ত এই ঘটনাত্রয়কে সংযুক্ত ও মিলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে—হয় ত সে সময় পেটের ভিতর কোনরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া মনকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। দৈহিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে এইরূপ একটা সাম্য ভাব বা সামঞ্জস্য না ঘটিলে এই ধরণের স্বপ্ন দৃষ্ট হয় না। এইরূপ সামঞ্জস্যের অভাব স্থলে বিশেষ ভাবে এই স্বপ্নটি না দেখিয়া হয় ত অন্য কোন রকম স্বপ্ন দেখা যাইত; কিম্বা ইহার কোন কোন অংশ বিভিন্ন প্রকার সাহচর্য্যের সহিত সংযুক্ত ভাবে আবির্ভূত হইত। যেমন, দূরদেশগত যে আত্মীয়ের সম্বন্ধে দিবাভাগে দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তিনি হয় ত কোন পুরাতন প্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়া সেই ঘটনা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি বা ঘটনার সহিত আবির্ভূত হইতেন—বর্ত্তমান যে দুঃসংবাদের সংস্রবে তাঁহার স্মৃতি মনে জাগ্রত হইয়াছে, স্বপ্নের ভিতর হয় ত তাহার আভাষ মাত্র থাকিত না। আর একটা দৃষ্টান্ত—বহু বৎসর ধরিয়া যাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই, এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। তাঁহার সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে উভয়েরই পরিচিত ও বন্ধু এমন অন্য অনেক লোকের সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর লওয়া হইতে লাগিল। সুদূর অতীতের অনেক ঘটনার কথাও উঠিয়া পড়িল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম। সেই স্বপ্নে এই সকল লোক এবং তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য অনেক লোক ও অন্যান্য ঘটনার আবির্ভাব হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে এই সকল ব্যক্তি ও ঘটনার কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, স্বপ্নের

ত্রিসীমানায়ও তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল না। ইহার কারণ হয় ত এই যে, মনে যে সকল ঘটনা ও ব্যক্তির পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল, সেই সকল ঘটনা ও ব্যক্তির সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল না।

একটি স্ত্রীলোক পীড়িত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিল। সে যখন নিদ্রা যাইত, তখন ঘুমের ঘোরে অনেক কথা বলিত, অনেক লোকের নাম করিত, এবং বলিত, সেই সকল লোক এই হাসপাতালের অন্যান্য শয্যার রোগী বা রোগিণী। শুশ্রূষাকারিণীরা এই সমস্ত রোগীর নাম ও তাহাদের রোগের বিবরণ, এমন কি শয্যার সংখ্যা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটির মুখে স্পষ্টাক্ষরে শ্রবণ করিত; কিন্তু তৎকালীন রোগীদিগের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিদের কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। স্ত্রীলোকটি যে সংখ্যার শয্যায় যে রোগীর নাম করিত, সেই সংখ্যার শয্যায় সেই রোগী ত নহেই, হাসপাতালের কুত্রাপি সেই সেই নামের কোন রোগী তৎকালে ছিল না। অবশেষে হাসপাতালের কাগজ-পত্র অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গেল যে দুই বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীলোকটি আর একবার পীড়িত হইয়া সেই হাসপাতালে আসিয়াছিল, এবং তৎকালে অন্যান্য শয্যায় উল্লিখিত নামের রোগীরাও ছিল। স্ত্রীলোকটি তাহাদের নাম ও শয্যার সংখ্যার নির্ভুল ভাবেই উল্লেখ করিত বটে। বলা বাহুল্য, স্বপ্নে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইত।

২। প্রবল দৈহিক অনুভূতির সাহচর্য্যে স্বপ্নে নানা কাল্পনিক দৃশ্য সারিবন্দী ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে শীত ঋতুতে অত্যধিক শৈত্য হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য রাত্রিকালে গরম জলের বোতল পায়ের তলায় ঠেকাইয়া রাখিয়া শয়ন করিবার প্রথা আছে। বোতলের পরিবর্ত্তে আইসব্যাগের ন্যায় গরম জল পূর্ণ রবারের ব্যাগ পায়ের তলায় রাখিয়াও অনেকে নিদ্রা গিয়া থাকে। এই রকম একটি গরম জলের পাত্র লইয়া শয়ন করিয়া এক ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল যে, সে এটনা নামক আগ্নেয়গিরির শিখরদেশে ভ্রমণ করিতেছে, এবং পদতলের নিম্নস্থ মৃত্তিকা উত্তপ্ত বোধ করিতেছে। প্রথম জীবনে সে একবার ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিবার সময় সে যথার্থই পদতলের নিম্নের মৃত্তিকার উত্তাপ অনুভব করিয়াছিল। এখানে দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে স্বপ্নে সে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়-গিরির পরিবর্ত্তে এটনা আগ্নেয় গিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এটনা সম্বন্ধে তাহার নিজের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। অপর একজন লোকের এটনা ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সে এই আগ্নেয়গিরির বিবরণ পাঠ করিয়াছিল। স্বপ্নে এটনাশিখরে আরোহণ করিবার কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, এটনা-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গ্রন্থখানি সে অল্প দিন মাত্র পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিল। আর একবার এই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, একটা শীতঋতু সে হাডসন উপসাগরে কাটাইতেছে। এবং তুষারপাতের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। জাগ্রত হইয়া সে দেখিতে পায় যে, রাত্রিকালে যে বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সে শয়ন করিয়াছিল, ঘুমের ঘোরে তাহা সরিয়া যাওয়ায় তাহার গাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল; এবং এই শৈত্যানুভূতিই তাহার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিবার কারণ। আর ইহার অল্পদিন পূর্ব্বেই সে হাডসন উপসাগর প্রদেশে শীতঋতুর অবস্থার বর্ণনা একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল। আর একবার সে দন্তরোগে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। এই সময়ে একদিন রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখে যে, সে একজন দন্ত-চিকিৎসকের কাছে রুগ্ন দন্ত তোলাইতে গিয়াছে, এবং দন্ত-চিকিৎসক ভুল ক্রমে একটা সুস্থ দন্ত উপড়াইয়া ফেলিয়াছে; আর রুগ্ন দন্তটি স্বস্থানে রহিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও রুগ্ন দন্তের যন্ত্রণানুভূতি তাহাকে ঐরূপ স্বপ্ন দর্শনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। আর একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্তে জানিতে পারা যায় যে, এক ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী একই সময়ে একই কারণে একই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এক সময়ে ফরাসীদের দ্বারা স্কটল্যাণ্ড দেশ আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। ফরাসী সৈন্য জাহাজে করিয়া আসিয়া স্কটল্যাণ্ডের ভূমিতে অবতরণ করিলে তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এডিনবরা নগরের পুরুষ মাত্রেই সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিল। শত্রুর অবতরণের সংবাদ দেশময় প্রচার করিবার জন্য প্রথমে দুর্গ হইতে একটি কামান দাগিবার ব্যবস্থা হয়। সেই তোপধ্বনি শুনিবামাত্র সমগ্র দেশে এই সংবাদ প্রচারের জন্য নানা স্থানে সাঙ্কেতিক ধ্বনি (তোপ, ঢক্কা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি) করিবার ব্যবস্থা হয়—যেন সমস্ত দেশের লোক শত্রুর আগমনের সংবাদ জানিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনার উপলক্ষে এডিনবরার দুর্গের সম্মুখে প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে অল্প দিন মাত্র পূর্ব্বে পাঁচ হাজার সৈন্যের কুচ-কাওয়াজ হইয়াছিল। যে ভদ্র লোক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, তিনিও একজন স্বেচ্ছাসৈনিক ছিলেন, এবং যুদ্ধ করিবার জন্য ভয়ানক উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাত্রি দুইটা কি তিনটা—ভদ্রলোকটি নিজ শয্যায় নিদ্রিত। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কেল্লা হইতে প্রথম সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া দুর্গে চলিয়া গেলেন। সেখানে আরও যে তোপধ্বনি ও অন্যান্য সাঙ্কেতিক ধ্বনির অয়োজন চলিতেছিল, তাহা তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন। তার পর তিনি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া নগরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। নগরের সর্ব্বত্র তিনি লোকদের মধ্যে মহা ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিলেন এবং উত্তেজনামূলক ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। সৈন্যগণ ও গোলন্দাজরা আসিয়া জমা হইতেছে দেখিলেন। বিশেষ করিয়া প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে সামরিক আড়ম্বরের সীমা ছিল না। এই সময়ে তাঁহার পত্নী তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন—তাঁহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জাগ্রত হইয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী ভয়ঙ্কর ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। স্ত্রীর মুখে তিনি শুনিলেন যে, স্ত্রীও তাঁহারই ন্যায় স্বপ্নে সাঙ্কেতিক তোপধ্বনি, নগরে মহা কোলাহল, শত্রুর অবতরণ প্রভৃতি দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন; অতিরিক্ত ইহাও স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, বিগত যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর যে বন্ধু তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তিনি নিহত হইয়াছেন। স্ত্রী ও স্বামীর একই ভাবের স্বপ্ন দেখিবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় যে, একটা চিমটা কোন উচ্চ স্থান হইতে

কোন রকমে মেঝেয় পড়িয়া গিয়া শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং আসন্ন যুদ্ধের উত্তেজনায় উভয়ের মনের ভাব একই রূপ থাকায় দুইজনেই প্রায় একই রকম স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইহাও শারীরিক অনুভূতিমূলক স্বপ্ন। ডাক্তার রীড নামক এক ব্যক্তি আর একটি অনুভূতিমূলক স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন। কোনও একটা অসুখের দরুণ তাঁহার মাথায় বেলেস্তারা বসাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিদ্রাবস্থায় ঘুমের ঘোরে ব্যাণ্ডেজ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সরিয়া যাওয়ায় তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি অসভ্য নরখাদক বন্য জাতির হাতে পড়িয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার মস্তকের চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইতেছে।

অনুভূতিমূলক স্বপ্নের উৎপত্তি স্বাভাবিক ভাবেও হইতে পারে, কৃত্রিম উপায়েও হইতে পারে। কোন কোন লোক যখন নিদ্রা যায়, তখন তাহাদের কাণে কাণে ফুসফুস করিয়া কথা কহিলে তাহারা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সেনাদলের একজন সেনানীর এই বিশেষত্বটুকু একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। তাহার অপরাপর সেনানী বন্ধুরা এই তত্ত্বটুকু অবগত ছিল। এই সুযোগে তাহারা বিলক্ষণ রঙ্গ-রসের সৃষ্টি করিতে পারিত—লোকটি যখন নিদ্রা যাইত, তখন তাহার কর্ণে ফুসফুস করিয়া কথা কহিয়া তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত যে-কোন রকম স্বপ্ন উৎপাদন করিতে পারিত। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাহার কর্ণে কথা কহিত, সে যদি তাহার বিশেষ বন্ধু হইত, যাহার গলার আওয়াজ তাহার খুব সুপরিচিত, তাহা হইলে ত কথাই থাকিত না। একদা তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার কর্ণে এমন সকল কথা বলিল যে, সে স্বপ্ন দেখিল, একজনের সঙ্গে তাহার ভয়ানক বিবাদ বাধিয়াছে; উভয়ে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। ঝগড়ায় আগাগোড়া এই ভাবে আবৃত্তির পর তাহার পরিণামে ঘটিল—দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য যখন উভয়ে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, তখন বন্ধুরা তাহার হাতে একটা পিস্তল গুঁজিয়া দিল। সেনানী নিদ্রাঘোরেই পিস্তলের আওয়াজ করিল। সেই আওয়াজে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আর একবার সে একটা জাহাজের একটা কামরায় দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো শয্যায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার কয়েকজন বন্ধু তাহা দেখিয়া তাহার কাণে ফুসফুস করিয়া বলিল যে, সে জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে। অমনি সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যে সে সমুদ্রে পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ সাঁতার কাটিতেছে। শয্যার উপরই সে সত্যসত্যই সাঁতার কাটার ভঙ্গীতে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। তার পর বন্ধুরা বলিল, একটা হাঙ্গর তোমার পিছু লইয়াছে। তুমি ডুব সাঁতার কাটিয়া প্রাণ বাঁচাও। সে এত জোরে ডুব দিল যে শয্যা হইতে কামরার মেঝেয় ছিটকাইয়া পড়িল। ইহাতে তাহার শরীরের নানা স্থান ছড়িয়া গিয়াছিল। জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে সৈন্যদল তীরে অবতরণ করিল। এক দিন তাহার বন্ধুরা দেখিল, সে তাহার নিজের তাঁবুতে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে সময় শত্রুপক্ষ কামান দাগিতেছিল। সেই শব্দে তাহার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মেজাজ খারাপ দেখিয়া বন্ধুরা আমোদ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। তাহারা তাহার কাণে মন্ত্র জপিয়া দিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—সে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। ইহাতে, স্বপ্নে সে অত্যন্ত আতঙ্ক প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার ভাব দেখাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার বন্ধুরা তাহার কাণে কাণে ফুসফুস করিয়া তাহাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। এ দিকে তাহাকে আরও বেশী ভয় দেখাইবার জন্য আহত ও মরণোন্মুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কে আহত হইল, কে মারা পড়িল। তাহার বন্ধুরাও বাছিয়া বাছিয়া তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নাম করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা বলিল, তোমার ঠিক পাশের লোকটি মারা পড়িল। তখন সে পলাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্তভাবে নিদ্রাঘোরে খাট হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িতে লাগিল। অবশেষে তাঁবু বাঁধিবার দড়িতে পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং স্বপ্নগত আসন্ন বিপদ হইতেও সে রক্ষা পাইল। এই ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই সমুদয় পরীক্ষার পর সে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারগুলি স্পষ্টভাবে স্মরণ করিতে পারিত না, কেবল ভাসাভাসা ভাবে ও বিশৃঙ্খল ভাবে একটা অস্পষ্ট ক্লেশ ও ক্লান্তির আভাস তাহার মনে আসিত। সে তাহার বন্ধুদের প্রায়ই বলিত,—তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা তাহার সহিত চালাকী খেলিতেছে। আরও অনেক লোকের এইরূপ দুর্ব্বলতার কথা শুনা যায়—তাহাদের কাণেও ফুসফুস করিয়া কথা কহিয়া ইচ্ছামত স্বপ্ন উৎপাদন করা যায়।

শব্দ হইতে যে সকল স্বপ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যে শব্দে লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই শব্দ হইতে তাহারা স্বপ্নও দেখে। নিদ্রাভঙ্গ ও স্বপ্নদর্শন এতদুভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অতি অল্প, অথচ, এই অল্প সময়ের মধ্যে যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা দীর্ঘ কালব্যাপী বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, সৈন্যদলে যোগদান করিলেন, তৎপরে দল ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার সন্ধানে লোক ছুটিল, তিনি ধরা পড়িলেন, তাঁহাকে আবার ব্যারাকে আনা হইল, তাঁহার বিচার হইল; তাঁহার প্রতি এই দণ্ডাদেশ হইল যে গুলি করিয়া তাঁহাকে বধ করা হইবে; অবশেষে তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল; গুলি করিয়া মারিবার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হইল, এমন কি একটা বন্দুকের আওয়াজ পর্য্যন্ত করা হইল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন যে পাশের ঘরে একটা শব্দ হওয়ায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল এবং উহারই দরুণ তাঁহার স্বপ্ন-দর্শনও হইয়াছিল।

শব্দ ব্যতীত অন্য কারণেও ক্ষণকালস্থায়ী অথচ, দীর্ঘকালব্যাপী স্বপ্ন-দর্শন হইতে পারে। এক ভদ্রলোককে একবার একটা সাঁওতাল ভূমিতে নিদ্রা যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বহু কাল ধরিয়া শয়ন

করিয়া নিদ্রা যাইতে হইলেই মনে হইত তাঁহার দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আর সেই সঙ্গে তিনি এই স্বপ্ন দেখিতেন যে, একটা নরকঙ্কাল যেন সজোরে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, তাই তাঁহার দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তিনি যখন বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতেন, তখন কোন প্রকার অস্বস্তির ভাব মনে আসিত না, তিনি কোন দুঃস্বপ্নও দেখিতেন না। কিন্তু বসিয়া বসিয়া নিদ্রাবেশ হইলেও সমস্তক্ষণ ত বসিয়া নিদ্রা যাওয়া যায় না—শুইয়া পড়িতেই হয়, কিন্তু শয়ন করিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুঃস্বপ্নটিও আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য তিনি অনেক উপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু কোনটিই ফলপ্রদ হইল না। অবশেষে তিনি একজন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি আদেশ রহিল যে, তিনি বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইবেন, প্রহরী তাঁহাকে চৌকি দিবে। যখনই তিনি নিদ্রাবেশে ঢুলিয়া পড়িবেন, তখনই সে তাঁহাকে জাগাইয়া দিবে। এক দিন তিনি স্বপ্নে একটা নরকঙ্কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল। অবশেষে তিনি জাগ্রত হইলেন। জাগিয়া উঠিয়া তিনি ভৃত্যকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—সে কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিয়াছে; কেন সে তাঁহাকে অতক্ষণ ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিল; তিনি ঢুলিয়া পড়িবা-মাত্র কেন সে তাঁহাকে জাগাইয়া দেয় নাই। ভৃত্য অনেক শপথ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল যে, সে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও শয়ন করিয়া থাকিতে দেয় নাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি ঢুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে সে তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়াছে। ইহার পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে ভদ্রলোকটির এই দুঃস্বপ্ন দর্শনের অভ্যাস দূরীভূত হয়।

আর একটি ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখেন যে তিনি জাহাজে চড়িয়া আট-লান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় গিয়াছেন। সেখানে এক পক্ষ কাল যাপনের পর দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য তিনি পুনরায় জাহাজে উঠিয়াছেন। মধ্যপথে এক দিন তিনি সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত আতঙ্কিত হইলেন। অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তিনি দশ মিনিটের অধিক নিদ্রা যান নাই।

৩। পুরাতন ব্যাপার; তাহার কথা এখন কিছুই মনে নাই। এইরূপ সম্পূর্ণ বিস্মৃত বিষয়ের স্বপ্নে পুনরাবির্ভাব। বিস্মৃত বিষয় স্বপ্নে কি প্রণালীতে পুনরায় স্মরণ-পথে আসিয়া উদিত হয় তাহা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে। এইরূপ স্বপ্ন সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ব্যাপার কোনরূপ নিয়ম-পদ্ধতির অধীন বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নে এই শ্রেণীর স্বপ্নের দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

এক ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে চাকুরী করিতেন। কেহ ব্যাঙ্কে টাকা লইতে আসিলে তাহাকে টাকা দেওয়া ইঁহার কাজ ছিল। ব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মানুসারে যে সর্ব্বাগ্রে আসিবে, সে সর্ব্বাগ্রে টাকা পাইবে। এইরূপে পরে পরে আগত ব্যক্তিরা তাহাদের আগমন-কালের ক্রম অনুসারে যথাক্রমে টাকা পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কয়েক ব্যক্তি টাকার জন্য তাহাদের পালার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া ছয় পাউণ্ড চাহিয়া বসিল। সে বলিল, টাকা তাহাকে অবিলম্বে দিতে হইবে, এক মিনট দেরী করিলে চলিবে না। তাহাকে বলা হইল, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা যখন তাহার আগে আসিয়াছে, তখন তাহারাই আগে টাকা পাইবে, পরে তাহাকে টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু লোকটা সে কথা বুঝিতে চাহে না। লোকটা অত্যন্ত অধীর ভাবে সর্ব্বাগ্রে টাকা পাইবার জন্য অত্যন্ত গোলমাল করিতে লাগিল। বিশেষতঃ লোকটি আবার অত্যন্ত তোতলা এবং ক্রুদ্ধ হইলে তোতলামির তোতলামি সাধারণতঃ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহাদের কথা একেবারে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিলেন যে, লোকটিকে আগে টাকা দিয়া বিদায় করা হউক—এরূপ অপ্রিয়ভাষী লোকের উপস্থিতি ও সঙ্গ হইতে রক্ষা পাওয়া যাউক। প্রস্তাবটি সঙ্গত বিবেচনা করিয়া—কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হইল বলিয়া নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে—উক্ত কর্ম্মচারী লোকটিকে আগেই টাকা দিয়া বিদায় করিলেন; পরে অপর লোকদিগকে তাহাদের ক্রম অনুযায়ী টাকা দিতে লাগিলেন।

বৎসরের শেষে, অর্থাৎ এই ঘটনার প্রায় আট-নয় মাস পরে ব্যাঙ্কের বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সময় দেখা গেল হিসাব কিছুতেই মিলিতেছে না—ছয় পাউণ্ডের পার্থক্য ঘটিতেছে। কয়েক দিন ধরিয়া দিবারাত্রি খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়াও ভুল বাহির করিতে পারা গেল না।

কয়েক দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারী একদিন সন্ধ্যার সময় কর্ম্মস্থল হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া তিনি শয়ন করিতে গেলেন। নিদ্রাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, ব্যাঙ্কে যথাস্থানে তিনি বসিয়া আছেন। অর্থী প্রত্যর্থী প্রাপ্য টাকার জন্য আসিয়া ক্রমানুযায়ী অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময় ঐ তোতলা দুর্দ্দান্ত লোকটি টাকা চাহিতে আসিল। এইরূপে তাহার সহিত যেভাবে কারবার হইয়াছিল, সেই সমগ্র দৃশ্যটি বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে অভিনীত হইয়া গেল। তিনি যখন জাগ্রত হইলেন, তখন তাঁহার মনে ধারণা জন্মিল যে, গত কয়েক দিন ধরিয়া তিনি যে ভুল বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই স্বপ্ন বুঝি তাহারই সুযোগ করিয়া দেয়। পরদিন আপিসে গিয়া সেইদিনকার দৈনিক হিসাবের পৃষ্ঠা বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে তিনি দেখিলেন, ঐ তোতলা লোকটিকে যে ছয় পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, তাহা খাতায় তোলা হয় নাই; সেইজন্য এই ভুলটি হইতেছে এবং হিসাব মিলিতেছে না। অন্য অনেক স্থলেও স্বপ্নযোগে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্রে এইরূপ হিসাবের ভুল ধরা পড়িয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা শোনা যায়। এমন কি কঠিন গণিত বিষয়ক অঙ্কের সুসমাধান স্বপ্নযোগে হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বর্ত্তমান দৃষ্টান্তটিতে স্বপ্নরহস্যের একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আট-নয় মাস পূর্ব্বে সংঘটিত ঐ হিসাবের ভুলের কথা, এমন কি ঐ ঘটনার কথা উক্ত কর্ম্মচারীর কিম্বা ব্যাঙ্কের অপর কোন কর্ম্মচারীর আদৌ স্মরণ ছিল

না। অথচ স্বপ্নে সেইদিনকার সমস্ত ঘটনাগুলিই কর্ম্মচারীর স্মরণ-পথে উদিত হইল। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, সাহচর্য্যের (association-এর) কোন অবকাশই ঘটে নাই। ঘটনাটি মনে পড়িতে পারে এমন কোন সূত্রই উপস্থিত ছিল না। কারণ যে ঘটনার উপর এই ব্যাপারটি নির্ভর করিতেছিল, সেই ঘটনাটি এই যে, টাকা দিতে কোন ভুল হয় নাই—কেবল টাকাটা খরচের খাতে লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল। টাকা দিবার সময় কিম্বা দেওয়া হইয়া যাইবার পর, খরচটা যে খাতায় লেখা হইল না, এরূপ কোন সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও উক্ত কর্ম্মচারীর মনে উদয় হয় নাই। তা যদি হইত তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে কতকটা সাহচর্য্যের দরুণ তাহার এই স্বপ্ন-দর্শন ঘটিয়াছে। সুতরাং আট নয় মাস পূর্ব্বে সংঘটিত এবং অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত এই ঘটনার আগাগোড়া দৃশ্য স্বপ্নে তাহার দৃষ্টিগোচর হইল কেন, তাহার কোনই সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কেবল এইটুকু মাত্র অনুমান করা যায় যে, ছয় পাউণ্ড যখন কম পড়িতেছে, তখন ঐ ভদ্রলোক হয় ত স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, এই টাকাটা কাহাকেও অনিয়মিত ভাবে প্রদান করা হইয়াছে কি না, যাহাতে টাকাটা খাতায় খরচ লেখা হয় নাই। অথবা অন্য কোনরূপ ভুল হইল কি না। কিন্তু একটা বড় ব্যাঙ্কে যেখানে প্রত্যহ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের দেনা-পাওনার কারবার হইতেছে, সেখানে আট-নয় মাস পূর্ব্বে মাত্র ছয় পাউণ্ড কাহাকেও প্রদান করিয়া ভুল ক্রমে খরচ লিখিয়া না রাখার কথা স্মরণ করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। মোটের উপর এই বিচিত্র ব্যাপারটার সম্বন্ধে মনের এই ক্রিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যজনক।

ইহার সমশ্রেণীর আরও একটি ঘটনার কথা বলা যাইতেছে। এটি কিন্তু পূর্ব্বোক্তটির মত অতটা আশ্চর্য্যজনক নহে ; কারণ, এইটির ঘটনার সময় ও স্বপ্ন দর্শনের সময়ের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। স্বপ্ন দর্শন না করিয়াও, স্মরণশক্তি বলেই হয় ত এ ক্ষেত্রে প্রতিকার হইতে পারিত। সে যাহা হউক, ঘটনাটি এইরূপ—এক ব্যক্তির একটি বড় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইবার দিবসে তাঁহার হাত দিয়া যে সকল টাকার লেন-দেন হয়, দিবাবসানে তাহার হিসাব মিলাইবার সময় দশ পাউণ্ডের ঘাঁটতি হয়। লোকটি হিসাব মিলাইবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু ঘাঁটতির কারণ কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারেন না। তাঁহার প্রথম দিনের কাজেই এইরূপ গলদ হওয়ায় তিনি কতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিসাব গরমিল অবস্থাতে রাখিয়াই তিনি বাড়ী চলিয়া যান। রাত্রে নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, ব্যাঙ্কে নিজ স্থানে বসিয়া তিনি কাজকর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক আসিয়া দশ পাউণ্ডের একখানি হুণ্ডি তাঁহার কাছে ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেলেন। এই লোকটি উক্ত কর্ম্মচারীর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন। সকালে উঠিয়া স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। আরও মনে পড়িল, পূর্ব্ব দিবস স্বপ্নদৃষ্ট পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকটি তাঁহার নিকট হইতে যথার্থই একখানি দশ পাউণ্ডের হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কে গিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, হুণ্ডিখানি ছেঁড়া কাগজের সহিত মিশিয়া গিয়া মেঝেয় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং ঝাড়ুদাররা ঘর ঝাঁট দিয়া পরিত্যক্ত ছিন্ন কাগজপত্রের সহিত হুণ্ডিখানিও ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার পর অবশ্য হিসাব মিলিতে বিলম্ব হইল না। এ ক্ষেত্রেও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার ন্যায় বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিবার উপযোগী কোন সাহচর্য্যের সাহায্য পাওয়া যায় না।

অনেক সময়ে অন্য প্রকারেও বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিপথে ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। এক ব্যক্তি একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু নিয়মিত চর্চ্চার অভাবে সে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায়। পরে একবার তাহার কঠিন পীড়া হয়। পীড়িত অবস্থায় সে প্রলাপ বকিতে থাকে। সেই প্রলাপের মুখে বিস্মৃত ভাষা আবার তাহার মনে পড়িয়া যায়, সেই ভাষায় সে আবৃত্তি করিতে থাকে। স্বপ্নেও কখনও কখনও বিস্মৃত ভাষা স্মরণ-পথে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। এক ব্যক্তির গ্রীক ভাষা শিখিবার খুব ঝোঁক ছিল, এবং যৌবনে কিছু কিছু সে শিখিয়াও ছিল। পরে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করায় চর্চ্চার অভাবে সে গ্রীক ভাষা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায়। এমন কি সে এই ভাষা আদৌ পড়িতে পারিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে বহুবার সে গ্রীক ভাষার গ্রন্থ হইতে সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিত।

স্যার ওয়ালটার স্কট তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ওয়েভারলী উপন্যাসাবলীর এক স্থলে একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, ঘটনাটি সত্য। স্বপ্নটির মর্ম্ম এইরূপ—মিঃ আর নামক একজন জমিদারের বিরুদ্ধে একটা জমির বহু বৎসরের খাজনার বাবদ অনেক টাকার দাবীতে একটি নালিশ রুজু হয়। মিঃ আরের ধারণা ছিল, ঐ জমি তাঁহার পিতা স্কট-ল্যাণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত একটি বিশেষ আইন অনুযায়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং উহার স্বত্ব ও স্বামিত্ব তাঁহারই। যাঁহারা খাজনার দাবীতে নালিশ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ জমির এক সময়ে মালিক থাকিলেও এখন উহা আর তাঁহাদের নহে। মিঃ আর কিন্তু তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে ঐ জমি ক্রয়ের দলিল বহু অনুসন্ধানেও খুঁজিয়া পাইলেন না। সরকারী ভূমি সংক্রান্ত দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিয়াও ভূমি ক্রয়ের কোন নিদর্শন মিলিল না। যে সকল আইনজীবী মিঃ আরের পিতার বিষয়-সম্পত্তির সম্পর্কে আইনের কাজকর্ম্ম করিয়া দিতেন, সেই সকল ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়াও মিঃ আর তাঁহার ধারণার সমর্থনসূচক কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে অভিযোগের বিচারের দিন ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া আসিতে লাগিল। জমির ভূতপূর্ব্ব অধিকারীরা একটা ভিত্তিহীন দাবী উপস্থিত করিয়া অন্যায় করিয়া অনেক টাকা আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে ; অথচ, জমির যথার্থ অধিকারী যে মিঃ আর, তাহা সপ্রমাণ করিবার মত কোন দলিলই পাওয়া যাইতেছে না। মোকদ্দমায় পরাজয় অনিবার্য্য, দাবী অনেক টাকার—এই অর্থ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে ; পক্ষান্তরে, জমির মালিকানস্বত্ব যে তাঁহার নহে—অপর পক্ষের, সে কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব মিঃ আরের মানসিক অবস্থা

সহজেই অনুমেয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বাদীপক্ষের সহিত একটা মিটমাটের চেষ্টায় এডিনবরা নগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যেদিন যাত্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে মিঃ আর যথাসময়ে শয়ন করিতে গেলেন। নিদ্রাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গগত পিতা যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার মন এত চঞ্চল কেন ? তুমি এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ কেন ? কোন ভদ্রলোক বহু কাল পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইলেও স্বপ্নে তাঁহার আবির্ভাব হইলে কেহ বিস্মিত হয় না—স্বর্গত পিতাকে দর্শন করিয়া মিঃ আরও বিস্ময় অনুভব করেন নাই। মিঃ আরের মনে হয়, পিতার ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার দুঃখের কারণ পিতাকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখের বিশেষ কারণ এই যে, একটা মিথ্যা দাবীতে অনেক টাকা তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইতেছে। অথচ, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস—এ টাকা বাদীর যথার্থ প্রাপ্য নহে। এ দিকে তিনি কোন প্রমাণই বাহির করিতে পারিতেছেন না। মিঃ আরের পিতার প্রেতমূর্ত্তি পুত্রের দুঃখের কারণ শুনিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ বৎস। আমি ঐ জমি যথার্থই ক্রয় করিয়াছিলাম। ইহার জন্য তোমার নিকট হইতে খাজনার দাবী করিয়া অভিযোগ রুজু করা অপর পক্ষের সঙ্গত হয় নাই। জমি যখন কেনা হইয়াছে তখন উহার দলিলও নিশ্চয়ই আছে। এই দলিলগুলি মিঃ অমুকের কাছে আছে। তিনি এটর্ণী। এখন তিনি ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এডিনবরা নগরের নিকটবর্ত্তী ইনভারেস্ক নামক স্থানে এখন বাস করিতেছেন। বিশেষ একটা কারণে এই জমি ক্রয় সংক্রান্ত আইনঘটিত কার্য্যের ভার আমি এই ব্যক্তিকে দিয়াছিলাম। তিনি কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে আমার কোন কাজ করেন নাই। এই জমি কেনার ব্যাপার অনেক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হওয়ায় ঘটনাটা সম্ভবতঃ এখন তাঁহার স্মরণ নাই। তবে তুমি বিষয়টা তাঁহাকে এক পত্রে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিবে। যদি তিনি আমার কাজ করার কথা ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে বলিবে যে, আমি যখন তাঁহাকে তাঁহার পারিশ্রমিকের টাকা দিতে গিয়াছিলাম, তখন একটা পোর্ত্তুগীজ স্বর্ণমুদ্রা কোন মতে ভাঙ্গাইতে পারা যায় নাই। সেই জন্য দেনা-পাওনা চুকাইয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আমরা একটা শুঁড়ি-খানায় গিয়া উভয়ে মদ্যপান করিয়া খরচ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

পর দিন সকালে মিঃ আরের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও স্বপ্নের প্রত্যেক দৃশ্য ও কথা তাঁহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, অশ্বারোহণে ইনভারেস্কে গিয়া ব্যাপারটা যাচাই করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। অতএব পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে সোজাসুজি এডিনবরায় না গিয়া মিঃ আর ইনভারেস্কে গমন করিলেন। সেখানে স্বপ্নোক্ত এটর্ণীর খোঁজ করায় তাঁহার সন্ধানও মিলিল। জায়গাটি ছোট বলিয়া বেশী খোঁজও করিতে হইল না। ভদ্রলোকের বাড়ী পৌঁছিয়া মিঃ আর দেখিলেন, লোকটি অত্যন্ত স্থবির। স্বপ্নের উল্লেখ মাত্র না করিয়া মিঃ আর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতার (নামোল্লেখ করিয়া) জন্য এইরূপ কোন আইনঘটিত কার্য্য করিয়াছিলেন কি না। বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রথমে এরূপ কোন কাজ করার কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তখন মিঃ আর পিতৃ-নির্দ্দেশ মত পোর্ত্তুগীজ স্বর্ণমুদ্রার কথার উল্লেখ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তখন তিনি তাঁহার কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্য হইতে মিঃ আরের প্রয়োজনীয় দলিলখানি বাহির করিয়া দিলেন। সেই দলিল লইয়া মিঃ আর এডিনবরায় চলিয়া গেলেন, এবং উহা আদালতে দাখিল করিলেন। বলা বাহুল্য, যে মামলায় নিশ্চয়ই তাঁহার পরাজয় ঘটিত, ঐ দলিলের বলে তাহাতে তাঁহার জিত হইল।

পূর্ব্বে যে পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই পদ্ধতি অনুযায়ী এই স্বপ্নটির এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে, মিঃ আর কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার পিতার নিকট হইতে উক্ত জমি ক্রয়ের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অবশেষে এক্ষণে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, এই বিষয়টি লইয়া তিনি মনে মনে বিলক্ষণ তোলপাড় করিতে থাকেন। ইহার ফলে সাহচর্য্যের শ্রেণী ক্রমান্বয়ে তাঁহার মনে উদিত হইতে থাকে, এবং স্বপ্নে তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বিষয়টি তাঁহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে।

য়্যাসোসিয়েসন বা সাহচর্য্যের প্রভাবে স্বপ্নে বিস্মৃত বিষয় পুনরায় স্মৃতিপথে উদিত হওয়ার আরও দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। এডিনবরার একজন আইনজীবী একটি সম্পত্তি হস্তান্তর করা সংক্রান্ত দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট একখানি প্রয়োজনীয় কাগজ কোথায় রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না। সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটি দিনও ধার্য্য হইয়াছিল। কয়েক দিন ধরিয়া ঐ কাগজখানির অনেক অনুসন্ধান করা হয় ; কিন্তু কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না। অবশেষে নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্ব দিনের সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল ; তখনও দলিলখানির সন্ধান মিলিল না। ইহাতে উক্ত আইনজীবী এবং এই ব্যাপার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির উদ্বেগের সীমা রহিল না। উকিল মহাশয়ের পুত্র হতাশ হইয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যখন তাঁহার পিতাকে কাগজখানি প্রদান করেন, তখন টেবিলের উপর অন্য একজন মক্কেলের বিষয়-সম্পত্তি-ঘটিত বহু সংখ্যক দলিল-দস্তাবেজ ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতে কাগজখানি লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার ধারণা জন্মিল, ঐ মক্কেলের কাগজপত্রের মধ্যে হারানো কাগজখানিও হয় ত থাকিতে পারে। মক্কেলের দলিলাদি একটা স্বতন্ত্র বাক্সে রক্ষিত হইত। পুত্র ঐ বাক্স খুলিয়া সেই সমস্ত কাগজপত্র বাহির করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মক্কেলের কাগজের একটা বাণ্ডিলের সঙ্গে দরকারী কাগজখানিও বাঁধা রহিয়াছে। সহজেই বুঝা গেল, অন্যমনস্কতা বশতঃ ভুলক্রমে এই কাগজ

মক্কেলের কাগজের বাণ্ডিলের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছিল; এবং বাক্স বন্ধ করা হইয়াছিল। আর একবার একটা সরকারী আপিসের একজন কর্ম্মচারী এই ভাবে একখানি দরকারী কাগজ এমন জায়গায় রাখিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনের সময় তাহা পাওয়া যাইতেছিল না; এবং না পাওয়া গেলে তাঁহার চাকুরী যাইবার সম্ভাবনাও ছিল। অনেক অনুসন্ধানে কাগজখানি পাওয়া গেল না, কিন্তু স্বপ্নে একটা বিশেষ স্থানে উহা আবিষ্কৃত হইল, এবং পরদিন ঠিক সেই স্থান হইতে উহা বাহির হইল।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিস্মৃত বিষয় বা ঘটনা য়্যাসোসিয়েসনের সাহায্যে স্বপ্নে স্মরণে আসিতে পারে। যে সকল ঘটনা বা বিষয় বহুকাল পূর্ব্বে মন হইতে সম্পূর্ণ বিদূরীত হইয়াছে, যাহার লেশমাত্র কখনও মনে পড়ে না, এমন সকল বিষয়ও স্বপ্নযোগে স্মৃতি-পথে জাগরিত হইতে পারে। কেবল ইহাই নহে—এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সাময়িক ব্যাপার মাত্র, যাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার কোনই প্রয়োজনই হয় না। তাহা যে সময়ে ঘটে, মাত্র সেই সময়টুকুর জন্যই মনের সংস্পর্শে আসে, ঘটনার শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে তাহার স্মৃতিও সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায়। এইরূপ বিষয়ও মনে যে অস্পষ্ট আবছায়া ছাপ রাখিয়া যায়, সাহচর্য্যের কল্যাণে এমন ঘটনাও যে সময়ে সময়ে স্বপ্নযোগে মনের মধ্যে স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া ফুটিয়া উঠে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। এই উপায়ে আরও অনেক স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার অর্থ নিরাকরণ করা যাইতে পারে। এক জায়গায় একজন ফেরিওয়ালা নিহত হইয়াছিল। হত্যাকাণ্ডের যখন তদন্ত চলিতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আসিয়া তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারীদের কাছে প্রকাশ করিল যে, সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহাকে একটা বাড়ী দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং একটা অশরীরী বাণী ঐ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া জানাইয়াছে যে, ঐ জায়গায় নিহত ব্যক্তির বিক্রের পণ্য-পূর্ণ একটা বাক্স মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। অনুসন্ধানে মাটীর ভিতর হইতে বাক্সটি বাহির হইল বটে, কিন্তু ঠিক তাহার নির্দ্দেশানুযায়ী স্থান হইতে নহে, তবে উহার কাছাকাছি জায়গা হইতে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের প্রথমেই মনে হইল, লোকটি নিজেই হয় হত্যাকারী, না হয় ত হত্যাকারীর সহচর ও সহায়তাকারী। কিন্তু ইহার পর প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়িল। তাহার বিচার হইল ও সে দণ্ডিত হইল। ফাঁসী যাইবার পূর্ব্বে সে তাহার অপরাধের সম্পূর্ণ বিবরণ স্বীকার করিল। সে দৃঢ় ভাবে প্রকাশ করিল যে, স্বপ্নদর্শনকারীর এই হত্যা-কাণ্ডের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না, সে ইহার কথা জানিতও না। অনুসন্ধানে কেবল এইটুকু জানা গেল যে, হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে হত্যাকারীর সহিত স্বপ্নদর্শনকারীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং কয়েক দিন ধরিয়া উভয়ে একত্র থাকিয়া অনবরত মদ্য পান করিয়া মাতাল অবস্থায় ছিল। ঘটনার সহিত স্বপ্নদর্শনকারীর এইটুকু মাত্র সংশ্রব দেখা যায়। অনুমান হয়, মত্তাবস্থায় হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোন কোন কথা প্রকাশ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিবার মত মানসিক অবস্থা স্বপ্নদর্শনকারীরও ছিল না। সেই জন্য, তাহার নেশা কাটিয়া গেলেও এই কথা তাহার মনে ছিল না। কিন্তু স্বপ্নে একটু ভিন্ন আকারে তাহা তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল।

৪। আর এক শ্রেণীর স্বপ্ন আছে; তাহাও পরিদর্শন করিবার উপযোগী বিষয়। ইহাতে স্বপ্নে লোকের চরিত্রের প্রবণতা অথবা প্রবল মানসিক ভাবপ্রবণতা জড়িত থাকে। কতকগুলি স্বাভাবিক যোগাযোগের ফলে এই ধরণের স্বপ্ন বাস্তব জীবনে ফলিয়া যায়। একজন হত্যাকারী প্রকৃত নরহত্যা করিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, সে খুন করিতেছে। আর একবার একজন বিখ্যাত সেনানী একটা অদ্ভুত রকম স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং দশ বৎসর পরে সেটা ফলিয়া গিয়াছিল। ঘটনার সময় সেনানীর দশ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নের কথা একটুও মনে ছিল না। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এইরূপ—উক্ত সেনানীর বয়স যখন চৌদ্দ হইতে পনেরো বৎসরের মধ্যে, তখন তিনি ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি এটনা আগ্নেয়গিরির গহ্বরের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। বাহির হইতে যতদূর দেখিতে পাওয়া গেল তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অগ্রসর হইলেন। গহ্বরের চূড়ায় তখন প্রচুর ধূম ও অগ্নিশিখা উদ্গত হইতেছিল। কিন্তু নীচের দিকে কিয়দংশ বেশ শান্তই ছিল। গহ্বরের গাত্রে গায়ার খোপের ন্যায় গর্ত্ত ছিল। সেই গর্ত্তে পা আটকাইয়া দিয়া দিয়া তিনি নামিতে লাগিলেন। কিছু দূর নামিবার পর একটা গর্ত্তে পা রাখিবামাত্র তাহা ধ্বসিয়া গেল, তাঁহার পা ফস্কাইয়া গেল, তিনি গড়াইয়া গড়াইয়া গহ্বরের গর্ভে নিম্নতলের দিকে পড়িতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখনও তাঁহার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। জাগ্রত হইয়া তিনি দেখিলেন, ব্যাপারটা স্বপ্ন মাত্র। তথাপি যেন আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ভাবিয়া তিনি স্বস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশ সেনাদলের একজন ক্যাপ্টেন। একবার এই সেনাদল মেসিনা প্রদেশে প্রেরিত হয়। সেখানে অবস্থিতিকালে কয়েকজন বৃটিশ সেনাপতি একটা দল বাঁধিয়া এটনা গিরিশিখর দর্শনে যাত্রা করেন। এই ক্যাপ্টেনও ঐ দলে ছিলেন। দলটি যখন পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইল, তখন দলের অনেক লোক এমন পীড়িত হইয়া পড়িলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু এই ক্যাপ্টেন এবং অপর দুইজন সেনানী দুইজন পথ-প্রদর্শক সহিত পর্ব্বত-পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে লাগিলেন। হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহারা যে সময়ে পর্ব্বত-শিখরে পৌঁছিলেন, তখন সূর্য্যোদয় হইতেছিল। তাঁহারা এক ঘণ্টা সেখানে বিশ্রাম করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা কিছু খাইয়াও লইলেন। ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করিলেন যে, বিখ্যাত এটনা আগ্নেয়গিরির শিখরে ত উঠা গেল; কিন্তু গহ্বরের তলদেশটা একবার দেখা উচিত নয় কি? অন্যান্য লোকরা তাঁহার উপহাস করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পথ-প্রদর্শকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা তাঁহার সঙ্গে যাইবে কি না। তাহারা বলিল, তুমি পাগল, তাই এইরূপ দুঃসাহসিক কথা বলিতেছ। ক্যাপ্টেন তখন কাহারও অপেক্ষা না করিয়া একাকীই গহ্বরে নামিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া অপর একজন সেনানী তাঁহার সঙ্গী হইতে সম্মত হইলেন। পথপ্রদর্শকরা কোনরূপ সাহায্য করিতে স্বীকার করিল না। গহ্বরের বহির্দ্দিকের মুখের পরিধি তিন মাইল। আর তলদেশটা গোলাকার; তাহার পরিমাণ আন্দাজ তিন বিঘা। গহ্বরের মুখের এক অংশ দিয়া ধূম বাহির হইতেছিল বটে, কিন্তু তলা হইতে বহু বৎসর ধরিয়া কোন অগ্ন্যুদ্গম হয় নাই। গহ্বরের একদিককার কিয়দংশ ধ্বসিয়া গিয়া তলা পর্য্যন্ত ঢালু ও গড়ানে হইয়া গিয়াছিল। যাত্রীদ্বয় সেই দিকে গিয়া দেখিলেন বেশ সহজে নামিতে পারা যাইবে। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা অনায়াসে তলায় গিয়া পৌঁছিলেন। পথপ্রদর্শকদ্বয় উপর হইতে উঁকি মারিয়া তাঁহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিল। তাঁহাদিগকে তলদেশস্থ সর্ব্বনিম্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা যে কতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। সেনানীরা দেখিলেন, গহ্বরের তলাটা প্রস্তরখণ্ড ও ভস্মে পূর্ণ। তাঁহারা সহজে নামিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উঠিবার সময় তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। নরম ভস্মের উপর দিয়া উঠিতে হওয়ায় পায়ের নীচের মাটী সরিয়া গিয়া পদে পদে তাঁহাদের পদস্খলন হইতেছিল। যখন পুনরায় শিখরে উঠিলেন, তখন ক্লান্তিতে তাঁহারা একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে এরূপ অসমসাহসিক কার্য্য নিরাপদে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহারা বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে যখন তাঁহারা বাসায় সুখশয্যায় শয়ন করিতে গেলেন, তখন দশ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নবৃত্তান্ত ক্যাপ্টেনের মনে পড়িয়া গেল।

অনেক সময়ে সমসাময়িক ঘটনার দৃশ্য স্বপ্নে দেখা যায়। একবার এক পাদরী এডিনবরার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আসিয়া এক পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাত্রিতে নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার ঘরে আগুন লাগিয়াছে এবং তাঁহার একটি সন্তান সেই জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের কথা মনে পড়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ সহর ত্যাগ করিয়া নিজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যেখান হইতে তাঁহার বাড়ী প্রথম দেখা যায়, সেইখানে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন বাড়ীটি সত্য সত্যই পুড়িতেছে। তিনি দৌড়িয়া বাড়ীর নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন, এবং দেখিলেন, ছেলেমেয়েদের সকলকেই বাহির করা হইয়াছে; কেবল অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কে ও ব্যস্ততায় একটি সন্তান তখনও ঘরের মধ্যে রহিয়াছে। যাঁহারা তাহাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, পাদরী সাহেব তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া নিরাপদে ছেলেটিকে বাহির করিয়া আনিলেন। এরূপ ঘটনার স্থলে অনেক সময়ে ছায়ামূর্ত্তি বা প্রেতমূর্ত্তিরা আবির্ভূত হইয়া আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া যায়—সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস আছে। এই ধারণা সত্য কিম্বা ভ্রান্ত তাহার বিচার না করিয়াও বলা যায় যে, এই ধরণের স্বপ্নের অতি সহজ ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মনে করুন, পাদরী সাহেবের একজন ভৃত্য ছিল। লোকটা বড় অসাবধানী। বিশেষ

করিয়া অগ্নি সম্পর্কে তাহার অসাবধানতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার ভাব-গতি দেখিয়া পাদরী সাহেবের মনে ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল যে, সে কোন্ দিন বা তাঁহার ঘরে আগুন লাগাইয়া বসে! বাড়ীতে থাকিতেই চাকরটার অসাবধানতার জন্য পাদরী সাহেব সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। এখন বাড়ী হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার উদ্বেগ স্বভাবতই যে বেশী হইবে, তাহাও সহজে বুঝা যায়। কারণ, তিনি বাড়ীতে থাকিলে তাঁহার নিকট বকুনী খাইবার ভয়ে চাকরটা যতটুকুও সাবধান হইত, এখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে সে ত আরও অসাবধান হইবেই। আবার ধরুন, ভদ্রলোকটি উদ্বিগ্ন চিত্তে যখন শয়ন করিতে গেলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, সেই দিন তাঁহার বাড়ীর কাছে একটা মেলা বসিয়াছে। চাকরটা নিশ্চয়ই মেলা দেখিতে গিয়াছে, এবং সেখান হইতে প্রচুর তাড়ি খাইয়া নেশায় বুঁদ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে এই সকল ধারণা ও চিন্তার ফলে তাঁহার মনে স্বপ্নের সৃষ্টি হইল যে, তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে; এবং ঐ সকল ধারণা এতই সম্ভবপর ছিল যে, সত্য সত্যই তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগিল—তাঁহার স্বপ্ন সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

এক ব্যক্তির একটি আব (tumour) হইয়াছিল। সেই আবটি কাটাইবার দরকার হইয়াছিল। অস্ত্র-প্রয়োগের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল। দুইজন বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসককে রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত দিবসের দুই দিন পূর্ব্বে রোগীর পত্নী স্বপ্ন দেখিলেন যে, রোগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—সেই জন্য অস্ত্র-প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। পর দিন সকালে উঠিয়া রোগী ভদ্রলোকটি আবটি পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, উহার স্পন্দন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়াছে। এক কথায়, রোগ আপনা আপনি আরাম হইয়া গিয়াছে। যাহারা চিকিৎসক নহে, অর্থাৎ সাধারণ লোককে জানাইয়া রাখা দরকার যে, বিনা অস্ত্র-প্রয়োগে এই শ্রেণীর আব আরোগ্য হওয়া অতীব অসাধারণ ব্যাপার। এরূপ ঘটনা বড় একটা দেখা যায় না; এমন কি, একেবারে অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে যিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি হয় ত কাহারও মুখে এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইবার কথা শুনিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, স্বামীর রোগ এবং অস্ত্র-চিকিৎসার কথা ভাবিয়া তিনি যে বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। এই সকল যোগাযোগের ফলেই হয় ত তিনি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তবে তাঁহার স্বপ্ন ঠিক সেই সময়েই সফল হওয়া—সেটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বীকার করিতেই হইবে।

স্বপ্নে সতর্কতার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একটি ভদ্রমহিলা স্বপ্ন দেখিলেন যে, একজন কৃষ্ণকায় ভৃত্য তাঁহার এক বর্ষিয়সী আত্মীয়াকে হত্যা করিয়াছে। এই স্বপ্নটি তিনি একাধিকবার দেখিলেন। পুনঃ পুনঃ একই ধরণের স্বপ্ন দেখিয়া তিনি এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি স্বয়ং ঐ বৃদ্ধা আত্মীয়ার গৃহে গমন করিলেন এবং পরবর্ত্তী রজনীতে ঐ বৃদ্ধার উপর নজর রাখিবার জন্য এক ভদ্রলোককে রাজী করিলেন। রাত্রি তিনটার সময় উক্ত ভদ্রলোকটি সিঁড়িতে পদশব্দ

শুনিয়া, তিনি যেখানে লুকাইয়া বসিয়া ছিলেন, তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সিঁড়িতে ভৃত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে তখন কিছু কয়লা লইয়া উপরে যাইতেছিল। সে কোথায় যাইতেছে এই প্রশ্ন করা হইলে সে উত্তর করিল যে, প্রভুপত্নীর ঘরের আগুন নিবিয়া আসিতেছে বলিয়া সে তাহাতে কয়লা দিতে যাইতেছে। তাহার ইতস্ততঃ ভাব ও জড়াইয়া কথা বলার ধরণ দেখিয়া ভদ্রলোকটির মনে সন্দেহ হইল। বিশেষতঃ তখন গ্রীষ্মকাল, বেশ গরম চলিতেছে। এমন গরমের সময়ে, রাত্রি তিনটায় শয়নকক্ষে কয়লা জ্বালিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করার একান্তই প্রয়োজনাভাব। এইরূপ অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও অসম্ভব কার্য্যে তাহাকে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া ভদ্রলোকটির সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। খানাতল্লাসীতে কয়লার নীচে হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরাও বাহির হইল। আত্মীয়টি স্বপ্ন দর্শন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করায় বৃদ্ধা এ যাত্রা অপঘাত-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

আর একবার আর একটি মহিলা স্বপ্ন দেখেন যে, একটি বালক—তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র—অপর কয়েকটি বয়স্যসহ নৌকারোহণে সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গিয়াছে। পর দিন সকালে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে সেদিন তাঁহার কাছে আটকাইয়া রাখিলেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে তাহার বয়স্যরা নৌকাযাত্রা করিল। অপরাহ্ণে সংবাদ আসিল, তাহারা সকলেই সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। কেবল এই বালকটি তাহাদের সঙ্গে না থাকায় বাঁচিয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গলা বানান

আলোচনা

শ্রীহীরেন্দ্রনারাণ মুখোপাধ্যায় কাব্য-বিনোদ বি-এ

গত পৌষ ও মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" ভাষাপ্রবীণ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'বাংলা বানান' পড়িলাম। বিদ্যানিধি মহাশয় যে বলিয়াছেন "সমালোচনাই চাই", ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে আমিও স্বীকার করি, কারণ ভাষা সার্ব্বজনীন সম্পত্তি। যে কয়েকটী শব্দের লিখন-প্রণালী ও বানান সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

"আমরা সর্ব্বত্র অনুস্বারকে "ঙ"রূপে উচ্চারণ করি" তাহা মনে হয় না। "বাংলা" ও "বাঙলা" বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যখন ব্যবহৃত হয় না, বিশেষতঃ রাঢ়ে, তখন পূর্ব্বোক্ত দুইটির কোনটিই সার্ব্বজনীন হিসাবে স্বীকার করা চলে না। তবে 'বাঙ্গলার মধ্যস্থ যুক্ত ও স্থূল ধ্বনিকে এড়াইয়া ভাষা সহজ করিবার উদ্দেশ্যেই যদি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আপত্তি নাই; কারণ, উভয়েই ভ্রষ্ট এবং সামঞ্জস্যবিশিষ্ট। তবে "বাংলা"কে সমর্থন করিলে, "বাংলা" লিখিবার বেলায় গোলযোগ ঘটে যথেষ্ট। "বাঙলা"র বেলায় সে বিপদ থাকে না। 'বাঙ্গলা' ও "বাঙ্গালী" পৃথক পৃথক অক্ষরগত বানানের হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

যাহা হউক, আসল প্রশ্ন, 'ঙ' অক্ষরের উচ্চারণ কিরূপ? সংস্কৃতে বানান ও উচ্চারণ লইয়া টানাটানি করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ "বাঙ্গলা" সংস্কৃত নয়। এখন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে কয়েকটী অক্ষরের ধ্বনি লইয়া। বিশেষতঃ "ঙ", "ং", "ঞ"। "ঙ" "ং" এবং "ঞ" ইহাদের কোনটীরই স্বাধীন ধ্বনি আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না। ইহারা যে কতকটা "অনুধ্বনি" তাহা উচ্চারণে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। এই জন্যই মৌলিক কয়েকটী "স্বরের" মৃদু ধ্বনির সাহায্য না লইয়া ইহাদিগকে উচ্চারণ করা যায় না। উচ্চারণ অনুসারে "ঙ" "ঞ" এবং "ং" এই তিনটীকে "অর্দ্ধধ্বনি"ও বলা চলে।

"ঙ" "ং" ও "ঞ" এই তিনের ধ্বনির মধ্যে একটা মিল আছে বটে, কিন্তু তিনটীর মধ্যে কোনটীই কাহারো সহিত সম্পূর্ণ সমধ্বনি নহে। তিনটী ধ্বনির গতি বিভিন্নমুখী। "ঙ"র ধ্বনি আত্মমুখী, "ং"র বহির্মুখী, এবং "ঞ"র ধ্বনি অধোমুখী। প্রাচীন কাব্য ও সাহিত্যে ক্রিয়ার সহিত "ঙ" ও "ঞ" এই উভয়েরই বহুল ব্যবহার পাওয়া যায়। তাহাতে একটী জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। "ঙ" আত্মমুখী ধ্বনি বলিয়াই উত্তমপুরুষে "ঙ" ব্যবহার একটু বেশী দেখা যায়, এবং মধ্যম ও প্রথমপুরুষে "ঞ" ব্যবহার বেশী দেখা যায়। "পাখীজাতি যদি হঙ; পিয়া পাশে উড়ি যাঙ"—(কর্ত্তা মুঁ)। "রাধাক দেখিঞা কাহ্নে, উতরল ভৈলা মনে।" "বড়ায়িক সম্বোধিঞা বুলিল বচনে।" (কর্ত্তা প্রঃ পুঃ)। যাহা হউক, "ঙ"র ধ্বনি ঠিক "উঁ"কি? ("উ"ও"ঁ" র মিশ্র ধ্বনি শুনিতে কুন্থনধ্বনিবৎ) "উঁ" স্থলে "উা" চিহ্ন দ্বারা "ঙ"র ধ্বনি নির্দ্দেশ বোধ হয় আরও স্পষ্ট হয়। ঐরূপ ক্ষেত্র বিশেষে "ঙ"র ধ্বনি "ওা" হইয়া থাকে। কোনো শব্দের সহিত যোগ না করিয়া, "ঙ"কে পৃথকভাবে উচ্চারণ করিতে হইলে, আমরা সাধারণতঃ মৃদু "উ" কিম্বা "ও" (কখনো বা "অ") প্রাক্‌ধ্বনিরূপে ব্যবহার করি। উহার নামকরণও তদনুসারেই হইয়াছে। কিন্তু "ঙ" কোনো অক্ষরের অনুগমন করিলে, তখন তাহাকে পূর্ব্ববর্ণের "স্বর"টীর সাহায্যেই উচ্চারণ করি। "পাখী জাতি যদি হঙ; পিয়া পাশে উড়ি যাঙ।" "হঙ"এর "ঙ"—"আ", "উা" এবং "ওা" তিন প্রকারেই উচ্চারণ করা চলে, তবে "আ" যেন অধিক প্রযোজ্য। "যাঙ" উচ্চারণে "আা" অধিক স্পষ্ট, তবে "উা" এবং "ওা" করা চলে; কিন্তু বেশী স্পষ্ট হয় না। "খাঙন মেগ", এখানে "ঙ" স্পষ্ট "া"অ"।

অনুস্বার যে অনুধ্বনি, তাহা নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। "ং"এর পৃথক উচ্চারণ দেখি না। ইহা সর্ব্বদাই পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর লইয়া আসে; সুতরাং পূর্ব্ববর্ণের স্বরের সহিত—ং যোগ করিয়া ইহাকে উচ্চারণ করা হয় এবং ইহার পক্ষে সে নিয়ম সর্ব্বদাই খাটে।

"ব'লে'", "ক'য়ে", "চ'লে'" ইত্যাদি লিখিতে—যে ঊর্দ্ধ কমা ব্যবহার করা হয়, তাহা কতকগুলি লুপ্তবর্ণের চিহ্ন। সাধারণ বক্তৃ

ভাষার মৌখিক রূপ লিখিতে যে ঊর্দ্ধ কমা ব্যবহার করা হয়, তাহাকে লুপ্তবর্ণের সাধারণ চিহ্ন হিসাবে ধরিয়া রাখিলে বোধ হয় বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। ভাষা শিক্ষায় আসাধারণ শব্দ আয়ত্ত করিতে যত কষ্ট হয়, নিত্যকথ্য শব্দে তাহা হয় না। কেন না, নিত্যকথ্যগুলির মৌলিকরূপ প্রায় সকলেরই পরিচিত, এবং লেখ্য ভাষায় বহুলভাবে সেই-গুলিই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ব'লে', ক'য়ে, চ'লে' প্রভৃতিতে বো—, কো,—, চো— কিম্বা—ল্যে,—য়ে্যে—ল্যে ইহাদের কোনটীই সন্তোষজনক প্রণালী বলিয়া মনে হয় না। লেখ্য ভাষায় যখন বলিয়া কহিয়া, চলিয়া নিত্য ব্যবহার করা হয়, তখন "কথোপকথনের" ব'লে, ক'য়ে, চ'লে' ব্যবহার বিশেষ রূপ-বিভ্রাট ঘটায় না। সেদিকে ততখানি ধরিলে, "বাংলা"ও আভিজাত্য নির্ণয়ে কম গোলমাল ঘটাইবে না। চল্‌তি কথায় সাধারণ 'লুপ্ত-চিহ্ন' হিসাবে ঊর্দ্ধ কমা ব্যবহার করিলে, চাকর্যে, পুর্য্যে, তিল্যে, গুড়্যে ইত্যাদি লিখিবারও প্রয়োজন নাই। চাক্‌রে', পুরে', গুড়ে' ইত্যাদি লিখিলে বিশেষণত্ব লুপ্ত হয় না। উহাদিগকে যখন ছাঁটকাট করিয়া কথ্য ভাষাই করা হয়, সাধুভাষা রূপে ব্যবহার করা হয় না, তখন উহাদের আভিজাত্য জানাইবার পক্ষে 'লুপ্ত-চিহ্ন'ই যথেষ্ট। ইয়া প্রত্যয়ের চিহ্ন বজায় রাখিতে যদি য-ফলা "্য" দিতে হয়, তাহা হইলে লৈখিক 'বলিয়া'কে মৌখিক বা কথ্যতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, কেবল 'বল্যে' 'গুড়্যে' ইত্যাদি বলিলে চলে না; "বল্যা", "গুড়্যা" ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়। গঠন খাস্ পূর্ব্ববঙ্গের স্বরূপ ধারণ করে। শব্দের আভিজাত্য নির্ণয়ে ইহাও পরিণামে পশ্চিমবঙ্গে গোলযোগের সৃষ্টি করিবে। 'গুড়্যা'তে "ইয়া" প্রত্যয় অটুট্ আছে, তাহা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে, তাহাতে ঠিক্ 'গুড়' শব্দটী আছে কি না তাহা ভাবিয়া উঠাই অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে। সুতরাং লুপ্তটুকুকে শুধু "লুপ্ত-চিহ্ন" দ্বারা প্রকাশ করাই সুবিধাজনক এবং সার্ব্বজনীন।

ঠাকুর মা—মৌখিকে ঠাকুমা শোভন এবং যথেষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায়। তবে ঠাকুরঝি—মৌখিকে 'ঠাকুঝি' উচ্চারণ বিশেষ শুনি না। ঠাকুরঝি—কথ্য='ঠাকুজ্‌ঝি' অধিক চলিত। কোথাও কোথাও শেষের 'ঝ'টী এত মৃদু যে, উচ্চারণ ঠিক "ঠাকুজ্জি" বলিয়াই মনে হয়।

"তোমাদের ভিতরে কে সাহসী" ইহাতে "মধ্যে" অর্থে "ভিতরে" ব্যবহার করিতে দোষ কি?

'আজে বাজে' ছাড়া 'আঁকা বাঁকা' 'হের ফের' প্রভৃতি আরো শব্দ আমরা বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণে ব্যবহার পাই। বিশেষণে ছায়া পূর্ব্ব-গামী না-হইবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি? আমার মনে হয়, যাহাতে উচ্চারণ সহজ ও শুনিতে ভাল হয় সেইরূপেই উক্ত যুগলগুলি (ছায়া+শব্দ) সাজাইয়া লওয়া লইয়াছে। 'বিজি বিজি' (বীজ বীজ) হইতে 'ইজি বিজি' ও 'হিজিবিজি' হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'হিজিবিজি' অর্থে আমরা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সমন্বয় বুঝি, কিন্তু 'হিজি-বিজি'তে বুঝি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। 'হিজিবিজি' অর্থে কুণ্ডলীকৃত, বক্র ও জটিল দীর্ঘ বস্তু সমূহের সমন্বয় বুঝা যায়। কেবল পূর্ব্বগামী 'বিজি' শব্দটীর স্থলে 'হিজি' ব্যবহারে এতদূর পার্থক্য ঘটিতেছে। 'হিজি'টী 'বিজি' শব্দের ভ্রংশরূপ হইলে, এত পার্থক্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। 'হিজি'কে 'বিজি'র ছায়া বলিয়াই বোধ হয়। এই সকল যুগল শব্দ (ছায়া+শব্দ) গঠিতই হইয়াছে কেবল ধ্বনির গুণ বাড়াইয়া শব্দার্থকে বিশেষ রূপ দিবার উদ্দেশ্যে। 'জড়' পদার্থ ব্যতীত 'চেতন' পদার্থের ক্ষেত্রেও আমরা সময় সময় ছায়া পশ্চাদ্‌গামী দেখি; "মোটা-সোটা" মানুষ, "ঢিলে-ঢালা" লোক।

বাংলা বানান

(আলোচনা)

শ্রীবীরেশ্বর সেন

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় আমার বাংলা ভাষা প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছেন আমি তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

'বাংলা' বানানটা আমি এই জন্য ভুল বলিয়াছিলাম যে সংস্কৃতে ঙ এবং অনুস্বারের উচ্চারণ অভিন্ন নহে। বাংলায় আমরা অভিন্নরূপে উচ্চারণ করি। ইহাই ভুল। 'বাংলা' বানান ভুল হইলেও আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছিলাম। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তাহাতে আপত্তি হইল কেন বুঝিলাম না। ইংরেজীতে can এবং ভূতকালে could ভুল বানান coud হওয়া উচিত। কিন্তু সকলেই could লেখেন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু পণ্ডিত "বাঙলা"ই লেখেন। অর্থাৎ ওকারের সংস্কৃত উচ্চারণই লেখেন।

অনুস্বারের উচ্চারণ যে অ আমি এমন কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছিলাম অনুস্বার যে স্বরের পরে থাকে সেই স্বর দ্বিরুক্ত হইয়া চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে প্রায় অনুস্বারের উচ্চারণ হয়।

'তিণ্ডস্ত' শব্দে উকারের উচ্চারণ সকলেই যেরূপ করেন তাহাই ঙ বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ। শিলঙ, রঙপুর, রাঙা, রঙীন, আঙুল প্রভৃতি শব্দেও ঙ বর্ণের প্রকৃত ধ্বনি আছে। কোন প্রদেশে বা সমস্ত দেশে 'হয়' কে 'হঙ' লেখার ব্যবহার লক্ষ বৎসরের পুরাতন হইলেও তাহা অশুদ্ধ। ইহা যদি শুদ্ধ হয় তাহা হইলে 'আমি' স্থলে 'য়ামী' এবং 'মহেশ' স্থলে 'মহেষ'ও শুদ্ধ—তাহা হইলে অশুদ্ধ বানান বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না। একজন স্কচ্‌ম্যান এক হেডমাষ্টারকে লিখিয়াছিলেন I wish to inter my boy in your skull. এটাও তাহা হইলে শুদ্ধ বানান।

আমি প্রকৃত শুদ্ধাশুদ্ধ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি, স্থানবিশেষের উচ্চারণের পক্ষপাতী হইয়াছি, বিদ্যানিধি মহাশয় ইহা কেন ভাবিলেন তাহা বুঝিতে পারি না।

গেলে কোঁয়ে চোলে লিখিলে ধাতু চিনিতে পারা যায় না এই উক্তি আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। যদি সংস্কৃত ভূ ধাতু হইতে বভুচ্চ,

অস্ ধাতু হইতে ভবিষ্যতি, অভূৎ। ইংরেজী bring হইতে brought' fight হইতে fougut, বাংলা বলা ধাতু হইতে বোল, বুলি, খা হইতে খেয়ে, যা হইতে গিয়ে হইতে পারে তাহা হইলে উচ্চারণানুরূপ বানান চোলে, কোয়ে বোলে র ওকারে আপত্তি করিয়া একটা নূতন সৃষ্টি কমা দিবার প্রয়োজন কি তাহা বুঝিতে পারি না। সেই কমার যদি একটা বাংলা নাম থাকিত তাহা হইলেও হইত। বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে বোলে কোয়ে চলে বানানের সময় এখনও হয় নাই। আমি কিন্তু ষাট বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দু বিকাশ হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছিলাম "প্রাণ জ্বোলতে হোলেই বোলতে হয়" ইত্যাদি।

আমি নিজেই যখন বলিয়াছি যে ঠাকুরদা অথবা ঠাকদ্দা লেখাই ভাল ছিল, তখন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করার বোধ হয় তেমন প্রয়োজন ছিল না। বিদ্যানিধি মহাশয় শুনিয়াছিলেন রেফের নিচে দ্বিরুক্ত দ অশুদ্ধ। আমি কেবল ইহার সূত্র জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি তাহার স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। এখন তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে রেফের নিচে দ্বিত্ব বর্ণ লেখা তাঁহার মতবিরুদ্ধ। আমার কিন্তু মত এই যে যখন আমরা দ্বিত্বরূপে উচ্চারণ করি তখন বানানও তদনুরূপ হওয়া উচিত। আমরা বলি কর্ত্তা, হিন্দুস্থানীরা বলেন কত্তা। এই শেষ কর্ত্তার উচ্চারণ কেয়া কর্তা হ্যায় জী? এই প্রশ্ন মধ্যস্থ কর্ত্তার মত। আমরা বলি ভর্ত্তা। হিন্দুস্থানীরা আহারের জন্য ভত্তা প্রস্তুত করেন। ভর্ত্তা=ডাল, বেগুন, আলু প্রভৃতি যাহা প্রথমে ভাতে দিয়া বা পোড়াইয়া পরে তেল লবণ লঙ্কা মাখিয়া খাওয়া হয় তাহাকে ভর্ত্তা বলে। পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত লোকজন কত্তা, দক্ষিণ বঙ্গের অশিক্ষিতেরাও কর্ত্তা বলে। মধ্য বঙ্গে বলে কত্তা—অর্থাৎ রেফ হীন। বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে রেফের নিম্নস্থ ব্যঞ্জন মাত্রে দ্বিরুক্ত হয়। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন "কালক্রমে দ্বিত্ব উচ্চারণ লুপ্ত হইতেছে" এ কথাটা বোধ হয় ঠিক্ নহে। তবে ইহা ঠিক যে যে সকল বর্ণ দ্বিত্বরূপে লিখিতে আয়াস হয় সেগুলি এখন আর দ্বিত্বরূপে লেখা হয় না; যেমন তর্ক, মূর্খ, গর্গ ইত্যাদি। শর্ম্মা শব্দের ম দ্বিত্ব হয় কিন্তু বর্মার ম দ্বিত্ব হয় না। তেমনি ঠাকুর্মা শব্দের ম দ্বিত্ব হয় না। কিন্তু ঠাকুর্দ্দা সেরূপ নহে। ইহার দ দ্বিত্ব হয় যাহা আমরা চলিত ঠাকুদ্দা হইতে বুঝিতে পারি। সুতরাং ঠাকর্দ্দা লেখায় এমন কি দোষ হইয়াছে।

একটা অবান্তর প্রশ্ন। আমরা বলি মাত্তে, ধত্তে, কত্তে। অথচ লিখি মার্‌তে, ধর্‌তে, কর্‌তে। কেন?

শতকে ৫০জন শিক্ষিত বাঙালী 30 এবং 40কে থার্ট্টি এবং ফর্ট্টি বলেন। কেন?

আজে বাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা নিতান্তই আজে বাজে ছিল।

ভারতের পঞ্চকন্যা

রায় সাহেব শ্রীশ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য

বলং বার বিজ্ঞানাভূয়োঽপি হ শতং
বিজ্ঞান বতামেকো বলবানা কম্পয়তে।
বলেন দেব মনুষ্যা বলেন পশবশ্চ
বয়াংসি চ তৃণ রনস্পতয়ঃ। বলেন
লোকস্তিষ্ঠতি। ছাঃ উঃ ৮।১

তত্ত্বপিপাসুগণ প্রাপ্ত পদার্থের যথাদৃষ্ট অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সেই পদার্থের সত্য স্বরূপ কি তাহা জানিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানবিৎগণের আচরণ একটু পৃথক। ইহাঁরা পদার্থের যথাদৃষ্ট ভাবটিকে লইয়া কার্য্যান্তরে প্রয়োগ জন্য, তাহার সাধ্যসাধন প্রক্রিয়া লইয়াই ব্যস্ত থাকেন ও তাহাতেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ মনে করেন। তত্ত্বপিপাসু ও বিজ্ঞান-পিপাসুগণের মধ্যে সংক্ষেপতঃ এই প্রভেদ। প্রথমটিকে প্রায় পাগল বলিয়া ধরা হয় এবং তিনি চলিত সংসারে নানারূপে লাঞ্ছিত ও দরিদ্রতার পীড়নে নিষ্পেষিত হয়েন; আর দ্বিতীয়টি সাংসারিক জীবনে অশেষ উপকারিতা দেখাইয়া চলিত সংসারে পরম আদরের সহিত গৃহীত ও পূজিত হয়েন। তাঁহার দরিদ্রতাও দূর হয়। তবে ফলতঃ দেখা যায় প্রথমোক্তের জ্ঞানটি আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইলেও সেটি খাঁটি এবং তদ্দ্বারা তিনি সামঞ্জস্য করিতে সক্ষম। আর দ্বিতীয়টি বৈজ্ঞানিক একের বাহুল্য প্রচারের ফলে, সমাজে মহা বিপ্লব বাধাইয়া তুলেন। তাঁহার ভুয়ো দর্শনের ফলে শত সহস্র অভাবের সৃষ্টি হয় এবং অভাব বাড়িলেই তাহার পূরণ জন্য ন্যায় বা অন্যায় যেরূপ হয় চেষ্টা করিতেই হয়।

আবার চিন্তা যতই বড় হউক, যদি তাহা অনুষ্ঠানের সহিত অন্বিত না হয়, তবে তথায় প্রকার-বহুলতা আসিতে বাধ্য। প্রকার-বহুলতা আসিলেই সমাজে নানা প্রকার উৎপাত আসিয়া পড়ে। ভারতের অবস্থা এক্ষণে ঠিক এইরূপই হইয়া পড়িয়াছে। কি ধর্ম্মে, কি সমাজে বা কি নৈতিক জীবনে সর্ব্বত্রই এই চিত্র পরিস্ফুট। একমাত্র ভগবানই জানেন, এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অভূতপূর্ব্ব সম্মিলনে কত দিনে ভারতের গভীর-তত্ত্বজ্ঞানের সহিত আবার অনুষ্ঠানের অন্বয় আনয়ন করিবেন।

উদ্ভিদ্ ও কৃষিবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে বীজ ভাল না হইলে অঙ্কুর ও তদ্‌জাত বৃক্ষ সতেজ হয় না। আবার বীজ বলবান হইলেও, শক্তিহীন ক্ষেত্রে তাহা সতেজে অঙ্কুরিত হয় না। সুতরাং একটি বলশালী বৃক্ষ লাভ করিতে হইলে, বীজ ও ক্ষেত্র উভয়ই শক্তিশালী হওয়া দরকার। যাঁহারা পশুপক্ষীর উৎপাদন ও ব্যবসা করেন তাঁহারাও জানেন যে পুংজাতি পশুটি বল ও স্বাস্থ্যবান হওয়া আগে দরকার; আবার স্ত্রীজাতি পশুটিও রুগ্ন হইলে চলে না। অধুনাতন কালের কৃষিবিদ্যা আফিসে ভাল বীজন, ভাল মণ্ড প্রভৃতির সংগ্রহ

তাহার দৃষ্টান্ত। এখন মানুষও বঙ্গ-নারীর সহিত অপেক্ষাকৃত বলবান পাঞ্জাবী বা সিন্ধুদেশীয় পুরুষের সহিত সঙ্গত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। সর্ব্ব স্থলেই বীজনের বীর্য্যবত্তার দিকে প্রধান লক্ষ্য। এই বীর্য্যবত্তাকে ইংরেজী ভাষায় প্রি-পোটেন্‌সি (Pre-potency) বলা হয়। এই প্রি-পোটেন্‌সি তত্ত্বটি প্রাচীন হিন্দুগণ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভিব্যক্তিই হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থে সারদাণ্ডায়ণীর স্বামীর আজ্ঞায় ব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি; কল্মাষপাদের পত্নীর স্বামীর অনুজ্ঞায় বশিষ্ঠের দ্বারা অশ্মক নামক পুত্র লাভ; সত্যবতী ও ভীষ্মের নিয়োগে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পরাশর-পুত্র ব্যাসদেব দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর উৎপত্তি। এরূপ পুত্রোৎপাদন প্রাচীন গ্রন্থে বহুল দৃষ্ট হয়। বংশের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে শ্রেষ্ঠতর বীজ গ্রহণে সন্তানোৎপাদনের প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল। প্রি-পোটেন্‌সীর লোপ হওয়াতে কলিকালে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার একটি ভাল বীজন বা ষাঁড় সংগ্রহ করিতে যত যত্ন ও চেষ্টা করিতে হয়, তৎকালেও একটি উত্তম বীর্য্য-সম্পন্ন পুরুষ লাভ করিতে বহু সাধ্যসাধনা করিতে হইত। ব্রাহ্মণের বীর্য্যই তখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন ব্রাহ্মণ পাওয়াও কঠিন ছিল। পাওয়া গেলেও তাঁহাকে অর্থ দিয়া ক্রয় করা যাইত না। ব্রাহ্মণ সহজে হয় না—অতি কঠিন তপস্যাদির ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইত। বিশ্বামিত্র তাহার দৃষ্টান্ত। ঋষ্যশৃঙ্গের ইতিহাসও এ বিষয়ে দেখা যাইতে পারে।

হিন্দুগণ প্রাতঃকালে কয়টি শ্লোক পাঠান্তে শয্যা ত্যাগ করেন। তাহার মধ্যে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা ও মন্দোদরীর নাম স্মরণ করিতে হয়। এই পাঁচজনকে পঞ্চকন্যা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকটি খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ না হইলেও কোন্ সময় যে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল তাহার সময় নিরূপণ করা এখন অসম্ভব। তবে ইহা নিশ্চিত যে উহা কোন বালকের খেয়ালের ফল নহে। এই পাঁচজনেরই পুত্র হইয়াছিল; অথচ ইহাঁরা কন্যা। কন্ ধাতু দীপ্ত্যর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই পঞ্চকন্যা স্ত্রীধর্ম্মে দীপ্তিশালিনী ছিলেন। অথচ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, অহল্যা ইন্দ্রগমনে পতিতা ও শাপগ্রস্তা; দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, কুন্তির ছয়টি স্বামী, তারা একবার সুগ্রীবের আবার বালীর মহিষী; মন্দোদরী রাবণ বধের পর বিভীষণের মহিষী। কাজেই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে যে ছোট একটি মাপকাটি আনিয়া এই পঞ্চকন্যাকে মাপিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের মুখ ছোট হইয়া যায়। বিধর্ম্মীগণ যখন এই সকল উপাখ্যান বলিয়া হিন্দু-সন্তানদের ঠাট্টা করেন—তখন বিজ্ঞানবিদ্‌গণ "তাই তো" "তাই তো" বলিয়া গালি-গালাজগুলি স্বচ্ছন্দে পকেটস্থ করেন ও স্থানত্যাগে সুখী হয়েন। কেহ কেহ বা তত্ত্বজ্ঞানের ভানে কাল্পনিক অর্থবাদে কৃত-কৃতার্থ বোধ করেন।

প্রোক্ত পঞ্চকন্যার মধ্যে অহল্যা তারা ও মন্দোদরী রামায়ণ যুগের এবং দ্রৌপদী ও কুন্তি মহাভারত যুগের কথা। কাজেই এই পঞ্চকন্যার তত্ত্ব-বোধ করিতে হইলে আমাদের ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের বিষয় আগে ভাবিতে হইবে। এ কালের মাপকাটি লইয়া এ তত্ত্ব মাপিতে গেলে ভুল হইয়া যাইবে এবং এইরূপ ভুল সচরাচর সর্ব্বত্রই হইতেছে ও হইতে থাকিবে। প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি দেখিতে পান যে আদি গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত বেদতত্ত্ব-পরিপূর্ণ। এবম্ভূত অমূল্য গ্রন্থদ্বয়, প্রক্ষেপের অত্যাচারে, আমরা এক্ষণে অতিশয় মলিনভাবে পাইতেছি। যে পদার্থ যত শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট, তাহার বিকারও ঠিক সেই পরিমাণে অধিক বা অল্প মন্দ হইয়া পড়ে। এই দুই মহাগ্রন্থে যে কত কুচিত্র ও কুকথা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে যাহা বেদ-তত্ত্ব বিরোধী তাহা কখনই হিন্দুধর্ম্মের কথা নহে। বেদতত্ত্ব জ্ঞানের অবতরণ প্রথার ফলে ঐরূপ প্রক্ষেপ সম্ভবপর হইয়াছে ও বোধ হয় এখনও সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচারে হইতেছে। ইহা কলি-কালের প্রভাব—শাস্ত্রকার তাহার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। নানা মতের পণ্ডিত নিজ সাম্প্রদায়িক ভাব পোষণের জন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রক্ষেপ করিয়াছেন এবং টীকা টিপ্পনিতে বেদ-তত্ত্বকে ঘোর সঙ্কীর্ণতায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং প্রক্ষিপ্তাংশের পরিমাণ এত বেশি যে কোন্ অংশ আসল ও কোন্ অংশ নকল তাহার উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুগ্ধে এত জল পড়িয়াছে যে দুধের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। তত্ত্বজ্ঞ সাধকরূপ হংস বিনা, জল ত্যাগে ক্ষীরোদ্ধার অপরের পক্ষে অসম্ভব। শাস্ত্রজ্ঞান কর্ম্মের সহিত অন্বিত না হওয়ায় যত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রেতাযুগের প্রথমাবস্থায় ক্ষত্রিয় জাতি অত্যাচারী হওয়ায় পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল একবিংশতিবার নির্ম্মূল করেন। সেই নির্ম্মূলিত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃস্থাপন উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয় নারী ব্রাহ্মণের দ্বারা সন্তানোৎপাদনে উপদিষ্টা হয়েন। ফলে ক্ষত্রিয় জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ক্ষত্রিয় বিনা ব্রাহ্মণ রক্ষিত হয় না। ক্ষাত্র-শক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। এখনও মনুষ্যসমাজ যখন ধ্বংস হয় তখন অন্যের ক্ষেত্রে যে পুত্রোৎপাদন প্রথা প্রচলিত নাই তাহা নহে। বিগত জর্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে ইয়োরোপে যে সামাজিক রীতি আইন করিয়া প্রচলিত করিতে হয় তাহা ইহার দৃষ্টান্ত। তবে সে সন্তানোৎপাদন ও পরশুরামের সময়কার সন্তানোৎপাদনে একটু তফাৎ আছে। সেখানে প্রি-পোটেন্‌সী দেখে ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখানে যথেচ্ছাচার। ছেলে হইলেই হইল।

পর-দারাপহারী রাবণ ও তদনুচর রাক্ষসগণকে দণ্ড দিবার জন্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ যখন অত্যন্ত ব্যাকুল—তখন দেবকার্য্য সাধন জন্য রামের অবতার। রামায়ণে এই রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস রৌদ্র, হাস্য ভয়ানক, করুণ, অদ্ভুত ও শান্ত এই নববিধ রসোদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ থাকিলেও, এই গ্রন্থ প্রধানতঃ শৃঙ্গার ও করুণ রসাশ্রিত। শৃঙ্গারই আদি রস এবং ইহা সংযোগ ও বিপ্রলম্ভ এই দুই ভাগে বিভক্ত। সমগ্র রামায়ণে এই সংযোগ ও বিপ্রলম্ভের প্রাধান্য চিত্রিত। ক্রৌঞ্চ মিথুনের মিলন ও বিচ্ছেদই রামায়ণ গ্রন্থের মূল সূত্র। বেদোক্ত অমূর্ত্ত পতিপত্নী রূপ প্রজাপতির দ্বিভাগের মূর্ত্ত রূপই এই "মা নিষাদ" শ্লোকটি ইহা বলিলেই হয়। অগ্নিসোমাত্মক যাবতীয় সৃষ্টিই ভোক্তা ও ভোক্তব্যের সম্বন্ধে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রকাশতা ম্যাটার ও

এনার্জি (matter and energy) লইয়াই জগৎ। অহল্যার উপাখ্যান সম্বন্ধে প্রচলিত রামায়ণে কি পাওয়া যাইতেছে তাহা এখন দেখা যাক্। গৌতম আশ্রম সম্বন্ধে পৃষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিতেছেন :—হে রামচন্দ্র! যে মহাত্মার কোপ প্রযুক্ত আশ্রমের এই অবস্থা ঘটিয়াছে আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই স্থানে দেব-বাঞ্ছিত মহাত্মা গৌতমের আশ্রম ছিল, তখন ইহার সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি এখানে অনেক দিন অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন সুযোগ পাইয়া সুর-রাজ ইন্দ্র গৌতম-বেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যাকে এই কথা বলিলেন—"হে সুন্দরি! রতি-প্রার্থী জন ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না; অতএব তুমি আমার মনঃসাধ পূর্ণ কর।" দুর্বুদ্ধি অহল্যা স্বামী-বেশধারী শক্রকে জানিতে পারিয়াও তাহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রহৃষ্টমনে শচীপতিকে কহিলেন "আমি কৃতার্থ হইয়াছি। অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও। হে দেবরাজ! তুমি আপনাকে ও আমাকে গুরুর শাপ হইতে রক্ষা কর।" তখন সহাস্য বদনে সুরেন্দ্র কহিলেন "হে নিতম্বিনি! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আমি দেব-লোকে প্রস্থান করিলাম।" * * * সদাচারপরায়ণ মুনি, অসদাচারী ইন্দ্রকে নিজবেশ ধারণ করিয়া আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছেন দেখিয়া সক্রোধে কহিলেন—

"রে দুর্ম্মতে! তুই যখন আমার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অকর্ত্তব্য কার্য্য আমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছিস্ তখন আমার শাপে তোর বৃষণ স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। * * * তদনন্তর অহল্যাকে কহিলেন—রে দুরাচারিণি! তোকে এই আশ্রমে অনেক কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে হইবে। রে দুঃশীলে! অন্য কথা কি কহিব তোকে অন্যের অদৃশ্যভাবে অনাহারে অবস্থিতি ও ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। যখন এই নিবিড় বনে দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের শুভাগমন ঘটিবে, তাঁহার পাদস্পর্শে তুই মুক্ত হইবি।" মহাতপা মহর্ষি গৌতম দুষ্টাচারিণী অহল্যাকে এই কথা বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধ সংসেবিত রমণীয় হিমালয় শিখরে গমন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।" (বসুমতী অনূদিত রামায়ণ আদিকাণ্ড)। রামচন্দ্র তার পর বিশ্বামিত্রের সহিত অহল্যার উদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলেন "তপস্যার তেজে গৌতমীর প্রভা অধিকতর প্রতিফলিত হইতেছে—মানুষের কথা দূরে থাকুক দেবদানবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় বিধাতা প্রযত্নাতিশয়ে এই মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দীপ্তি ধূমপূর্ণ বহ্নিশিখা সদৃশ। * * গৌতমী শাপান্তে যেই রামচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন—অমনি তিনি ত্রিলোকেরও দর্শনীয় হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ হৃষ্টমনে অহল্যার চরণ বন্দনা করিলেন। গৌতমীও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের সমুচিত সৎকার করিলেন। তখন দেবী অহল্যা বিধিকৃত কর্ম্মানুসারে রাম লক্ষ্মণকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। * * * তখন দেবগণ তপোবল-সম্পন্না পতিপরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাতপা গৌতমও গৌতমীর সহিত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিহিত বিধানে রামচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা করতঃ পুনর্ব্বার তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।" (বসু-রামা)। আবার উত্তর কাণ্ডে উক্ত রামায়ণেই দেখা যায় যে যখন ইন্দ্রজিৎ প্রজাপতির অনুরোধে ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দেন, তখন ইন্দ্রের অনুশোচনার উত্তরে প্রজাপতি বলিলেন যে তিনি প্রজা সৃষ্টির পর অনবদ্যা এক স্ত্রী সৃজন করেন। সে স্ত্রীতে কোন নিন্দার বস্তু ছিল না। হল্য শব্দে নিন্দনীয় রূপ বুঝায়—সেই সৃষ্ট রমণী মূর্ত্তিতে কোন নিন্দা বা বিরূপতা ছিল না বলিয়া তাহার নাম অহল্যা রাখেন। ইন্দ্র সেই পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া স্ব-পত্নী ভাবে চিন্তা করেন। প্রজাপতি সেই অহল্যাকে প্রথমে গৌতমের নিকট গচ্ছিত রাখেন। গৌতম বহু বৎসরান্তে সেই নারীকে আবার প্রজাপতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। তাহার পর গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধি দেখিয়া সেই প্রজাপতিই আবার অহল্যাকে গৌতমের পত্নী করিয়া দেন। কিন্তু কামুক ইন্দ্র গৌতম আশ্রম গমন করেন। তথায় তিনি অহল্যাকে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতে দেখেন। তবুও তাঁহার সতীধর্ম্ম হরণ করেন। গৌতম আসিয়া বলিলেন "লুপ্তবুদ্ধে! তুমি যে এই পাপের সৃষ্টি করিলে, তোমার দোষে নিঃসন্দেহ অদ্যাবধি নরলোকে এই পাপ প্রচলিত হইবে ইত্যাদি।" গৌতম অহল্যাকেও শাপ দিয়া বলিতেছেন—"দুর্বিনীতে! তোমার রূপ আশ্রমের নিকটেই নষ্ট হউক; তুমি রূপ-যৌবন সম্পন্না—কিন্তু তোমার মন অস্থির। সুতরাং জগতে তুমিই আর রূপবতী থাকিবে না। সকল সৃষ্ট পদার্থই তোমার রূপের অংশভাগী হইবে।" * * * অহল্যা উত্তর দিলেন "ব্রহ্মণ! দেবরাজ আপনার আকৃতি ধারণ করিয়া আমার সতীধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং আমি অজ্ঞানকৃত পাপ করিয়াছি। ইচ্ছা বশতঃ নহে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।" তদুত্তরে গৌতম রামাবতারের কথা বলিয়া রামের দর্শনে অহল্যার উদ্ধার, এ কথা বলিলেন। আরও বলিলেন সেই উদ্ধারের পর অহল্যা তাঁহার সহবাস করিতে পারিবে। ব্রহ্মবাদী পত্নী অহল্যাও সুমহৎ তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। ইহার পর যে সফল কথা আছে তাহাতে বৈষ্ণব যজ্ঞে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ বৈষ্ণব পণ্ডিতের সাম্প্রদায়িকতার প্রচার মাত্র। রামায়ণের অন্য পুস্তকে অহল্যার কথা সংক্ষেপে বালকাণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে :—গৌতম অহল্যার সহিত সেই বনে বহু বৎসর বাস করেন ও তপস্যা করেন। পঞ্চশরে অভিভূত দেবরাজ গৌতম বেশে একদা সুযোগ পাইয়া অহল্যাকে বলিলেন, "যদিও ঋতুকাল অপেক্ষা করা আমাদের উচিত, কিন্তু আমি অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।" তার পর যাহা ঘটিল তাহা প্রায় বসুমতীর অনূদিত ভাবই ব্যক্ত করে—কেবল রামের পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধারের কথা নাই। রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র সেই বনে প্রবেশ করিয়াই মুর্ত্ত অহল্যাকে দেখিতে পান ও তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। এই রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যার কথা নাই। তথায় তৎপরিবর্ত্তে ভৃগুকন্যা অজার কথা আছে। দণ্ডরাজ ও অজার আখ্যান প্রায় অহল্যা ও ইন্দ্র আখ্যানের ভাবে নিহিত। অগস্ত্য দণ্ডকারণ্য নামের উৎপত্তি বলিতে গিয়া এই অজার উপাখ্যান রামকে শুনান।

রামায়ণের মূল নারদ ও বাল্মীকি সংবাদে অহল্যার কথা একেবারে নাই।

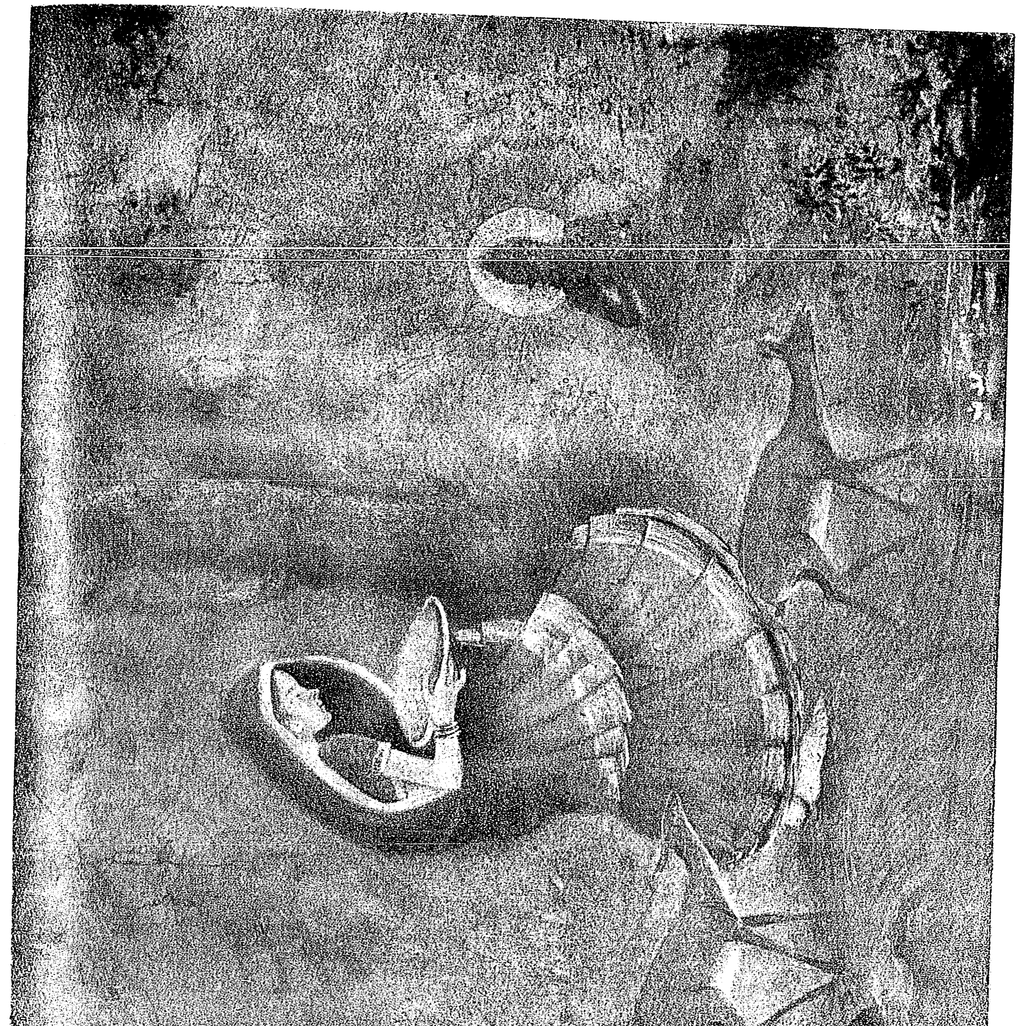

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রলাল ভৌমিক

গোপন চারিণী

Bhupendra Halftone & Printing Works

বাল্মীকির পরোক্ষ জ্ঞান অধ্যায়েও অহল্যার কথা নাই। তবে বিশ্বামিত্রের সহিত রামের বিচিত্র কথার উল্লেখ আছে। এই বিচিত্র কথার মধ্যেই অন্যতম অহল্যার উপাখ্যান। কাজেই এই অহল্যার উপাখ্যান আদিম রামায়ণে ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ এই "বিচিত্র কথা বাদ" ও উত্তরকাণ্ড প্রক্ষেপের যথেষ্ট অবসর দিয়াছে। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই এই দুইস্থলে অবাধে জুড়িয়া দিতে পারিয়াছেন। রামায়ণের প্রত্যেক অনুবাদক নানাপ্রকার রামায়ণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে আদিম রামায়ণ যে কি ছিল তাহা বলা যায় না। স্বর্গগত ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রচারে কৃতকর্ম্মা ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তল্লিখিত ভূমিকায় এক স্থানে বলিয়াছেন—"এতদ্দেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভাষাকারে ছন্দোবন্দে বিরচিত এবং তাহাই দেশবাসী সাধারণ লোকের রামায়ণ-পাঠপিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। সত্য বটে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহুল প্রচারে আমাদের সমাজ অনেক পরিমাণে কৃতজ্ঞ ও ঋণী; কিন্তু তাহা বাল্মীকির মূল দর্শনে অনুবাদিত না হওয়ায় অনেক স্থানে সর্ব্বনাশ দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে কৃত্তিবাসের শক্তি বা কবিত্বের পক্ষপাতী নহি, এ কথা নহে; কিন্তু "সাত নকলে আসল খাস্তে" এই যে এক কথা আছে—ইহার অবস্থাও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের নাম করিয়া অনেকস্থলে অধ্যাত্ম রামায়ণের মত এবং স্থল বিশেষে তাহাকেও পরাস্ত করিয়া নূতন কথা ও নূতন কাণ্ড সংযোজিত করা হইয়াছে। * * * বোধ করি কথক ব্যবসায়ী মহাপ্রভুরা উৎকট কল্পনাকে আরাধনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জনানুরোধে মূলকে নির্ম্মূল করতঃ ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন। * * * যেরূপ যোজনান্তে ভাষার ভিন্নতা, সেইরূপ "একোঽহং বহুস্যাম্" এই শ্রুতির সম্মাননার জন্য নানা-বেশে নানা বাল্মীকির আবির্ভাব।" আমরা এই প্রবন্ধে যে অংশগুলি উদ্ধার করিয়াছি পাঠকগণ তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিবেন। পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধারের কথা আদিকাণ্ডের প্রথমাংশে আছে; অর্থাৎ শাপের কথায় আছে। কিন্তু রামচন্দ্র সেই বনে গমন করিলে যে তাঁহার পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধার হইল সে কথা নাই। পরন্তু রাম-লক্ষ্মণ অহল্যার চরণ বন্দনা করিলেন, এ কথা আছে। আবার শাপাংশে অহল্যা অদৃশ্য হইয়া থাকিবে এই আছে। পাষাণ হইয়া থাকিলে অদৃশ্য কেমন করে হয় তাহা বুদ্ধিতে আসে না। ঋষি-পত্নীকে রাম কখনই পদাঘাত করিতে পারেন না। রামের এরূপ চরিত্র রামায়ণের কুত্রাপি নাই। রামায়ণকার রামকে কোন স্থানে অলৌকিক দৈবশক্তি দেন নাই। কাজেই পাদস্পর্শে অহল্যার উদ্ধার রামভক্ত ব্রাহ্মণেতর কোন পণ্ডিত মহাশয়ের কীর্ত্তি। আবার উত্তর কাণ্ডের অংশে পাদস্পর্শের কথাই নাই। বৈষ্ণব যজ্ঞে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি আছে। অন্য রামায়ণে পাদস্পর্শের কথা একেবারেই নাই। অহল্যার রূপ তৎকর্তৃক নষ্ট হইল এই কথাই আছে। রূপ নষ্ট হইলেই পাষাণ হয় না। এবং সূক্ষ্ম শরীরে পাদস্পর্শ সম্ভবে না।

অহল্যা সুন্দরী ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। গৌতমের বেশে ঋতুকালের অপেক্ষা না করিয়া অহল্যা গমন করেন। এক স্থলে বলা হইয়াছে যে অহল্যা গৌতমবেশী ইন্দ্র ইহা জানিয়াও রতিদান করেন এবং শুধু তাহা নয় তিনিই আগে বলেন তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন এবং ইন্দ্রকে বলিলেন "চলে যাও, চলে যাও, গৌতম এসে শাপ দিবে।" অন্যত্র আছে, যে ইন্দ্রই দোষী; কেন না, অহল্যার সতীধর্ম্ম তিনি হরণ করেন। এখানে অহল্যার জ্ঞানকৃত পাপের কথা নাই। অহল্যা তাই বলিয়া গৌতমের নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন। এইরূপ সমস্ত বিবদমান আখ্যানের ভিতর ঋতুকাল ভিন্ন যে স্ত্রী সহবাস করা ঘোর পাপ, এই কথাটি সর্ব্বত্র একভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এইটি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একটি প্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব। তার পর ইন্দ্র অহল্যাকে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিশীলা দর্শন করেন। অহল্যা গৌতমের ব্রহ্মবাদিনী পত্নী; অহল্যার প্রতি দেব-দানবগণ দৃষ্টিপাত করিতে পারে না—তাঁর এত তেজ; তাঁহার দীপ্তি ধূমপূর্ণ বহ্নিশিখা; তিনি পতি-পরায়ণা, এবং দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। এবম্ভূতা অহল্যার ইন্দ্রজার বৃত্তান্তটি একেবারে খাপছাড়া হইয়া পড়ে। কিন্তু কথক ঠাকুরদের কারিগরি বাদ দিয়া, মাপকাটিটি ত্রেতার মতে আরোপ করিলে কি তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহাই একবার দেখা যাক।

ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রকে ব্রহ্মের স্থানে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রই সর্ব্বপদার্থের মূল এইভাবে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁহার স্তবনা করিয়াছেন। বেদের সহিত মিলাইয়া পড়িলেই রামায়ণের ইতিহাস ও পুরাণ অংশের উদ্ভব-স্থল বেশ সুন্দর ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার রামায়ণ ও মহাভারত মিলাইয়া পড়িলে মহাভারত যে সমূহ পরিমাণে রামায়ণের নিকট ঋণী তাহা বেশ দেখা যায়। এমন কি স্থানে স্থানে রামায়ণের অবিকল শ্লোকগুলি মহাভারতে উদ্ধৃত। সে বিষয় এখানে আলোচ্য নহে। ইহা এত বড় জিনিষ যে বিজাতীয় সত্যপ্রিয় পণ্ডিতগণও তাহা অনুভব করিয়াছেন। (ক) কিন্তু আমরা শাস্ত্রের নূতন টীকা লিখিতেই ব্যস্ত! নূতন কিছু নাই, সব ফুরাইয়া গিয়াছে। পুরাণ সন্দেশে পচা ক্ষীর মিশাতে গেলেই সেটা অখাদ্য হইয়া উঠে।

(ক) বিদেশী লেখক বলিয়াছেন:—That Brahmins unknown to fame have re-modelled some of the Hindoo Scriptures and especially *Puranas* cannot reasonably be contested after dispassionately weighing the strong internal evidence, which all of them afford, of the intermixture of un-authorised and comparatively modern ingredients. But the same internal evidence furnishes proof equally decisive of the anterior existence of ancient materials. * * * The publications available now are worse than useless except in the hands of those who can distinguish the pure metal from the alloy.

A sound and comprehensive survey of the Hindoo system is wanting—A comparative analysis of the religion can only elucidate an important chapter in the history of the human race. * (Wilson) অর্থাৎ অ-প্রতিষ্ঠাবান কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষতঃ পুরাণগুলির নূতন রূপে গঠন করিয়াছেন। গ্রন্থগুলির অভ্যন্তরীণ প্রমাণ

ঋগ্বেদ-সংহিতা বলিতেছেন ঃ—

সোমা পূষণা জননারয়ীণাং জননাদিকে জননা পৃথিব্যাঃ
জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপো দেবী অকৃন্বমৃতস্য নাভিম্॥
ইমৌ দেবৌ জায়মানৌ জুষন্তেমৌ তমাংসি গূহতামজুষ্ঠা
আভ্যামিন্দ্রঃ পক্ক মালাশ্বস্তঃ সোমাপূষভ্যাং জনদুগ্রিয়াসু॥ ২।৪০

প্রাণের এক অংশ অগ্নি, তেজ, সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি রূপে ও অপরাংশ সোম জল, পৃথিবী, অন্ন প্রভৃতি রূপে কার্য্য করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে। এই এনার্জি ও ম্যাটারের মিথুনত্ব সম্পাদিত না হইলে কোন সৃষ্টি হয় না। এই তেজ বা অগ্নিই ইন্দ্র। আর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ এই অগ্নির মিথুন বা ভোক্তব্য জিনিষ। রসায়ন কার্য্য বিনা সৃষ্টি নাই ; কাজেই ভোক্তা ও ভোগ্যকে পৃথক করিলে সৃষ্টি হয় না। ইন্দ্র তাই সর্ব্বদা পারদারিক। এই ভোক্তা ও ভোগ্য তত্ত্ব লইয়াই বেদে প্রবেশহীন জনগণের ধর্ম্মজ্ঞানের বিষম ব্যাঘাত ঘটে। কত প্রকার কুৎসিত ধর্ম্মবাদ যে এই বেদে জ্ঞান নব্য ভারতে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (খ)

স ঘানো-যোগ আভুবৎ স রায়ে স পুরংধ্যাম্।
গমদ্বাজে-ভিরা সনঃ। ১।২।৩

পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেব আমাদের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ হউন। সেই তেজোরূপ চিত্রভানো ইন্দ্র আমাদের ধর্ম্মার্থ হউন। সেই ইন্দ্র আমাদের স্ত্রীতে বর্ত্তুন। সেই ইন্দ্র আমাদের ধন পুত্রাদিকে প্রাপ্ত করুন। এই ইন্দ্র আবার কেমন না, "অক্ষিতোতিঃ" (ক্ষয়হীন রক্ষণশীল), সূর্য্যরূপে স্বর্গে—অহিংসক অগ্নিরূপে পৃথিবীতে এবং সর্ব্বত্র বায়ুরূপে অবস্থিত। ইনি পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত। (যুঞ্জন্তি ব্রধ্নং অরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ ১।২।১) আবার ঋষি অগ্নিরূপী ইন্দ্রকে বলিতেছেন "তান্ যজত্রান্ ঋতাবৃধঃ অগ্নে পত্নীবতঃ কৃধি।" হে অগ্নে! তুমি সকল দেবগণকে স্ব স্ব পত্নীর সহিত একত্রিত কর। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—এই প্রাণই ইন্দ্রিয়াদির সহিত ঋষিপদবাচ্য। প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ। বাক্য ও প্রাণের সম্মিলন বা মিথুনত্ব প্রণব বা বেদ দ্বারা উৎপন্ন হয়। কর্ণদ্বয়ই গৌতম ও ভরদ্বাজ ঋষি। কর্ণই বাক্যের একমাত্র মূর্ত্ত ইন্দ্রিয়। গৌতম দক্ষিণ কর্ণ। মূর্ত্তরূপে অমূর্ত্ত এই নিগূঢ়-বেদতত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য বেদতত্ত্বজ্ঞ বাল্মীকি রামায়ণ গ্রন্থে গ্রথিত করিয়া থাকিবেন। কেন না, ত্রেতায় বা দ্বাপরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজ জাতি ভিন্ন অন্যের বেদে প্রবেশ অধিকার ছিল না। অথচ বিশ্বপ্রেমে স্বার্থহারা ঋষিদের স্ত্রী-শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। "স্ত্রী-শূদ্রয়োস্তু সত্যামপি জ্ঞানেপেক্ষায়াং উপনয়নাভাবে নাধ্যয়নরাহিত্যাৎ বেদেঽধিকারঃ প্রতিষিদ্ধঃ। ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানং তু পুরাণাদি মুখেন উৎপদ্যতে। (সায়ণ) আবার ব্রহ্মজ্ঞানটিও সকলের নিত্য বিচারমধ্যে ছিল না। পরমহংসাবস্থায় উপনীত দ্বিজগণেরই এই ব্রহ্মজ্ঞান বিচার নিত্য ধর্ম্ম ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য। ব্রহ্ম ভোক্তা সৃষ্টি ভোগ্য। কাজেই বেদে মুগ্ধরূপ অদ্ভুত জীবগুলির কথা থাকিতে পারে না।

রামায়ণের পাঠভেদে আমরা পাইয়াছি যে প্রজাপতি অনবদ্যা অহল্যা সৃজন করিয়া কন্যাবস্থায় বহুকাল তাহাকে গৌতমের নিকট গচ্ছিত রাখেন। গৌতমের ধৈর্য্য ও তপস্যার পরীক্ষা শেষ হইলে অহল্যার সহিত গৌতমের বিবাহ দেন। ত্রেতাযুগে বা দ্বাপরে যে সময় বেদ প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ছিল, তখন ব্রাহ্মণ হইতে হইলেই অগ্নিহোত্রী হইতে হইত। পত্নী বিনা অগ্নিহোত্রী হওয়া যায় না। ইন্দ্র বা ব্রহ্মই পরম ঐশ্বর্য্যবান। গৌতম ও অহল্যা ইন্দ্ররূপী অগ্নির সেবা করিতেন। অগ্নিহোত্রীর ঋতুকাল ব্যতীত দারোপগমন নিষিদ্ধ। বোধ হয় গৌতম সেই বিধি লঙ্ঘন করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়েন। এই প্রায়শ্চিত্ত জন্য পতি ও পত্নীতে পৃথক হইতে বাধ্য হয়েন। তাই আমরা পাই যে গৌতম ও অহল্যা উভয়েই তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই উপাখ্যান হইতে আমরা সমাজতত্ত্বের কি কি পাই তাহা দেখা যাইতেছে।

১। ধৈর্য্যশীল বা ইন্দ্রিয়জরী গৌতমের নিকট অনবদ্যা কামিনী স্বধর্ম্মচ্যুতির ভয় ছিল না।

২। বিবাহ-বন্ধন না হওয়া পর্য্যন্ত গৌতম অহল্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই।

৩। বিবাহের পর পতিপত্নীতে অগ্নির সেবা করিয়া অগ্নি দীপ্তিমান হয়েন।

দ্বারাই ইহা অনিবার্য্য ভাবে বুঝা যায়। তাহাতে কত যে প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। তেমনি অভ্যন্তরীণ প্রমাণে ইহাও দেখা যায় যে শাস্ত্রের প্রাচীন তত্ত্বগুলিও ছিল। তবে আমরা প্রচলিত যে সকল পাঠ পাই তাহা একবারে পরিত্যজ্য। যাঁহারা মূল আদিম তত্ত্ব হইতে প্রক্ষেপ অংশকে বাছিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট ভিন্ন প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন মূল্য নাই। সমস্ত ধর্ম্মের আমূল তত্ত্বানুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে মনুষ্যজাতির একটা নূতন অধ্যায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) It has heen observed with reference to heat (অগ্নি, তেজ,) thus viewed, that it would be as correct to say, that heat is absorbed, or cold produced by motion, as that heat is produced by it. * This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves motion, i. e., as correlative expansions and contractions, each being evidenced by relation and being inconceivable as abstraction (Corr-datm of Physical forces)

অর্থাৎ উত্তাপ চলিয়া গেলে শৈত্য আইসে, সেইরূপ শৈত্যের অপসরণে উত্তাপ দেখা যায়। দুইই গতিশীলতার তারতম্যে উৎপন্ন হয়। কাজেই সব গণ্ডগোল চুকে যায় যদি আমরা বুঝিতে পারি যে অগ্নি ও সোম—তেজ ও শৈত্য এই উভয়ই গতিশীলতা মাত্র। তেজ ও শৈত্য অচ্ছেদ্য।

অগ্নী ষোমৌ মিথঃ কার্য্য কারণে চ ব্যবস্থিতে। পর্য্যায়েণ সমং চেতৌ প্রজীয়তে পরস্পরং॥ (যোগবাশিষ্ঠ) বায়ুরূপ আত্মশক্তি হইতে সোম, সোম হইতে তেজ ও তেজ হইতে সোম এইরূপ পরস্পরের উৎপাদন কষ্টে সম্পাদিত হয়।

৪। অগ্নিরূপী ইন্দ্র অহল্যার অভ্যন্তরে শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধূমপূর্ণ অগ্নিশিখাসদৃশ করিয়া তুলেন।

৫। তপস্যার ক্রমোন্নতির ব্যাঘাতক অসময়ে পত্নীগমনে দম্পতি-যুগ্মের উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটে।

৬। পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত হইবার জন্য উভয়ে পৃথক্ থাকিয়া তপস্যায় নিরত হয়েন। এবং সুপ্ত ধৈর্য্য ফিরিলে আবার একত্রিত হয়েন ও অগ্নির সেবা করিয়াছিলেন।

৭। যথাসময়ে দম্পতির বংশরক্ষা হইয়াছিল।

৮। রমণীজাতি সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত। এবং পতিব্রতা নারী পতির আদেশে অসময়েও নিজ শরীর দান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। পতির ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা—পত্নীর কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই।

৯। চঞ্চল-চিত্তা ব্রাহ্মণ-পত্নীর যদি পদ-স্খলন হইবার সম্ভাবনা ঘটে তবে যেন তাহা বিশুদ্ধ-বীর্য্য-সম্পন্ন উত্তম পুরুষের সঙ্গেই হয়।

১০। ব্রাহ্মণের উপর উত্তম-পুরুষ অন্য কেহ নাই। কাজেই দেবতাই যেন লক্ষ্য হয়। গৌণভাবে পরপুরুষ সঙ্গবদ্ধও হইল কেন না দেবতার শরীর মোটা নহে।

এতগুলি গুরুতর সমাজতত্ত্বের পরিবর্ত্তে প্রচলিত অহল্যার উপাখ্যানে আমরা পাইয়াছি কি না, অহল্যা কুলটা এবং দেবেন্দ্র পারদারিক। কাজেই পরদার গ্রহণে ত্রেতায় অনুমোদন ছিল। কি মানসিক অধঃপতন!! অহল্যার উপাখ্যানের যে প্রধানতম শাসনবিধি ঋতুকাল ভিন্ন অগ্নিহোত্র সাধকের পত্নীগমন নিষিদ্ধ তাহা একবারে ডুবিয়া গেল। যাবেই—কেন না, সেটা এখন হিন্দুর স্বপ্নের মধ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয়-জিতের নিকট অনবদ্যা পরনারীও যে নির্ভয়া, তাহা ডুবাইয়া না দিলে পারদারিকদের সুবিধা হয় না। বিবাহ-বন্ধন যে বিশুদ্ধ সমাজের মূল তাহা উড়াইয়া না দিলে যে উচ্ছৃঙ্খলতার জয় হয় না। পত্নী গ্রহণ বিনা যে হিন্দুর কোন ধর্ম্মাচরণ ঘটে না এ তত্ত্ব মুছিয়া না দিলে যে মুষ্ক সন্ন্যাসীদলের প্রভাব বিস্তারে সুবিধা হয় না। নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন যে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম সূত্র তাহা না ভুলিলে যে বিভু, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি হওয়া যায় না। পত্নী যে চিরদিন পতির অঙ্কশায়িনী ও অপৃথক সত্তা এ কথা প্রচার থাকিলে যে অবশীকৃতাস্ত্রিয়ের যথেচ্ছাচার প্রচলনের সুবিধা হয় না। প্রবন্ধের শিরোদেশোক্ত শ্রুতিবাক্যের লক্ষ্য যে বংশবিস্তারে বলের উন্নতি—তাহা, পতিপত্নী বিনা পুরুষাংশ যে নীরস ও শুষ্ক এই বেদবাক্য এবং অগ্নিহোত্র ছাড়া যে ব্রাহ্মণত্বলাভ হয় না প্রধানতঃ এই কয়টি কথা মনে রাখিয়া আদিরস যে শৃঙ্গার তাহার পরিশুদ্ধ ব্যবহার করতঃ পাঠক মহোদয়গণ একটি উপাখ্যান রচনা করিয়া এই অধমকে উপহার দিলে কৃতকৃতার্থ হইবে। আমি করযোড়ে নিবেদন করি তাঁহারা চেষ্টা করুন। তার পরে অহল্যার ইন্দ্রজারের কথার গভীরতত্ত্ব আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে আশা করা যাইতে পারে। বাল্মীকির কথা ছাড়িয়া দিউন। যদিই বা অহল্যা উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হয় তবুও ইহাতে সত্য কিছু আছে কি না তাহা দেখিবার বোধ হয় ইহাই সমীচীন পথ।

আদিকবি বা অন্য যে কেহ ইন্দ্রকে অহল্যাজার না করিলেও ত পারিতেন। কিন্তু তাহা তখন মাথায় ঢুকে নাই। কেন না ইন্দ্রই পরম-তত্ত্ব। ব্রাহ্মণপত্নীর ইতর জার হইতে পারে এ কথা তৎকালিক সমাজের ধারণার বাহিরে ছিল। ভীষ্ম সত্যবতীকে ঠিক এই ভাবের আদেশ দিয়াই ব্রাহ্মণের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। ভূদেব ব্রাহ্মণের পত্নীতে শৃঙ্গার রসের কথা যুড়িতে হইলে—সুরপুরেশ্বর ইন্দ্রকেই আনিতে হয়। ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যই যজ্ঞ। অবশ্য এটা এখন কেহ বিশ্বাস করেন না যে ইন্দ্রটি শরীর ধরিয়া অহল্যাগমন করিতে পৃথিবীতে নামিয়া আসেন নাই। ইন্দ্রের সমাজময় তনু অনুপ্রবিষ্ট করিয়া অধিকতর প্রোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। পাঠকগণের মধ্যে কেহ অগ্নিহোত্রী থাকেন—বা কোন নিষ্ঠাবান অগ্নিহোত্রীর সাহচর্য্যে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় জানেন—ইন্দ্র এখনও জার ভাবে অগ্নিহোত্রীদম্পতিকে উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রীর পত্নী উপনীতা হয়েন—তিনি নারায়ণশিলা স্পর্শ করিতে অধিকারিণী।

কন্যা মানেই অল্প সন্তানা ও অল্প পুংসঙ্গা। উত্তম অগ্নিহোত্রী একটি মাত্র পুত্র হইলেই পত্নী-সহবাস পরিত্যাগ করেন। অহল্যার সাতগণ্ডা সন্তান হয় নাই। পরপুরুষ গমন তাঁহাতে সম্ভাব ছিল না। মলিন বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্ববোধ চেষ্টা করিলে মলিন-জ্ঞানই উদ্ভূত হয়। পরদারাপহারীর দণ্ড ও বিনাশ জন্যই রামাবতার—পরন্তু কুলটা অহল্যার উদ্ধার জন্য নহে। কাজেই কৃত্তিবাস ও কথকগণ-কথিত অহল্যা উপাখ্যান সমস্ত রামায়ণ-তত্ত্বের বিরোধী—সুতরাং একান্ত অগ্রাহ্য। কুলটা অহল্যা কখনই রামের চক্ষে প্রদীপ্তাতেজা বলিয়া প্রতীয়মানা হইতে পারিতেন না। রামচন্দ্রও সেরূপ নারীর পাদবন্দনা করিতেন না এবং দেবগণও প্রফুল্লিত হইতেন না। বেদার্থবিদ্গণের নিকট অহল্যা নারীরত্ন ও কন্যা। আর ত্রেতার সমাজে আদিকবির এই সামাজিক শাসন অতি আদরেই গৃহীত হইয়া থাকে।

অহল্যার মূল তত্ত্বই তারা ও মন্দোদরীতে আরোপিত। তারা সুগ্রীবের পত্নী। কিন্তু সুগ্রীবের ঔরসে তারার গর্ভে কোন সন্তান হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। কিন্তু সেই তারার গর্ভে বালীর ঔরসে একটিমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল। বানরের মধ্যেও কবি বেদ-তত্ত্বের প্রচার করিতে প্রচেষ্ট। শৃঙ্গার রসের ছড়াছড়ি থাকিলেও তারার গর্ভে পাল পাল বানর হয় নাই। সুগ্রীব বানরের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক। তারা পরে সুগ্রীবের মহিষী হয়েন কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্তান হয় নাই। এসব গূঢ় বেদ-তত্ত্ব প্রচারে পাশবিক বৃত্তির মাপকাটি চলে না। ইহা মিলন ও বিপ্রলম্ভের কথা মাত্র। মন্দোদরীর বিষয়ও তারার মত। ইন্দ্রজিৎই একটি পুত্র, অথচ রাবণ কাম-পরবশ। বিভীষণের ঔরসে মন্দোদরীর সন্তান হয় নাই। তারা ও মন্দোদরী তাই কন্যা। সুগ্রীব সূর্য্যতনয় সূর্য্য সদৃশ ; বালী ইন্দ্রতনয় ইন্দ্র-সদৃশ। তারা বরুণ-পুত্র সুষেণের কন্যা। রাবণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-পুত্র ও প্রজাপতি পুলীস্তের পৌত্র। মন্দোদরী ময়দেবতার কন্যা। সব দেবতা সদৃশ। দেবতা প্রদ্যোতিকা শক্তিসম্পন্ন। তাহাদের দ্বারা কুৎসিত সমাজচিত্র অঙ্কিত হয় না। রাবণ রাক্ষসাধম হইলেও তাহার দেবত্ব ছিল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবাসুর বর্ত্তমান ও উভয়ে বিরোধ চলিতেছে। আবার দেবতাগণ নিজ পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে অক্ষম ইহা রামায়ণেই উমা-বাক্যে লিপিবদ্ধ আছে। প্রিপোটেন্সী তত্ত্বের কি সামঞ্জস্য পূর্ণ ইতিবৃত্ত—দেখিলেও মুগ্ধ হইতে হয়।

দ্রৌপদী অগ্নিসম্ভূতা। ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ইহাঁর পঞ্চ স্বামী। পঞ্চ দেবতার অমূর্ত্ত রূপই মূর্ত্তরূপে পঞ্চ পাণ্ডব। আবার পঞ্চ তত্ত্বই—একতত্ত্ব হিরণ্য গর্ভ প্রজাপতি। সেই প্রজাপতির প্রথম শক্তিই অর্ক বা অগ্নি। কাজেই ধার করে আনা ছোট মাপকাটিটি ফেলিয়া দিলেই মহাভারতের মহান সমাজ-তত্ত্ব বুঝা যাইবে। পাঁচ স্বামীর পাঁচটি মাত্র পুত্র। পাঁচ পাঁচে পঁচিশটি নয়। দ্রৌপদী অল্প সন্তানা অল্প পুংসঙ্গাও বটেন। তিনি কন্যা। কুন্তি মহাধার্ম্মিক ভোজেয় কন্যা। বংশ রক্ষার জন্য দেবতাদের দ্বারা পুত্রোৎপাদন করেন। নিগূঢ় বেদ-তত্ত্ব মূর্ত্তভাবে প্রচারিত করাই প্রাচীন গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বেদানুগ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে গার্হস্থ্য জীবন ও সন্তানোৎপাদন একটি অপরিত্যজ অঙ্গ। তাই অহল্যা প্রভৃতিকে ব্রহ্মচারিণী অপ্রসূতি কুমারী রূপে অঙ্কিত করা হয় নাই। সেটা অতি সহজেই করা যাইত—কিন্তু বেদানুগ হইত না বলিয়া তাহা গ্রহণীয় হয় নাই। বাল্মীকি ও ব্যাসের ভুল হইয়া থাকিবে।

বীজের আদর থাকিলে ভাল বীজ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা আপনিই সমাজে আসিয়া পড়ে। পরিশুদ্ধ বীজে বিশুদ্ধ বংশের বিস্তার হয়। ভাল বীজে ভাল বাগান হয়। বাগানের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই রামায়ণ ও মহাভারত।

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা দেশীয় অধিবাসিগণ

(৩)

রাজা রামমোহন রায়—রাজা রামমোহন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি পনর ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাটনায় থাকিয়া পারসী ও আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত হন। কথিত আছে তিনি তথায় বাসকালে কোরাণ পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার

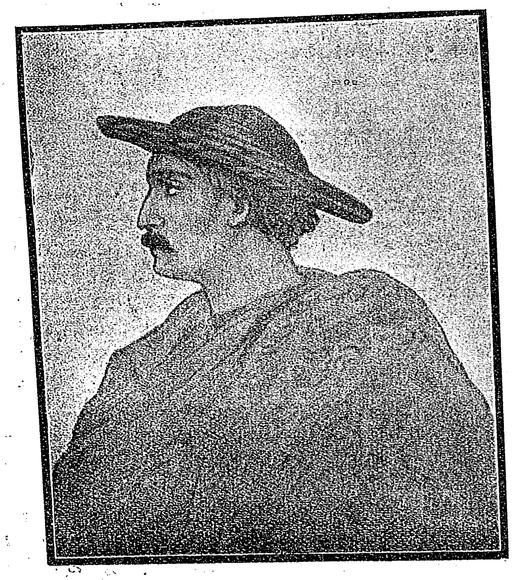

রাজা রামমোহন রায়

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। এই বিষয় লইয়া পিতার সহিত মনান্তর ঘটায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তিব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করায় তাঁহার জীবন বিপন্ন হয় এবং তিনি অচিরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীধামে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এই সময়ে পিতার সহিত মনোমালিন্য দূর হয় এবং পিতা তাঁহাকে বাটীতে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। এই সময় তিনি পিতৃ আদেশে স্বীয় চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী লইয়া রামগড় ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কাজ করার পর রঙ্গপুরের কলেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের সেরেস্তায় দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর নিজ বিষয়-কর্ম্ম দেখিয়া ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন।

রামমোহন রঙ্গপুরে থাকিতেই ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে প্রথম আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই স্থানে অবস্থান কালেই তিনি পারস্য ভাষায় একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তথায় পৌত্তলিকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। ইনি রামমোহনের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "জ্ঞানাঞ্জন" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতা আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন-তরঙ্গ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮১৫ সালে তিনি "আত্মীয় সভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন। সেখানে শাস্ত্রীয় বিচার সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতেন। এই সভাতেই তিনি মাদ্রাজ প্রদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাস্ত করেন। ইহার পর হইতে তিনি সমাজ-সংস্কার কার্য্যে বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি বেদান্ত ও উপনিষদ অনুবাদাদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামমোহনের কার্য্যাবলীতে স্বদেশবাসীদের বিদ্বেষ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হইলে তাঁহার সহিত কমিটিতে একত্র কার্য্য করিতে সকলে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে তথায় স্থান দেওয়া হয় নাই। ইহার পর তিনি যীশুর উপদেশাবলী নামে একখানি পুস্তক ও একেশ্বরবাদ প্রতিবাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করায় হিন্দু সাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরূপ হন। ১৮২৩ সালে পাব্‌লিক ইনষ্ট্রাকশন্ কমিটি স্থাপিত হইলে যখন উহা একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার বিষয় স্থির করেন, তখন রামমোহন এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন এবং তদবধি ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন।

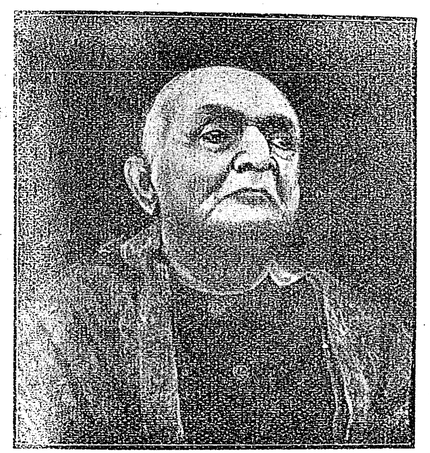

ভোলনাথ চন্দ্র

ইহার পর তিনি এ দেশ হইতে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডফ্ সাহেব (A. Duff) যখন তাঁহার ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়েও তিনি কম সহায়তা করেন নাই। তাঁহার দ্বারা বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তিনি "কৌমুদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর রামমোহন দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহার নিজ আবশ্যকের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। বাদশাহ সেই সময় তাঁহাকে অর্থ ও রাজা উপাধি দান করেন। রাজারাম নামক তাঁহার প্রতিপালিত একজন অনাথ, এবং রামরতন মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী দাস নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার সহযাত্রী হন। তিনি বিলাতে গিয়া ভারতের জন্য অনেক কার্য্য করেন এবং সকলের নিকট সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন। তথায় তিনি ব্রষ্টলের নিকট একটী পল্লীতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁহার প্রাণান্ত হয় এবং ৮ই অক্টোবর স্তবাড়ি নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হয়। তিনি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে রমানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজের



রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

ট্রাষ্টী এবং বিশ্বম্ভর দাসকে সম্পাদক মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। রামমোহন একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ছিলেন।

* * * *

৺ভোলানাথ চন্দ্র—বাঙ্গালা ১২২৯ সালে নিমতলা ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে ভোলানাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামমোহন চন্দ্র। খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ রাধাচরণ চন্দ্রই প্রথম কলিকাতায় আইসেন। ভোলানাথ প্রথম ম্যাকে (Mr. Mackay) সাহেবের স্কুল, জয়নারায়ণ মাষ্টারের স্কুল, ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারী প্রভৃতিতে পড়িয়া শেষে হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত

হন। তিনি প্রথম কিছুদিনের জন্য ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে জ্ঞাতিভ্রাতা মহেশচন্দ্রের সহিত ভোলানাথ ও মহেশচন্দ্র এই নামে একটি ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কাশীপুরস্থ চিনির কলের এজেণ্ট হন। এই শেষোক্ত কার্য্যের জন্য তিনি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ইহা হইতেই তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকের সূত্রপাত হয়। ভোলানাথ ইংরাজী ভাষায় খুব ভালরূপ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভিন্ন আরও বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতিপয় মহাপুরুষের জীবন-চরিত উল্লেখযোগ্য। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

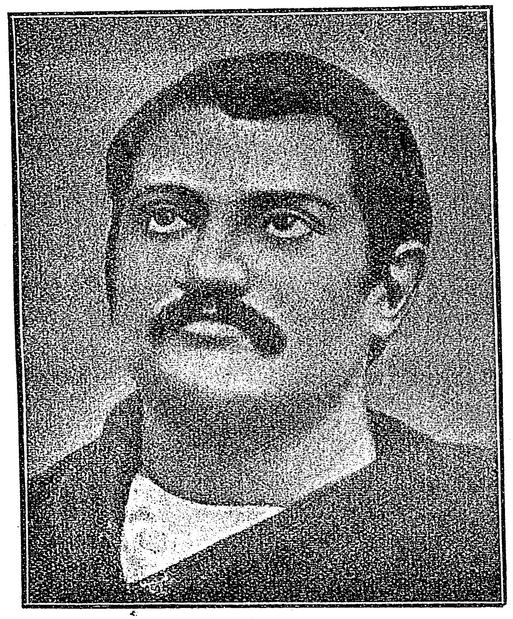

কেশবচন্দ্র সেন

* * * *

দীনবন্ধু মিত্র—কলিকাতার অদূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে ১২৩৬ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। পিতা দরিদ্রতা নিবন্ধন পুত্রকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় রাখিয়া একটি বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। দীনবন্ধুর ইহা ভাল লাগিল না। তিনি গোপনে কলিকাতায় আসিয়া এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডাক-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মসূত্রে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ১৮৭১ সালে লুশাই যুদ্ধের সময় তাঁহার উপর ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি এ কার্য্য সুনির্ব্বাহ করায় রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। দীনবন্ধু কবি ও নাট্যকার রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথম ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকরে" লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি "মানব-চরিত্র" নামে একখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। নীলকরদের অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখে বিচলিত হইয়া ১৮৬০ সালের শেষভাগে তিনি ঢাকা হইতে "নীলদর্পণ" প্রকাশ করেন। এই নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া রেভারেণ্ড জেমস্ লং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। তৎপরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" "সধবার একাদশী" "লীলাবতী" প্রভৃতি নাটক-গুলি রচনা করেন। "সুরধুনী কাব্য" "দ্বাদশ কবিতা" ও "কমলে কামিনী" তাঁহার শেষ দশায় লিখিত। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—"যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমন কার্য্য দীনবন্ধু কখন করেন নাই।" ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গতায়ু হন।

* * * *

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—১৮২০ সালে কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, তিনি হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন। দ্বারকানাথ প্রথম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পরে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ১৮৩২ সালে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম তথাকার গ্রন্থরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন, তৎপরে তথাকার অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে পদোন্নতি হইয়া এই স্থান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। তিনি রোম ও গ্রীসের ইতিহাস, নীতিসার প্রভৃতি পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু "সোমপ্রকাশ"ই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদকতায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং যতদিন তাঁহার দেহে সামর্থ্য ছিল

তিনি উহা পরিচালন করিয়াছিলেন। "কল্পদ্রুম" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা তিনি কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। শেষে পীড়াবৃদ্ধি পাইলে রেওয়া রাজ্যের সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন এবং সেই স্থানেই ১৮৮৬ সালে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

* * * *

কেশবচন্দ্র সেন—কেশবচন্দ্র গৌরীভানিবাসী ও কলিকাতার কলুটোলাপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন

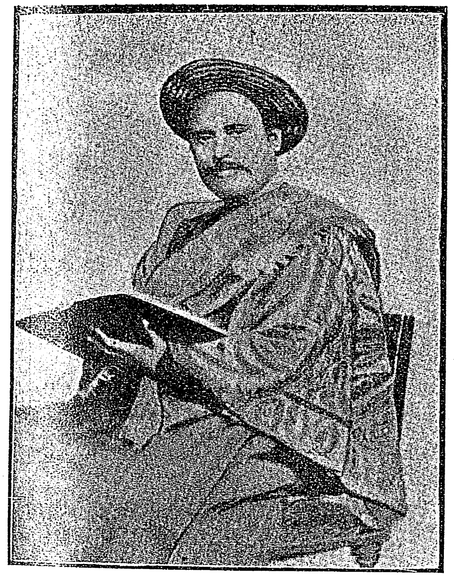

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর

মহাশয়ের পৌত্র ও প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ সালে কলুটোলার ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারীমোহন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার পত্নীও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। কেশবচন্দ্র অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন এবং জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হিন্দু কলেজ ও মেট্রপলিটান্ কলেজে তিনি বিদ্যালাভ করেন। কোন বিশেষ কারণে একবার তিনি বিদ্যালয়ে শাস্তিভোগ করেন। এবং ইহাতে তাঁহার মনে গুরুতর আঘাত লাগে। কথিত আছে এজন্য তাঁহার যে অনুতাপ আইসে তাহাই তাঁহার জীবন-ধারার পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ হয়।

১৮৫৬ সালে তিনি ড্যাল্ সাহেব ও পাদ্রী লং সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে এক সভা স্থাপন করেন। পর বৎসর তাঁহার ধর্ম্মভাব ও কর্ম্মোৎসাহ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। এই সময় Good-will Fraternity নামে আপন ভবনে এক সভা স্থাপন করেন। এই সভাতে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতেন ও বক্তৃতা দিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার ভাবী বাগ্মিতার সূত্রপাত এই সভাতেই হয় এবং এই সভার সম্বন্ধসূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথ যখন



দ্বারকানাথ ঠাকুর

ধ্যান-ধারণার জন্য কিছুদিন সিমলা পাহাড়ে অবস্থান করেন, তখন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। ইহার পর তিনি এই নবধর্ম্মের প্রতি ক্রমশই অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। ১৮৫৯ সালে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র তথায় ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা বহু ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। অনুমান ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "সঙ্গত-সভা" নামে এক ধর্ম্মালোচনা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্র এই সভায় যোগ দিয়া ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তিনি সিংহল ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ইহার ফলে দেবেন্দ্রনাথের সহিত তিনি সুদৃঢ় প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটী ত্রিশ টাকা বেতনের চাকুরী লইতে বাধ্য হন, কিন্তু শীঘ্রই এ কার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৬২ সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক কলিকাতা সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। পর



গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৎসর তিনি "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি মাদ্রাজ ও বোম্বাইপ্রদেশে প্রচারার্থ গমন করেন এবং তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিক্ষেপ করিয়া আইসেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইলে সমাজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং "ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা" নামক তৎপ্রতিষ্ঠিত সভাকে আশ্রয় করিয়া একটী ব্রাহ্মমণ্ডলী গঠন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই নারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে "ব্রাহ্মিকা-সমাজ" নামে একটী নারী সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের দ্বারা "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ রাখা হইল। ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে এই নব সমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করা হয় এবং কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্ত্তন করিয়া তাহার ভিত্তিস্থাপন করেন। ইহাই ব্রাহ্মদিগের প্রথম নগরসঙ্কীর্ত্তন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ছয় সাত মাস তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে বহু বক্তৃতা করেন। তথায় তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের নিকট সম্মান লাভ করিয়া ফিরিয়া



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (যৌবনে)

আইসেন। ফিরিয়া আসিয়াই কলিকাতায় "ভারত সংস্কার সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে "ভারতাশ্রম" নামে তিনি একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার কন্যার কুচবিহারে বিবাহ ব্যাপার লইয়া এক বিষম দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলে, তিনি নিজের বিভাগীয় সমাজের "নববিধান" নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন,

নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে তিনি পাঁচ বৎসর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয় ও ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী ও সমাজ-সংস্কারক বাঙ্গালায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

* * * *

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর—১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। প্রথম ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করিয়া

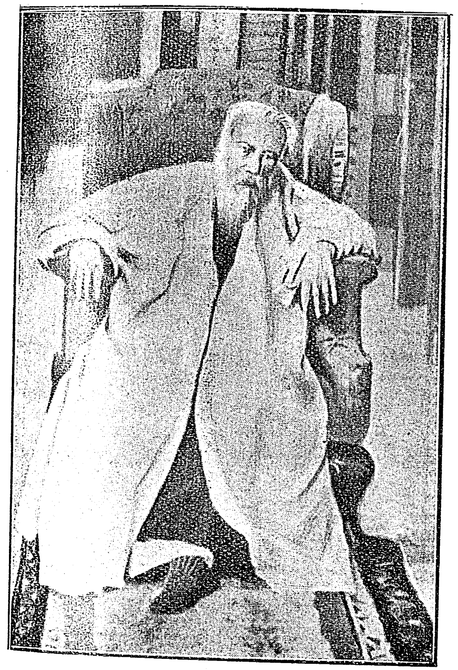

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বার্দ্ধক্যে)

রে নূতন মেট্রোপলিট্যান্ কলেজে ক্যাপ্টেন্ রিচার্ডসনের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি ২৪ পরগণার জজ্ আদালতে অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সেই সময়েই টিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য রিতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট হইতে হিন্দুপেট্রিয়ট্ যখন পণ্ডিত রচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হস্তে আইসে, তখন ১৮৬১ সালে ষ্ণদাস তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ুকাল পর্য্যন্ত তিনি তেজস্বিতার সহিত উহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদক রূপে প্রবেশ করিয়া ১৮৭৯ সালে উহার সম্পাদক হন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলিকাতা সহরের জাষ্টিশ্ অব্ দি পিস্ হন। তিনি একজন ক্ষমতাশালী মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর ছিলেন এবং ১৮৮৩ সালে বড়লাটের সভায় অতিরিক্ত সদস্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় সুবক্তা বিশেষ কেহ ছিলেন না। ১৮৭৭ সালে তিনি রায় বাহাদুর এবং পর বৎসর C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। জনসাধারণের নিকট তিনি বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। হ্যারিসন রোড ও কলেজ

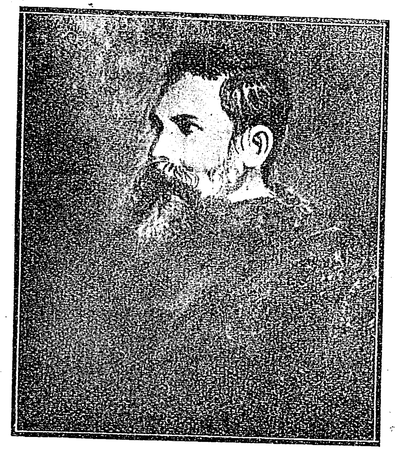

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ষ্ট্রীটের চৌমাথার মোড়ে তাঁহার একটী মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

মহারাণী স্বর্ণময়ী—১৮২৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ভট্টকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একাদশ বৎসর বয়সে কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৪১ সালে কৃষ্ণনাথ রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ সালে তিনি তাঁহার কলিকাতার চিৎপুরের বাটীতে আত্মহত্যা করেন। রাজার উইল অনুসারে স্বর্ণময়ীর স্ত্রীধন ব্যতিরেকে সমস্ত সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিকার করেন। স্বর্ণময়ী যে কিছু

বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ সম্পত্তি ও জমিদারীর কাজ বেশ বুঝিতে পারিতেন। কাশিমবাজার ষ্টেটের সুযোগ্য অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর রাজীবলোচন রায়ের সহায়তায় তিনি তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুপ্রীম্ কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তিন বৎসর পরে আদালত উইল্ নামঞ্জুর করেন।

স্বর্ণময়ী সর্ব্বাংশে হিন্দু বিধবার ধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহার দান অসাধারণ ছিল। তিনি বহরমপুরে জলের কলে ১৫০০০০৲, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষে ১২৫০০০৲ মেডিক্যাল্ কলেজ্ ও ক্যাম্বেল্ মেডিক্যাল্ স্কুলের ফিমেল্ হোষ্টেলে

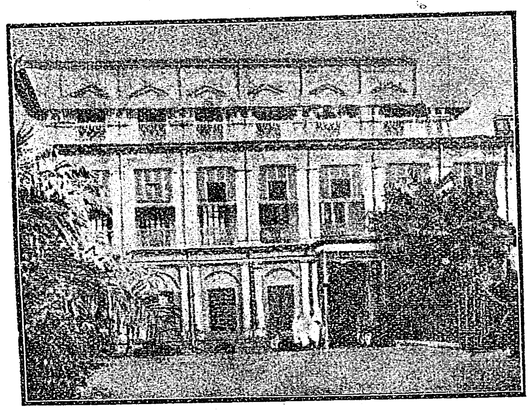

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী

১১০০০০৲ দান করিয়াছিলেন। বহরমপুর কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ১৬০০০৲ হইতে ২০০০০৲ টাকা ব্যয় করিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অসংখ্য ছোট ছোট দান ছিল। জলকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি বহুসংখ্যক জলাশয় এবং দুস্থদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহু বিদ্যালয় ও টোল কেবল তাঁহার দানের উপর নির্ভর করিয়াই চলিত। পৌষ ও চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনি সহস্র সহস্র কাঙ্গালী দুঃখীকে ভোজন করাইতেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথম রাণী তৎপরে ১৮৭১ সালে মহারাণী এবং ১৮৭৮ সালে C. I. 3. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ষ্টেটের আয় ছিল ছয় হইতে আট লক্ষ টাকা। তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হন।

* * * *

কাশীনাথ ঘোষ—নদীয়ার রাজাদের দেওয়ান রামদেব ঘোষের পুত্র কাশী ঘোষ ফেয়ারলি ফার্গুসন কোম্পানীর সহকারী বেনিয়ান্ ছিলেন। তিনি এই মুচ্ছুদ্দিগিরি কাজ করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নামে একটী গলি আছে।

* * * *



রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ—আদিসুরের দ্বারা কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘো হইতে এই ঘোষ বংশের উদ্ভব। এই বংশের মনোহর ঘো প্রথম কলিকাতার চিত্রপুর অধুনা চিৎপুরে আসিয়া বা স্থাপন করেন। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন এবং প্র রাজা টোডরমলের অধীনে একজন গোমস্তার কা নিযুক্ত হন। পরে তিনি রাজস্ব তালিকা প্রস্তুতের কা নিযুক্ত হইলে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সর্ব্বমঙ্গলা চিত্রেশ্বরী দেবীর একটী ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করে

কথিত আছে বৃটিশ্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বাঙ্গালার মধ্যে এই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নরবলি হইত। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ নরবলির অমানুষিক দৃশ্য দেখিতে না পারায় এই স্থান ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া বাস স্থাপন করেন। তথায় রহিম সিংয়ের দ্বারা তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, পরে তিনি নিহত হন। তাঁহার পুত্র বলরাম নিজ মাতাকে লইয়া কিছুদিন এখানে ওখানে থাকিয়া পরিশেষে চন্দননগরে বাস করেন এবং এই স্থানে ব্যবসায় কার্য্যে নিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলেন তিনি ফরাসী গভর্ণর দুপ্লের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ১৭৫৬

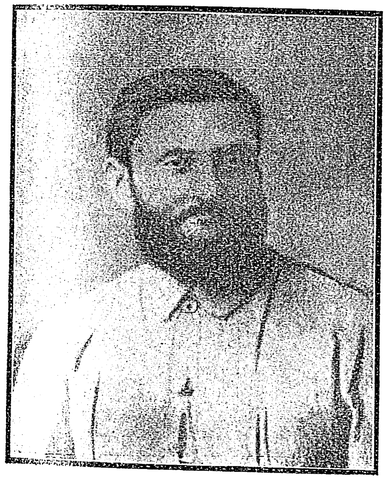

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর

সালে রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি এবং শিবহরি নামক চারি পুত্রের প্রথম দুইটীকে রাখিয়া মারা যান। তাঁহারা চন্দননগর হইতে কলিকাতার বাগবাজারস্থিত কাঁটাপুকুর নামীতে উঠিয়া যান এবং প্রায় কুড়ি বিঘা জমি লইয়া এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

শ্রীহরি ঘোষ বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ইংরাজিতেও সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান ছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি দেওয়ানী হইতে অবসর লইবার পর কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই সময় তিনি তাঁহার বহু স্বজাতীয়গণকে ও আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনাহূত রবাহূত বহু লোকেও তাঁহার বাটী সদা কোলাহল-মুখরিত করিয়া রাখিত। এই সকল কারণে লোকে তাঁহার বাটীকে বলিত "হরিঘোষের গোয়াল।" তিনি দান ধ্যান ও ক্রিয়াকলাপেও বহু অর্থব্যয় করিতেন। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার এই স্বভাবের সুযোগ লইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার জীবন শেষাবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়াছিল। তিনি শেষে মনের দুঃখে তাঁহার বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া কাশীবাসী

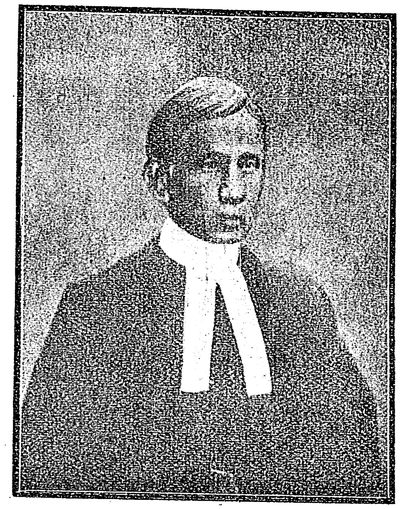

জষ্টিশ্ চন্দ্রমাধব ঘোষ

হন। তথায় ১৮০৬ সালে কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, হরলাল ও রসিকলাল নামক চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

বারাণসী ঘোষ—ইনি বলরাম ঘোষের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল রাধাকান্ত ঘোষ। বারাণসী ২৪ পরগণার কলেক্টর মিঃ গ্ল্যাডউইনের (Mr. Gladwin) দেওয়ান ছিলেন। তিনি একটী স্নানের ঘাট ও ব্যারাকপুরে ছয়টী শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

* * * *

তুলসীরাম ঘোষ—ইহাঁর পিতার নাম রামনিধি ঘোষ। হাওড়ার সন্নিকট পৈতাল গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ঢাকায় খাজাঞ্চির কাজ করিয়া তিনি বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে একটী শিব মন্দির এবং ঢাকায় কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ নামক দুই পুত্র রাখিয়া গতায়ু হন।

* * * *

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কলিকাতার ঠাকুরবংশ অতি প্রাচীন। আদিশূরের অনুরোধে কান্যকুব্জাধিপতি প্রেরিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ভট্টনারায়ণ হইতে এই বংশের

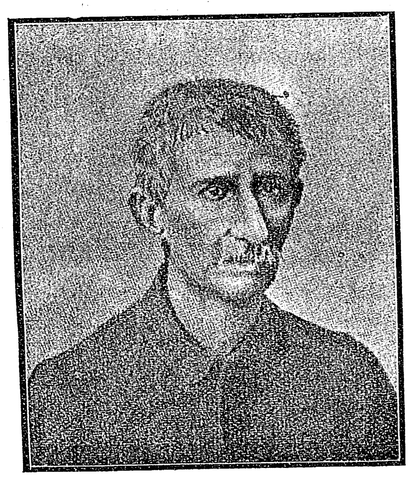

শিশিরকুমার ঘোষ



গণেশচন্দ্র চন্দ্র

উৎপত্তি। ভট্টনারায়ণের ষষ্ঠবিংশতি বংশধর পঞ্চানন যিনি যশোহর হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তিনিই প্রথম "ঠাকুর" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইঁহার পুত্রের নাম ছিল জয়রাম। তাঁহার চারি পুত্র—আনন্দিরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। এই নীলমণি হইতেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের উৎপত্তি। তৎপূর্ব্বে দরমাহাট্টা ষ্ট্রীটে তাঁহাদের বাসভবন ছিল। নীলমণির তিন পুত্র রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভের মধ্যে রামমণির তিন পুত্র ছিলেন, দ্বারকানাথ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৭৯৪ বা ৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন কর্ত্তৃক পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কুমারখালির জমিদারী এবং বহু ভূসম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তিনি অল্প বয়স হইতেই জমিদারীর কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আইনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল চব্বিশপরগণার লবণ বিভাগের এজেণ্টের সেরেস্তাদার পদে কার্য্য করিয়া পরে এই বিভাগের দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮২৯ সালে তাঁহার চেষ্টায় ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৪ সালে "কার ঠাকুর" নামে একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে তিনি কতিপয় নীলের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার বিষয়ক কার্য্যে তিনি একজন সহায়ক ছিলেন। হিন্দু কালেজ, ও মেডিক্যাল্ কালেজ্ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সালে তিনি জমিদার সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তাঁহারই পরামর্শে সৃষ্ট হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার তিনি একজন উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪২ ও ৪৫ সালে তিনি দুইবার বিলাত যান এবং তথায় তিনি বিপুল সংবর্দ্ধনা লাভ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ,

ইটালীর রাজা, ইজিপ্টের রাজ-প্রতিনিধি প্রভৃতিও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি District Charitable Societyতে দশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ নামক তিন পুত্র রাখিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* * * *

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে তত্ত্ববোধিনী সভা

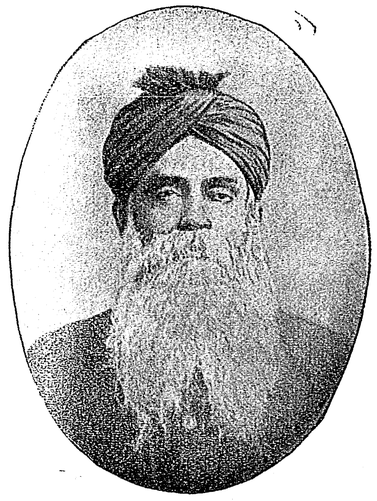

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

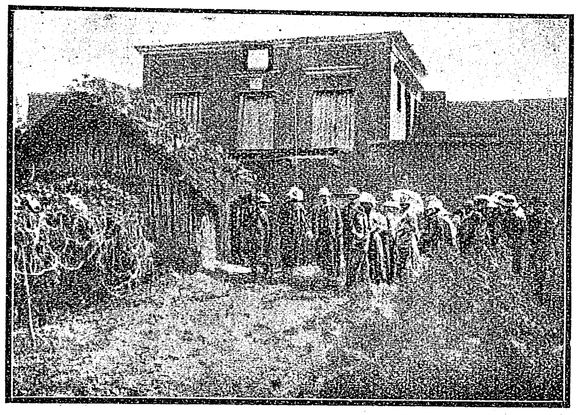

মহারাজা নন্দকুমারের কাশীমবাজারের বাটী

প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইহা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং সমাজকে ভগ্নদশা হইতে রক্ষা করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পিতা কার ঠাকুর কোম্পানীর নামে প্রায় এক ক্রোর টাকা ঋণ করিয়া মারা যান, কিন্তু এই ঋণ করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জমিদারীর কতকাংশ ট্রাষ্টিদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কোম্পানীর দেনার জন্য ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি দায়ী নহে—বহু লোকের নিকট এরূপ পরামর্শ পাইয়াও তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এবং বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ সকল বিক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে দেনা পরিশোধ করিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি সংসারে থাকিলেও নিষ্কাম ও নিস্পৃহভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি অনেক সময় হিমালয়ের নিভৃত স্থানে ভগবদারাধনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণে "মহর্ষি" উপাধি দিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের দানও কম ছিল না। তাঁহার আত্মজীবনী, আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। কুচবিহারের মহারাজার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ায় সকলে কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিলেও তিনি তাঁহার মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে বাঙ্গলার গৌরবস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পুত্রকন্যাগণকে রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। ভারতগৌরব বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র।

* * * *

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইনি হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বৎসর বয়সে "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" এবং "মুক্তাবলী" নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন

পরবর্ত্তীকালে তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের বঙ্গানুবাদ, "মণিমালা" "ধাতুমালা" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহনের প্রসিদ্ধি এ সবের জন্য নহে। তিনি একজন সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। ষোড়শবর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন আরম্ভ করেন। তিনি শুধু এ দেশে নয়, বহু দেশ-বিদেশ এমন কি সুদূর আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে কোন ভারতীয় কোন বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহা পান নাই। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফিলাডেল্‌ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Doctor

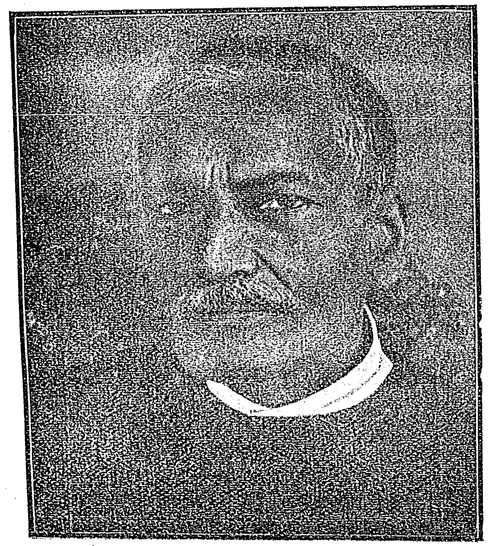

সারদাচরণ মিত্র

of Music উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গ ও ভারত সরকারও তাঁহার এই উপাধি অনুমোদন করেন। ১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তিনি এই উপাধি পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে Companion of the Order of the Indian Empire এবং রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। নেপাল হইতে সঙ্গীত শিল্প বিদ্যাসাগর ও ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও জাষ্টিশ্ অব্ দি পিস্ হইয়াছিলেন। লণ্ডনে রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী ও রয়েস্ সোসাইটী অব লিটারেচার; ফ্রান্সে প্যারিশ



নীলকমল মুখোপাধ্যায়

একাডেমী ও মন্টি-ল্ একাডেমীর সভ্য ছিলেন। ইহা ছাড়া স্পেন্, পর্ত্তুগাল্, ইটালী, সুইডেন্, রাশিয়া, ডেন্‌মার্ক্, হলাণ্ড, জার্ম্মানী, তুরস্ক, ইজিপ্ট, আফ্রিকা, চীন্, জাপান্ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সুসভ্য দেশেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলুটোলা ও চিৎপুর রোডে বেঙ্গল্ মিউজিক্ স্কুল্ নামে দুইটী সঙ্গীত শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। লাট প্রাসাদে কোন সঙ্গীতাদি হইলে তাঁহার নিমন্ত্রণ অগ্রে হইত। তিনি লণ্ডনে Royal College of Music এ সুগায়ক ও সুগায়িকাকে সুবর্ণ-পদক দিবার জন্য এককালীন অর্থ দিয়াছিলেন। সংস্কৃত

কলেজে জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী আনন্দময়ী দেবীর নামে ও তাঁহার পিতার নামে বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর দ্বীপে পিতার নামে একটী পুষ্করিণী খনন ও বরাহনগরে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান এবং লেডি ডফরিন হাসপাতাল গৃহ ও আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

* * * *

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—আনুমানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম গোপাল লাল ঠাকুর। হিন্দু

কলেজে, ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারী ও ডভটন্ কালেজে তিনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার বলিয়া বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তিনি দানশীল ছিলেন, অভাবগ্রস্ত লোকদের তিনি কখন বিমুখ করিতেন না। তাঁহার পুত্রের বিবাহে তিনি বহু দান ধ্যান করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার দুই পুত্র শরদিন্দ্রমোহন ও শৌতীন্দ্রমোহন উভয়েই



ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র

পরলোক গমন করেন। শৌতীন্দ্রমোহন নিঃসন্তান ছিলেন। স্বনামধন্য প্রফুল্লকুমার ঠাকুর শরদিন্দ্রমোহনের বংশধর।

* * * *

রামশঙ্কর ঘোষ—ইনি আরপুলির সুবিখ্যাত ঘোষ বংশজাত। সাধারণতঃ শঙ্কর ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দৈবকিনন্দন ঘোষের পুত্র মনোহর ঘোষের পুত্র ছিলেন। ইনি কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দির কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার অধিকাংশ ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। চোরবাগানের কালীর মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

* * * *

শিবচন্দ্র গুহ—ইঁহারা হোগলকুড়িয়ার গুহবংশসম্ভূত। ইঁহারা মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতার বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ১৭৯৩ সালে শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম ছিল ব্রজনাথ গুহ। পিতার আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ তাঁহার ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ হয় নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে



প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ল্যাকারাষ্টিন্ কোম্পানীর (Messrs Lackersteen and Co.) আপিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে তিনি অফিসের মুচ্ছুদ্দি হন এবং সেই সঙ্গে নিজে একটী স্বতন্ত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি জীবনে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সৎকার্য্যের দ্বারা তাহা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতেন। তিনি ভীম ঘোষের ষ্ট্রীটে শিবমন্দির ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এবং ২৪ পরগণায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি কতিপয় জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অভয়চরণ ও তারাচাঁদ নামক দুই পুত্রকে রাখিয়া তাঁহার বরাহনগরস্থ বাগানবাটীতে তিনি মারা যান।

* * * *

চন্দ্রমাধব ঘোষ—ইঁহার জন্মস্থান বিক্রমপুর। পিতার নাম রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ওকালতী পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বর্দ্ধমানে উকীল-সরকারের কাজ করেন। পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া ডেপুটী-কলেক্টর হন। পরে পুনরায় এই পদ ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন।

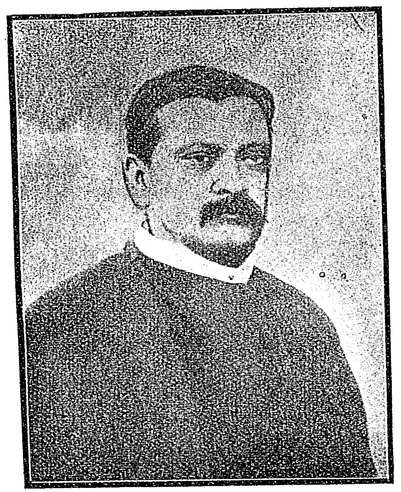

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন অস্থায়ী চিফজষ্টিসের কাজও করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "নাইট্" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

* * * *

শিশিরকুমার ঘোষ—ইনি যশোহর জেলার মাগুরার সুবিখ্যাত ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নীলকরদিগের অত্যাচার দর্শনে তাহার প্রতিবিধানার্থ সমস্ত ঘটনা গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি তাঁহার দেশে "অমৃতবাজার পত্রিকা" নামে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ সালে গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া আইন প্রণয়ন করিলে তিনি অমৃতবাজার ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহা প্রথম সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিকে পরিণত হয়। ১৮৮১ সালে অমৃতবাজার কার্য্যালয় কলিকাতায় আইসে। শিশিরকুমারের ন্যায় নির্ভীক, তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী সম্পাদক বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। Hindu Spiritual Magazine নামে একখানি মাসিকপত্রও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতেন। তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার "অমিয় নিমাই চরিত" এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত "Lord Gauranga" নামক

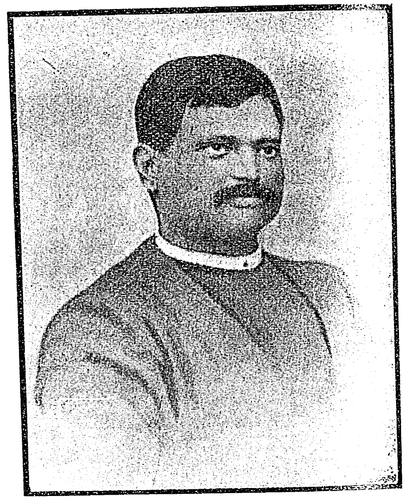

নলিনবিহারী সরকার

গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বত্র সমাদৃত। বিডন্ গার্ডেনে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে যে বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে তাহা ইহাঁরই চেষ্টায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। জীবনের শেষাবস্থায় শিশিরকুমার তাঁহার যোগ্য সহোদর মতিলাল ঘোষের হস্তে পত্রিকার ভারার্পণ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় জীবনযাপন করেন।

* * * *

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ইনি কাঁচড়াপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র ১২১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটিলে কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে

মাতামহ রামমোহন গুপ্তের আলয়ে অধিকাংশ সময় থাকিতেন। লেখাপড়া শিক্ষায় তাঁহার মনোযোগ ছিল না; সুতরাং সামান্য বাঙ্গালা ভিন্ন তাঁহার শিক্ষা কিছুই হয় নাই; কিন্তু এই শিক্ষা লইয়াই তিনি তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতির গুরুস্থানীয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। তাঁহারই প্ররোচনাতে ১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় "সংবাদ-প্রভাকর" সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর পরে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সহিত "প্রভাকর" কিছুদিনের জন্য উঠিয়া যায়। এই সময় আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে "রত্নাবলী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মহেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামতঃ সম্পাদক থাকিলেও ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদকতা কার্য্যে সম্পূর্ণ সহায়ক ছিলেন। ১২৪৩ সালে তিনি প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তখন উহা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হইত; পরে দৈনিকে পরিণত হয়। ১৮৫৩ সালে "পাষণ্ডপীড়ন" নামক আর একখানি পত্র তিনি বাহির করেন। পর বৎসর উহা উঠিয়া গেলে "সাধুরঞ্জন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১২৬০ সালে "প্রভাকর" নামে একখানি স্থূলকায় মাসিক প্রকাশ করেন। ১২৬২ সালে তিনি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১২৬৪ সালে প্রবোধ প্রভাকর নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১২৬৫ সালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

* * * *

গণেশচন্দ্র চন্দ্র—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাশীনাথ চন্দ্র। তিনি বেঙ্গল একাডেমি, হিন্দু মেট্রোপলিট্যান্ কলেজ ও ডভটন্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৩ সালে সুইনহো এণ্ড লাহার (Messrs Swinhoe & Law) অফিসের রমানাথ লাহার আর্টিক্যাল্ ক্লার্ক হন। ১৮৬৮ সালে এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের এটর্নীর তালিকাভুক্ত হন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য, ডেপুটী সেরিফ, এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য ছিলেন। তিনি প্রথম কতিপয় বৎসর অপরের সহিত যুক্ত হইয়া এটর্ণীর কার্য্য করিয়া পরে ১৮৭২ হইতে ৯৪ পর্য্যন্ত নিজ নামে ফার্ম্ম খোলেন এবং পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র চন্দ্র এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ফার্মের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জি, সি, চন্দ্র এণ্ড কোম্পানী রাখা হয়। এটর্ণী হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। খ্যাতিনামা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র পরলোকগত রাজচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের পুত্র।

* * * *

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—যশোরের কুলিয়ারাণঘাট গ্রামে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পণ্ডিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। তিনি এম্-এ, বি-এল, পাশ করিয়া প্রথম কলিকাতা হাইকোর্টে পরে পাঞ্জাব চীফ কোর্টে ওকালতি করেন। লাহোরে অবস্থান কালে তাহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া কাশ্মীরের মহারাজা ১৮৬৮ সালে তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি তথায় রেশমের কারখানা স্থাপন করিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। মহারাজা তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সনদ ও উপহারাদি এবং অর্থ সচিবের পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কার্য্যত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আইসেন। ১৮৯৬ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ হন এবং বহুদিন এই পদে থাকিয়া সম্মানের সহিত কার্য্য করেন।

* * * *

মহারাজা নন্দকুমার—সম্ভবতঃ ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুরশিদাবাদ জেলার জরুলগ্রামে বাস করিতেন। পরে ভদ্রপুর গ্রামে, তাঁহার প্রপিতামহ রামগোপাল রায় তত্রত্য মথুরানাথ মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র চণ্ডীচরণের প্রথমা পত্নীর গর্ভে পদ্মনাভ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুরশীদ-কুলীখাঁর অধীনে আমীনের পদে

নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার পিতার শিক্ষাধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহার সহকারী বা নায়েব আমীনপদে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪০ অব্দের পর তিনি নবাব কর্ত্তৃক হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমীন নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি দুইবার বিপদগ্রস্ত হন এবং শেষবার প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিতে সঙ্কল্প করিলে কলিকাতায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। পরে মুস্তাফার মৃত্যু হইলে পুনরায় মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া বহু চেষ্টায় সাতাইশকা পরগণার আমীনের পদলাভ করেন। কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহার আর্থিক সুবিধা না থাকায় উহা ত্যাগ করিয়া হুগলীতে আইসেন। এই সময় তাঁহার দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। কিছুদিন কষ্টভোগের পর মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইলে তাঁহার অধীনে তিনি দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি "দেওয়ান-নন্দকুমার" নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

আলিবর্দ্দিখাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসন লাভ করিলে প্রথম মির্জ্জা মহম্মদ আলী ও পরে ওমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন; কিন্তু উভয়েরই কার্য্য সন্তোষজনক না হওয়ায় পরে নন্দকুমারকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। পরে ইংরাজদিগের চন্দননগর আক্রমণের সময় নবাবের আদেশের বিপরীত কাজ করায় অর্থাৎ ফরাসীদের সাহায্যের পরিবর্ত্তে ইংরাজদের প্ররোচনায় উমিচাঁদের পরামর্শে ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করায় নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর নন্দকুমার ক্লাইভের দেওয়ান নিযুক্ত হন। পরে মীরজাফরকে তিনি অনুরোধ করিয়া নন্দকুমারকে হুগলী হিজলী প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর অধীনে একটী দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্মের ভার দিলেন। ১৭৫৮ সালে নদীয়া ও বর্দ্ধমানের রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরাজ পক্ষ হইতে এই দুই স্থানের তহশীলদারী পদ প্রাপ্ত হন। অল্পদিন পরে নন্দকুমার নবাব সরকারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহা হেষ্টিংসের মনঃপুত না হওয়ায় তিনি নানা উপায়ে নন্দকুমারের প্রভাব খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন। এই সময় ক্লাইভ সর্ব্ববিষয়েই নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ক্লাইবের পর ভান্সিটার্ট গভর্ণর হইলে প্রথম তিনি নন্দকুমারকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেও হেষ্টিংসের প্ররোচনায় ক্রমে বিদ্বেষভাবাপন্ন হন। এই সময় ক্রমে বৃটিশ প্রাধান্য বৃদ্ধির সহিত নন্দকুমারের ক্ষমতা লোপ হইতেছিল। পরে তিনি অমিয়ট্ ও এলিসের পরামর্শে কর্ণেল্ কুটের সহিত প্রধান কর্ম্মচারীরূপে পাটনায় প্রেরিত হন। মীরকাসিমের পতন হইলে মীরজাফরের পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রাপ্তির পর নন্দকুমার তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হন। এই সময় মীরজাফরের চেষ্টায় বাদশাহ কর্ত্তৃক তিনি "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার ইংরাজদের গোপনে অনিষ্ট চেষ্টা অভিযোগে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তিনি পদচ্যুত হন এবং তাঁহার স্থানে মহম্মদ রেজা খাঁ বঙ্গের নায়েব সুবাদার হন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

সম্ভ্রম, গৌরব, প্রতিপত্তি ও প্রতিভায় নন্দকুমার তাঁহার সময়ে বাঙ্গালীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার ভাগ্য বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। তিনি হেষ্টিংস প্রভৃতি কতিপয় পদস্থ ইংরাজের বিরাগ-ভাজন হইয়া শেষে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রে জাল করা অপরাধে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিতে বাধ্য হন। ১৭৭৫ সালের ৫ই আগষ্ট খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজারে তাঁহার ফাঁসী হয়।

* * * *

দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং রাজা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত কেটিয়ারি নামক গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। গভর্ণমেণ্টের অধীনে পাটনার আফিমের কুঠীর দেওয়ান হইয়া তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দির ও একটী স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, শম্ভুকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণ নামে পাঁচ পুত্র রাখিয়া তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন।

* * * *

সারদাচরণ মিত্র—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সারদাচরণের জন্ম হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। এম-এ পরীক্ষায় ইনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়া

ছিলেন। বি-এল, পাশ করিয়া ইনি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালে অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের জজের পদ প্রাপ্ত হন এবং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। ইনি কায়স্থ সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

* * * *

নীলকমল মুখোপাধ্যায়—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। পিতামহ রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম ও নীল সরবরাহ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার একচেটিয়া ব্যবসা ছিল এবং নয় দশটী রেশমের কারখানা ও প্রায় অতগুলি নীলের কারখানা ছিল। নীলকমল কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তথায় তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে একটি ব্যাঙ্কের কার্য্য গ্রহণ করেন। তৎপরে হাইকোর্টে এটর্ণীর আর্টিকেল্ ক্লার্ক্ হন; কিন্তু পিতৃবিয়োগ ঘটায় উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং ব্যাঙ্ক অব্ হিন্দুস্থান, চায়না এবং জাপান্ লিমিটেড্-এ পুনরায় কার্য্য গ্রহণ করেন ও পরে তথাকার দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিবার জন্য পাবনা যান, কিন্তু তিনি তাঁহার শ্বশুর দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারীর ভার লইতে অনুরুদ্ধ হইয়া সেই কাজ গ্রহণ করেন। পরে তিনি গ্রেহাম্ কোম্পানীর অফিসে প্রবিষ্ট হন।

* * * *

ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—১২৫১ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জয়গোপাল মিত্র। তিনি শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ায় প্রথম কিছুদিন পড়িয়া পরে কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ ও বি-এল পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া সুখ্যাতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ডক্টর অব্-ল উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে তৎপরে হুগলী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এই পদ ত্যাগ করিয়া হুগলী আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং তথায় প্রায় আট বৎসর থাকিয়া ১৮৭৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক হন ও হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি ঠাকুর আইন অধ্যাপক হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিণ্ডিকেটের সদস্য, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, ও বিলাতের রয়েল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটির সভ্য ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুরে গতায়ু হন।

* * * *

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া প্রথম কিছুদিনের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করেন। তৎপরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জুডিশিয়াল সার্ভিস্ গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ সালে এলাহাবাদের ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ সালে লক্ষ্ণৌএর অতিরিক্ত জজের পদ প্রাপ্ত হন এবং সেই বৎসরই তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তিনবার এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফ্যাকল্টি অব্ ল'র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

* * * *

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৮৪৮ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এম-এ, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন এবং শীঘ্রই লাহোর আদালতে ওকালতি করিতে যান। তথায় তিনি ক্রমে প্রধান আদালতের বিচারপতি মনোনীত হন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পদে পাকা হন। তিনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং পরে ভাইস্-চ্যান্সেলার হন। তিনি পাঞ্জাব সাধারণ পুস্তকাগারের এবং ডায়মণ্ড জুবিলী হিন্দু টেকনিক্যাল স্কুলের সভাপতি ছিলেন। তিনি সরকার কর্ত্তৃক প্রথম রায়বাহাদুর পরে দিল্লী দরবারের সময় C. I. E উপাধিতে ভূষিত হন।

* * * *

নলিনবিহারী সরকার—তারকচন্দ্র সরকারের দ্বিতীয় পুত্র নলিনবিহারী সরকার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নৈহাটীতে

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া পিতার সুবিখ্যাত কার-তারক কোম্পানী নামক ফার্ম্মে প্রবেশ করেন এবং পরে উহার অংশীদার হন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং ১৮৮১ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে যেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, অন্যান্য সকল বিষয়েও তেমনই সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের, পোর্ট ট্রাষ্টের, ও বেঙ্গল্ লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য এবং কলিকাতার সেরিফ হইয়াছিলেন। তিনি অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং বেঙ্গল্ চেম্বার্সের Calcutta Import Trade Association-এর চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কৈশর-ই-হিন্দ পদক ও C. I. E. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

গলায় গলায়

[আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্]

প্রদীপ মলিন তোর ; তবে ভোর হয়ে এল বলে।
পাথরের বেড়া ভেঙ্গে আসে রেঙ্গে আলো পলে পলে।
স্বপ্নের তরল দাগে জ্যোতি লাগে ঊষার স্পন্দনে ;
নিশা-অবসান-গাথা গাও হোতা, আলোক-বন্দনে।

ছড়ায়ে প্রাণের সূতা জড়াইতে যাই বিশ্ব-জনে ;
বিশ্বসহ আপনায় অজানায় বাঁধিতে বন্ধনে
সঞ্চরে গতির ছন্দ ; একি অন্ধ প্রয়াস জীবনে ?
নহে, নহে ; বহে সত্য অফুরন্ত আলোক-দীপনে।

হে আকাশ, হে প্রকাশ, একি দেখি আজ অকস্মাৎ—
আলোকের ধারে ঝরে অবিরাম প্রাণের প্রপাত !
অসংখ্যের সঙ্গে গাঁথা সবে হেথা প্রপাত তলায় ;
আকাশ-গঙ্গার জল টলমল গলায় গলায়।

ছিঁড়ে এই সত্য সূত্র, ত্যজি ক্ষুদ্র, কোথা দিবে ঝাঁপ ?
চাও মুক্তি, মোক্ষে সুপ্তি ? হে উদ্‌ভ্রান্ত, সে যে মহাপাপ।
হে আদিত্য, ভ্রান্তচিত্তে মোক্ষচিন্তা দাও পোড়াইয়া ;
বিশ্বসহ অদৃশ্যকে বুকে বুকে দাও জড়াইয়া।

দীপ্তির বিদ্যুৎ মৃত্যু ঝলসি' দহিছে দেশ কাল ;
আলোকে গলিছে দৃশ্য, সারা বিশ্ব হয় লালে লাল।
খেদ নাই, ভেদ নাই, পায় না আপনা খুঁজে কেউ ;
সীমার আঙ্গিনা পরে ঢলে' পড়ে অনন্তের ঢেউ।

হে জাগ্রত, হে প্রবুদ্ধ, এ জীবন বোঝা নয় ঘাড়ে ;
ক্ষুদ্র তোর, অল্প তোর মহিমায় ভূমা হয়ে বাড়ে।
নয়, নয় কর্ম্মক্ষয় ; জীবনে সে সোপান সতত ;
কর্ম্মে নাই অবসান, কর প্রাণ অনন্তে উদ্যত।

অনন্ত কি ? কি পর'থি অন্তরের অন্ত খুঁজে খুঁজে ?
রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রে ধরে' অপারের তরে চলি যুঝে।
অতি উর্দ্ধে এই ক্ষুদ্রে প্রসারিতে বহে চিরগতি ;
এই অল্প কোটি কল্পে পরাজিতে চায় নিরবধি।

জাগুক, লাগুক প্রাণে অপরের প্রাণের স্পন্দন ;
সুপ্তি নয়, মুক্তি নয়, চিত্ত চায় জীবন্ত বন্ধন।
এস স্পর্শি' ওগো রশ্মি, দীপ্তি তব প্রাণের তলায়
অনাদির সাথে বাঁধি' বিশ্বপ্রাণ গলায় গলায়।

আশ্রয়

শ্রীঅশোকা ঘোষ

বাড়ীর আগের আমগাছটার তলায় একগাদা খড়। রমেশ তারি পাশে আসিয়া বসে। হাতে খড়-কাটা দা। সুরু হয়—খট্, খটাখট্, খট্। মন তার ছোটে গত ও আগত জীবনের ছোট-বড় হাজারোটা ঘটনার পিছনে। বেলা বাড়ে। গাছের ছায়া সরিয়া যায়। রমেশের চোখে মুখে বৈশাখী সূর্য্যের দৃপ্ত ঝলক আসিয়া লাগে। রমেশ তা হয় ত টেরও পায় না।

স্ত্রী সরলা আসিয়া ডাকে, বলে, কি হচ্ছে ?

রমেশ ফিরিয়া তাকায়। কিছু বলে না।

ওগো শুন্‌ছ ?

রমেশ হয় ত বলে, শুনেছি। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সে ত নিজেই দেখ্‌তে পাচ্ছ। পাচ্ছ না ?

সরলা বলিতে যায়,—তা ত পাচ্ছি। ওদিকে ঘরে যে—

কথা শেষ হইতে পায় না ; রমেশ বলিয়া উঠে, ঘরে যে চাল নেই, ডাল নেই, নূন নেই—

এই ত ? তা কি করব ?

হাঁড়ী চড়বে কি দিয়ে ?

রমেশ উত্তর দেয় না। সরলা বকিতে বকিতে চলিয়া যায়। রমেশ কাটে জাবর—গত ও আগতের। কপালে যে যায়গায় রোদ লাগিয়া ঘাম হয়, রমেশ একবার ধুলো হাত সেখানে বুলাইয়া আনে। এমনি করিয়া বেলা বাড়ে।

সামনেই একটা এক-ফসলী ক্ষেত। ধান কাটার পর চাষী একবার চাষ দিয়া রাখিয়াছে,—এখনো কিছু বুনে নাই। বৈশাখীর 'রোদ্দুরে' ক্ষেতটা যেন জ্বলিতেছে—জ্বল—জ্বল—। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ায় সেই রোদে-পোড়া বালু উড়াইয়া আনে। রমেশ থাকিয়া থাকিয়া সেই ধূ-ধূ-মাঠের দিকে তাকায়—কি যেন ভাবে।

ক্ষেতের ও-পারে একটা বাড়ী। বেশ বড় বাড়ী। সামনের পুকুরের একটা পাড় দেখা যায়। ঐ ধারটায় অনেক কালের একটা বকুল গাছ। একটা মোটা ডাল তার মাটীতে পড়িয়া আছে। তার ওপরে বসিয়া বিশ বাইশ বছরের এক যুবক। একটু দূরে দুইটি গরু চরিতেছে। তার পাশ দিয়া একটা নতুন বাছুর আপনার শক্তির প্রাচুর্য্যে যেন আত্মহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। বৈশাখী আভায় তার মসৃণ দেহ চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

রমেশ চাহিয়া থাকে।

কখনো যুবকটীর সাথে চাহনি মিলে ; রমেশ চম্‌কিয়া উঠে। তার মনে হয় সে যেন তার দিকেই চাহিয়া আছে, আর সে চাহনি ঠিক যেন সেই ধরণের চাহনি ; সেই····· রমেশের মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে, ঐ বাড়ীর ঐ খানটাতেই সে দাঁড়াইয়া ছিল। এই ক্ষেতে এক চাষা হাল বাহিতেছিল। একটা গরু হঠাৎ শুইয়া পড়িল। তখন বেলা বোধ হয় একটা। সেই দুপুরের রোদের ঝলক মাথায় করিয়া চাষার পো কম-সে-কম আধঘণ্টা সেই গরুর সাধ্য-সাধনা করিল। পিঠে হাত বুলাইল, লাঠি বুলাইল—গালাগাল দিল—তার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই বালুতে গা হেলাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন যে দৃষ্টিতে রমেশ তার দিকে চাহিয়াছিল, এ যেন হুবহু সেই দৃষ্টি। একটা দয়া-মিশ্রিত ঘৃণার ভাব ; যে ভাব লইয়া মানুষ বলে—বেচারা, আহা ! কষ্ট পাচ্ছে !

দয়া ?

দয়া সে সহিবে না।

রমেশের ইচ্ছা হয়—সেই খড়-কাটা দা দিয়া সেই যুবকের গলায় এক কোপ বসাইয়া দেয়। ইচ্ছা হয়—।

যাদৃশী ভাবনা—সিদ্ধিও তাদৃশী হইল।

কোপ বসাইল-ও—।

কিন্তু—কিন্তু সে কোপ পড়িল তার বাঁ-হাতের বুড়া আঙুলে।

উঃ, নাক মুখ বিকৃত করিয়া সে দা-টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর ডান মুঠিতে কাটা আঙুলটা চাপিয়া ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল। হাতটা ধরিল উঁচু করিয়া। সেই

কেবল-কাটা হাতের রক্ত তাহার বাঁ হাটুর উপর দিয়া গড়াইয়া পায়ের তলায় আসিয়া জমিতে লাগিল। আর সেই ধারা-পাতের দিকে সেই মর্ম্মর মূর্ত্তির নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। কপালে দুই একটী বিরক্তি-ক্রোধের রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

ওদিকে সরলা বকিতেছে, ব'সে ব'সে কেবল ঐ করলেই চল্‌বে? না আরো কাজকম্ম কিছু করতে হবে! জামাই এলে খড় শেদ্ধ খেতে দেবে; না? জামাই—

জামাই? হাঁ জামাই—

রমেশ উঠিল। বাড়ীর ভিতর হইতে একটা চাদর লইয়া কাটা হাতের উপর জড়াইয়া দিল। সরলা কহিল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, এই ভর দুপুরে? ও কি? হাতে রক্ত কেন অত? কাট্‌ল—

রমেশ ততক্ষণে পথে—।

'সা'জির বাড়ী মাইল দুইয়ের পথ।

'সা' জি অর্থাৎ মধুসূদন সাহা রমেশের ও আরো অনেকের একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—অর্থাৎ মহাজন।

মেঠো পথ। রমেশ চলিতেছে। মাথার উপরে সারা আকাশ জ্বলিয়া জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। কোথাও একটু ছায়া নাই—না আকাশে—না মাটীতে। একটু আড়াল নাই। দুই ধারে ক্ষেতের পর ক্ষেত, তার পর ক্ষেত। ধূ—ধূ—ধূ—। মাঝে মাঝে আমন ধান কাটিবার পর যে আগুন দিয়াছিল, তার কালো দাগ এখনো আছে। পোড়া-ফাটা মাটী,—যেন হাড়। তারি মাঝে দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ। রমেশ চলিতেছে।

হাতের রক্ত ঝরা থামিয়াছে, ব্যথায় কাটাটা টন্‌টন্ করিতেছিল। চাদরের এক ধারে হাতটা জড়াইয়া আরেকটা ধার মাথায় তুলিয়া দিল। সূর্য্যদেব এই কাণ্ড দেখিয়া আরো হাসিয়া উঠিলেন।

প্রথমে থানা, তার পরে পোষ্টাফিস, তার পর কাছারী—জমীদারের, তারও পোয়া-মাইলটাক পরে 'সা'জির বাড়ী। রমেশ পৌঁছিল। সূর্য্য তখন পশ্চিমে হেলিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপের ছায়ায় একটা জলচৌকী পাতা; 'সা'জি গুড়গুড়ীর নলটা হাতে করিয়া বসিয়া। খাইবার স্পৃহা যেন আর নাই।

সাহজী?

কেহ সাড়া দিল না। রমেশ আবার ডাকিল। তার পর সাহস করিয়া বলিল, আমি এসেছি···। তার দিকে না তাকাইয়াই সাহজী বলিলেন, 'আমি'টা কে?

রমেশের চোখ যেন জ্বলিয়া উঠিল। তার বাবার সামনে যে 'মধু সা' মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিত না, সেই 'মধু সা' আজ টাকার জোরে মধুসূদন সাহজী হইয়া রমেশকে না-চেনার ভান পর্য্যন্ত করিতে পারে। সে একবার কি কথা যেন বলিতে গেল, হঠাৎ মনে পড়িল, জামাই, জামাই আস্‌ছে। কোনও মতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে কহিল, রায়পুরের দত্তবাড়ীর—

রায়পুরের দত্ত বাড়ী? হরি দত্তের ছেলে না? হাঁ, হয়েছে। তা তোমার কাছে ত অনেক বাকী। কত এনেছ? কি হে? চুপচাপ যে? আনোনি? তা'লে কি বাবাজীর দর্শন দিতে আসা হয়েছে? সাহজীর উচ্চ-হাস্যে অদূরের একটা পাখী উড়িয়া গেল।

রমেশ বলিতে গেল, আরো যদি কিছু—

হা—হা—হা—

'সাজি' বলিলেন, বেশ বাবা বেশ। দেব না, সে তুমিও জানো, আমিও জানি। তা থাম্‌লে কেন? বল, ব'লে যাও। লেখাপড়া জানো তোমরা, তোমাদের কথা শুন্‌তে আমার বেশ লাগে।

রমেশের ইচ্ছা হইল গুড়গুড়ীটা সাজীর টেকো মাথায় বসাইয়া দেয়। কিন্তু, কিন্তু জামাই আস্‌ছে। তাকে খড় সেদ্ধ দিলে ত চলিবে না। মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, চিঠি এসেছে, জামাই আস্‌বে। এই প্রথম বার। কাপড়-চোপড় দিতে হয় জানেনই ত। তা সে ত দূরের কথা, দুমুঠো ভাত যে দেব তারও জো নেই···

সাহজী বলিলেন, তা ত বুঝ্‌লাম। ব্যবস্থা একটা করা দরকার।

রমেশের বুক আশায় নাচিয়া উঠিল।

সাহজী বলিলেন, হ্যাঁ হয়েছে। জামাইকে জমিদার-বাড়ীর অতিথশালায় পাঠিও, বেশ থাক্‌বে, খাবে। কোন ঝঞ্ঝাট নেই। সেই ভাল হবে, কি বলো?

এও রমেশ হজম করিল, বলিল, অন্ততঃ দশটা টাকা—নইলে 'ইজ্জত' বাঁচে না।

মুখটা যতদূর সম্ভব গম্ভীর করিয়া সাহজী উত্তর দিলেন,

তা, মশায়ের ইজ্জতটা না বাঁচ্‌লে কি একেবারেই চল্‌বে না?···যাও। গোমস্তার কাছ থেকে হিসেবটা জেনে যেয়ো।

গোমস্তাকে যদি গলানো যায়।

গোমস্তা ঘরে ছিল না। গদীর উপর একটা ক্যাস-বাক্‌স ডালা ফেলা,—হয় ত খোলা। যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই রমেশ ডালাটা তুলিয়া ধরিল, এবং তেমনি করিয়া একটা দশটাকার নোট হাতের মুঠিতে চাপিয়া ধরিল।

পেয়েছি—।

হঠাৎ কে যেন পিছনে চীৎকার করিয়া উঠিল, চোর! চোর!

রমেশ চমকিয়া চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অথচ কে যেন তখনো বলিতেছে—চোর, চোর। সে সভয়ে চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই। তার মনে হইল, ঘরের কড়ি বরগা, থাম যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—চোর, চোর—

সে কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাক্‌সের ডালা তুলিয়া নোট রাখিতে গেল। কিন্তু কে যেন বলিল, রমেশ যে। কি মনে করে?

গোমস্তা ঘরে ঢুকিল। নোট রাখা হইল না।

রমেশ কহিল, হিসেবটা দেখ্‌ব ভেবেছিলাম। তা বেলা হয়ে গেছে। সে বাহির হইল।

সেই দগ্ধ পৃথিবীর পথে সে হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটিয়া চলিয়াছে। উপরে আকাশ চীৎকার করিয়া উঠে, চোর! চোর! পায়ের নীচে মা বসুমতী কাঁদিয়া বলে, চোর! চোর! হাতে নোট্‌টা যেন আগুনের হল্‌কা। জ্বলিতেছে।

কাছারী বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বলুক সবে চোর, জানুক পৃথিবী। কিন্তু সে চোর হইতে পারিবে না। ওদিকে আকাশ বাতাস চীৎকার করিয়া বলিবে—চোর, চোর, দত্তবাড়ীর ছেলে চোর। হরিদত্তের ছেলে চোর—চোর—এ সে সহিতে পারিবে না। সে টাকা ফিরাইয়া দিবে।

সে ফিরিল।

কে রমেশ নাকি?

ডাকিতেছিল, কাছারীর এক আমলা। সে কহিল, যাচ্ছে।

এস ত।

সে আসিল। কাছারীর দাওয়ায় উঠিতেই বাবু কহিলেন, কি হে, এসেও যে আসো না। ব্যাপার কি। জমীদার কি তোমাকে জমীগুলো ব্রহ্মোত্তর দিয়েছেন নাকি।—এমনি কথা।

রমেশ কহিল, খেতে পাইনে—

রামলাল তেওয়ারী পাশেই ছিল। পেটে খোঁচা দিয়া কহিল, ভুঁড়িটা ত বেশ বাঁধিয়েছ। কেবল খাজনার—রমেশ আর সহিল না, তেওয়ারীকে। কিন্তু তার আগেই তেওয়ারীর বজ্রমুষ্টিতে ক্ষুধা-জীর্ণ দেহ তার নুইয়া পড়িল। কাটা হাতে চাপ লাগিতেই ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। আর পড়িল,—দশ টাকার সেই নোট্‌টা।

তার পর কি যে হইল। নানা ধরণের, নানা রকমের গালাগালির মধ্যে সেই দশ টাকা খাজনার বকেয়া হিসাবে জমা হইয়া গেল। সে অবসন্নের মত বাহির হইয়া আসিল! সে চোর, চোর! চোর নাম ঘুচাইবার উপায় আর রহিল না। চোর!

কে ডাকিল, রমেশবাবু!

তার মনে হইল বলিতেছে, চোর! সে ফিরিল। রাগে নয়, দুঃখে নয়, কিসে তা সে বলিতে পারে না। কিন্তু সে ফিরিল। দেখিল পোষ্ট মাষ্টার বাবু।

রমেশ ফিরিয়া চাহিতেই পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, চিঠি আছে।

চিঠি?

রমেশ ফিরিল। আস্তে আস্তে ডাকঘরের সরকারী বেঞ্চে আসিয়া বসিল। চোখে পড়িল, অদূরের টেবিলে টাকার স্তূপ। স্তূপ? স্তূপ বৈ কি। সাহজীর কাছে না হইতে পারে, কিন্তু রমেশের কাছে টাকার স্তূপ। এক কেতা—খান আষ্টেক দশটাকার নোট ফিতা বাঁধা; কাঁচা টাকা—খুচরাও প্রায় পঞ্চাশ টাকা হইবে। মাষ্টার বাবু দিনের হিসাব মিল করিতে ব্যস্ত।

রমেশের চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল।

এ দিকে মাষ্টার বাবু একখানা পোষ্টকার্ড তার হাতে দিয়া বলিতেছেন, এসেছে আজ তিন দিন। পিওন নেই কি না। কবে যে—

এ সব রমেশের কানে আসিতেছিল না। পোষ্টকার্ডের

উপর চোখ বুলাইতেই তার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় চেতনা-রহিত হইয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের চোখ এড়াইল না। তিনি বলিলেন, কি খবর রমেশ বাবু? ভাল ত?

অস্বাভাবিক স্বরে রমেশ বলিয়া উঠিল, ভাল বৈ কি! জামাই, জামাই। কাল রওনা হ'য়েছে, আজ এতক্ষণ বাড়ী এসে পৌঁছেচে। জামাই—আর—আর ঘরে আমার একটু নূন পর্য্যন্ত নেই—ভাল খবর—বড় ভাল খবর—না মাষ্টার বাবু?

কতক্ষণ সে নিশ্চল নির্জীবের মত চুপ করিয়া রহিল। তার পর তেমনি বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, আর আমার বাড়ীর সামনে মতি সরকারের গোলায় হাজারো মণ ধান পচ্‌ছে—আমার যদি শক্তি থাক্‌ত, যদি—সে চুপ করিল।

এ ভাবের কথার জবাব নাই। মাষ্টার বাবু বলিলেন, বাড়ী যান। এক রকম ক'রে হ'য়ে যাবে। এ রোদে বেরিয়েছেন কেন? উচিত হয়নি।

বাড়ী? হা—হা—গিয়ে দেখ্‌ব, জামাই ক্ষুধায় অস্থির, জামাই,—আর এক মুঠো চাল নেই ঘরে। হা-হা-হা—বাড়ী!

রমেশের মনে হইল, সে বাড়ী যাইতে পারিবে না। এ দৃশ্য সে পারিবে না,—পারিবে না দেখিতে। না, পারিবে না। সে যাইবে না। কিন্তু, কিন্তু থাকিবেই বা কি করিয়া? বাড়ীতে উপোসী জামাই, আর সে পারিবে থাকিতে এখানে? তার মনে হইল এক যদি কেউ দাবী দিয়া জোর—হাঁ, জোর করিয়া রাখে, তবে হয়। কিন্তু কে আছে? যদি, যদি কেহ থাকিত! জানালার পথে মুক্ত আকাশে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর খুঁজিয়া সে দেখিল, কেহ নাই—নাই—

না—নাই—নাই—

ঝন্ ঝন্ ঝন্—

মাষ্টার বাবু টাকা বাজাইয়া দেখিতেছিলেন। ঝন্ ঝন্—মনে হইল, এই ত মিলিয়াছে, উপায় মিলিয়াছে, আশ্রয় মিলিয়াছে। দাবী দিয়া জোর করিয়া রাখিবার লোক মিলিয়াছে। কেহ না দেয় আশ্রয় রাজা দিবে। রাজা তাকে ফিরাইবে না, না। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, কেউ না থাকে রাজা আছে। সব শেষে রাজা রক্ষক, রাজা পালক। রাজা আশ্রয়দাতা!

বাঘের মত থাবা মেলিয়া সে টাকার টেবিলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাষ্টার বাবুকে এক ঘুসিতে ফেলিয়া দিয়া, সেই নোটের তাড়া লইয়া সে ছুটিল। ছুটিল থানার পথে। থানার পথে।

* * * *

সে নিশ্চিন্ত হইল। আশ্রয় মিলিল। রাজা দিলেন।

"শীতের শেষে—"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

(১)

শীতের শেষে ভীরুর মত
কে এলি তুই, বল্?
শিশির ফোঁটায় ঐ যে টোপায়
তোরি চোখের জল!
তুই এলি মোর কুঞ্জবনে
ফাল্গুনে আজ সঙ্গোপনে,
অম্‌নি ফুটে উঠ্‌লো আমার
ফুল-কলিদের দল!

(২)

ঘুমিয়ে ছিল আমার নিখিল
আঁধার কুয়াশায়
স্বপন মাঝে তোমায় পাবার
বিপুল দুরাশায়,
আজ ভোরে তার ঘুম ভাঙা'লে;
দখিন হাওয়া গন্ধ ঢালে,—
তোমায় হেরি কানন ঘেরি'
ফুলেরা চঞ্চল!

রুস্তমজী কাওয়াসজী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(১)

পূর্ব্বাভাষ

পারস্যের উত্তরাংশে নেহাবন্দের উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রে পারসিক (আধুনিক পার্শী) সাসানীয় বংশের (২১৬ – ৬৫১ খৃঃ অঃ) শেষ রাজা ইয়াজদেগার্ডের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল (৬৪১ খৃঃ অঃ) তাহার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে পারস্য পারসিকগণের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।* অত্যাচার এড়াইবার জন্য বহু পারসিক বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে রাজি হইল না তাহারা পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া পারস্যের উত্তর-পূর্ব্বভাগে খোরাসান অঞ্চলে আশ্রয় লইল। কিছুকাল পরে সেখানেও মুসলমানদের উপদ্রব আরম্ভ হইলে পারসিকগণ দক্ষিণগামী হইয়া পারস্যোপসাগরে অর্মাজ দ্বীপে, এবং তথা হইতে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে জাহাজযোগে গুজরাটের দক্ষিণবর্ত্তী ক্যাম্বে উপসাগরস্থ দিউ বন্দরে পরিবার-পরিজনসহ আসিয়া উপনীত হয়। এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া প্রায় ৭১৬ খৃঃ অব্দে দমনের পচিঁশ মাইল দক্ষিণে সঞ্জন বন্দরে তাহারা সদলবলে গমন করে। তথাকার হিন্দু রাজা ইয়াদি রাণা পারসিকগণের মুখে তাহাদের বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে স্বরাজ্যে বাসস্থাপন করিতে অনুমতি দিলেন। এদিকে নূতন নূতন পারসিক দলও পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া স্বধর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিন শত বৎসরের মধ্যে গুজরাট ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সুরাট, আহ্‌মাদাবাদ, নাভসারি প্রভৃতি অঞ্চলে তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। স্ব-ভাষা পহ্লবীর পরিবর্ত্তে পারসিকগণ গুজরাটী ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মে পারসিক রহিল বটে, কিন্তু একত্র বসবাস হেতু গুর্জ্জরবাসী হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল। ব্যবসা ও কৃষিকর্ম্মই জীবিকার প্রধান অবলম্বন হইল। পারসিকগণ বোম্বাই শহরে কখন বসতি বিস্তার করে তাহা সঠিক জানিতে পারি নাই। ইউরোপীয় পর্য্যটক ডাঃ ফ্রায়ার ইং ১৬৭১ সনে বোম্বাই নগরীতে মৃত্যু-মন্দির (Tower of Silence) দেখিতে পান। সুতরাং ঐ সনের পূর্ব্বেই পারসিকদের অনেকেই তথায় বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল।†

রুস্তমজী কাওয়াসজীর পূর্ব্বপুরুষ বানাজী লিমজী সুরাটের সন্নিকট জন্মভূমি ভগবাদণ্ডি হইতে ১৬৯০ সনে বোম্বাই গমন করেন। তিনি সেখানে কিছুকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি করিয়া স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করেন। বানাজী লিমজীর উদ্যোগেই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বোম্বাই অঞ্চলের ব্যবসার সূত্রপাত হয়। তিনি ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। লোকহিতেও তিনি প্রচুর দান করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের দুর্গের সন্নিকট 'আরাদান' বা অগ্নি-মন্দির তাঁহারই কীর্ত্তি। লিমজীর পৌত্র দাদাভাই বেরামজী পারসিকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন। বাংলার তৎকালীন গবর্ণর জন কার্টিয়ারের (১৭৬৯-১৭৭২) সঙ্গে তাঁহার খুব হৃদ্যতা হইয়াছিল। তিনি কার্টিয়ারের নামে একখানা জাহাজেরও নামকরণ করিয়াছিলেন।†

---

* *Encyclopœdia Britanica.* "Persia" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* *History of the Parsis.* By Dosabhai Framji Karaka. 1884. Vol. I Chapter I.

† Ibid. Vol. II. PP. 54-55.

রুস্তমজী কাওয়াসজীর পিতা কাওয়াসজী বানাজী বোম্বাই শহরের একজন বিশিষ্ট অধিবাসী এবং নামজাদা ব্যবসায়ী ছিলেন। ‡ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্যর হেনরি ইভান্ এ কটন লিখিয়াছেন,—কাওয়াসজী বানাজী কলিকাতাস্থ রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে আদৌ প্রমাণ নাই। কারণ, সমসাময়িক 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' মাসিকে (ডিসেম্বর, ১৮৩৯) প্রকাশিত "রুস্তমজী কাওয়াসজী" শীর্ষক প্রবন্ধে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—"The Firm [Rustomjee Cowasjee & Co.] consists of himself [Rustomjee Cowasjee] and his second son;" অর্থাৎ রুস্তমজী ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রই এই কোম্পানীর মালিক। ১৮৩৫ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের 'কলিকাতা কুরিয়র' নামক ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত 'কাওয়াসজী ফেমিলি' নামে একখানা জাহাজের ভাসান-উৎসবের বিবরণে রুস্তমজী কাওয়াসজীকেই ইহার প্রধান মালিক বলা হইয়াছে; পিতা কাওয়াসজী বানাজীর এস্থলে নামোল্লেখ মাত্র নাই।

রুস্তমজী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা তিন ভ্রাতা—ফ্রেমজী কাওয়াসজী বানাজী, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও খার্সেদজী কাওয়াসজী। * ফ্রেমজী কাওয়াসজী ১৭৯০ সালে বোম্বাই শহরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এবং পাঁচ বৎসর পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট নিযুক্ত হন। বোম্বাই শহরে ব্যবসায় চলিলেও তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কৃষিকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী বনাকীর্ণ পভাই তাঁহার চেষ্টা-যত্নে ফলপ্রসূ ও মনুষ্যবাসের যোগ্য হইয়াছিল। রাস্তা নির্ম্মাণ, দীর্ঘিকা খনন প্রভৃতি ছাড়া এমন কতকগুলি বিষয়ের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন যাহা দ্বারা দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ফ্রেমজী পশ্চিম ভারত শিক্ষা-সংসদের সভ্য থাকিয়া এবং বোম্বাইয়ের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে বহু অর্থ দান করিয়া শিক্ষা-প্রসারে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। সে-যুগের ইংরেজি দৈনিক বম্বে টাইম্‌স (ইদানীং টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া) যাঁহাদের অর্থে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ফ্রেমজী কাওয়াসজীও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

ফ্রেমজীর কীর্ত্তিগাথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার দৈনিক সম্বাদ ভাস্কর (২৭এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১) লিখিয়াছিলেন,—

"বোম্বাই দেশীয় সমাচারে বেদ্ত হয় কলিকাতা নগরীর সুবিখ্যাত পারসী বণিক রোস্তমজী কাউসজী মহাশয়ের অগ্রজ ফ্রেমজী কাউসজী মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকগত হইয়াছেন মৃত মহাশয় যদিচ এইক্ষণে অধিক ধনসম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই তথাপি বিমল যশঃ রাখিয়া গিয়াছেন এবং তৎবিয়োগ জন্য বোম্বাইস্থ বহুল লোক বিশেষ পরিতাপিত হইয়াছেন তদ্ধেতু এই যে তিনি পারসী জাতীয় লোকেরদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বিস্তারিত রূপে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া তজ্জাতির উন্নতির পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন এবং এতদ্ভিন্ন তাঁহার সৌভাগ্য সময়ে তিনি দেশহিতজনক নানা ব্যাপারে সহায়তা করিয়া কীর্ত্তি পতাকা জগন্মণ্ডলে সুবিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এই মৃত ব্যক্তির চারি সহোদরের মধ্যে এইক্ষণে কেবল রোস্তমজী মহাশয় জীবিত রহিলেন তিনিও পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যোন্নত দশায় সময় সম্বরণ করিতেছেন কিন্তু তন্মধ্যম ভ্রাতা লিমজীর সন্তানেরা অদ্যাবধি বোম্বাই নগরীর প্রধান ধনি বলিয়া বিখ্যাত আছেন।"

শিক্ষানবীশ রুস্তমজী কাওয়াসজী

ইণ্ডিয়ান রিভিউ (ডিসেম্বর, ১৮৩৯) মাসিকে প্রকাশিত বিবরণ হইতে রুস্তমজীর ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী সম্বন্ধে মোটামুটি কতকটা জানিতে পারি। শৈশবেই ব্যবসা-কর্ম্ম শিখিয়া ১৮০৬ সনে জ্যেষ্ঠ মাসে ফ্রেমজী কাওয়াসজীর সঙ্গে তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮১২ সনে রুস্তমজী জাহাজযোগে কলিকাতায় আগমন করেন এবং সেখান

‡ *Calcutta Old and New*. 1907. P. 766.

* এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়—

(১) 'ফ্রেমজীর দুই ভাই ছিল, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও খার্সেদজী কাওয়াসজী'।—*History of the Parsis*. By Dosabhai Framji Karaka. 1884. Vol. II. p. 122.

(২) ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে রুস্তমজীরা ছিলেন সাত ভাই—The *National Magazine* for April, 1908. P. 151

(৩) সম্বাদ ভাস্কর (২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫১) বলেন, 'ফ্রেমজী কাওয়াসজীর চারি সহোদর ছিলেন'।

হইতে মান্দ্রাজ, সিংহল হইয়া আবার বোম্বাই ফিরিয়া যান। তিনি ১৮১৩ সনে দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আসেন, এবং এই বৎসর চীনদেশেও গমন করেন। সেখানে ক্যাণ্টন সহরে তিন বৎসর থাকিয়া ১৮১৭ সনে পুনরায় বোম্বাই যান। রুস্তমজী দ্বিতীয় বার চীন যাইয়া ১৮২০ সন পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন। ঐ সনেই কলিকাতায় আসিয়া তিনি ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, সিংহল, চীন প্রভৃতি স্থানে বার-বার যাতায়াতের ফলে রুস্তমজী এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের রুচি, ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি সম্যক অবগত হইয়া ব্যবসায়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অধিগত করিয়া লইয়াছিলেন। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, "তিনি [রুস্তমজী কাওয়াসজী] পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে বিষয় সম্পত্তি কিছুই লাভ করেন নাই।" * রুস্তমজী শৈশবাবধিই যে তৎপরতার সহিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন ইহা তাহার একটি কারণ সন্দেহ নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রে রুস্তমজী কাওয়াসজী

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতায় স্থায়িভাবে ব্যবসায় সুরু করিয়া দেশী-বিদেশী সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ক্রুটেণ্ডেন ম্যাকিনন কোম্পানীর বেনিয়ান নিযুক্ত হন। এই সময় স্বনামধন্য রসময় দত্ত তাঁহার অধীনে ঐ কোম্পানীতে গুদাম সরকারের কর্ম্ম করিতেন। * অল্পকাল মধ্যেই ব্যবসায়-ক্ষেত্রে রুস্তমজীর এরূপ প্রতিপত্তি হইল যে, সে-যুগের বীমা কোম্পানীগুলি তাঁহার সহায়তা লাভে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের ২৪ এ জুন ইউনিয়ন বীমা কোম্পানীর এক সভায় পাঁচ জন সভ্য লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। কোম্পানী হইতে নদী বীমায় যে-সব পলিসি বাহির হইত, তাহাতে কমিটির পাঁচ জন সভ্যের অন্ততঃ তিন জনের স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন হইত। রুস্তমজী এই কমিটির অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। † আমরা তৎকালীন কলিকাতায় বীমা কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নামের উল্লেখ পাই। রুস্তমজী নিউ অরিয়েণ্টাল জীবন-বীমা কোম্পানীর ‡ এবং ইউনিভার্সাল বীমা কোম্পানীর ভারতীয় শাখার § স্বত্বাধিকারী ও ১৮৩৪ সনের ১লা জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত সান লাইফ আপিস নামক আর একটা বীমা কোম্পানীর অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আমলে কয়েক বৎসর ধরিয়া শেষোক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণকে অংশ-প্রতি পাঁচশত টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৩৮ সনের ৩১এ জানুয়ারি কোম্পানীর বার্ষিক অধিবেশনে রুস্তমজী যাহাতে আরও ছয় মাস ইহাকে সাহায্য করেন এইজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। ¶

রুস্তমজী কাওয়াসজী ইংরেজের সহযোগে 'রুস্তমজী টার্ণার এণ্ড কো' নাম দিয়া এক যৌথ কারবার খুলিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সনের ৪ঠা অক্টোবর দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজ অংশীদার লইয়া 'কার ঠাকুর এণ্ড কো' নামে এক কোম্পানী খুলিলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এক পত্রে তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করেন যে, ইংরেজ ও ভারতবাসী মিলিয়া যৌথ কারবারে তিনিই অগ্রণী হইয়াছেন। ১৮৩৫ সনের ৮ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা কুরিয়ারে প্রকাশিত 'পি-জি-এইচ' স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্রে ইহার প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল। পত্র লেখক বলেন,—'কার ঠাকুর এণ্ড কো' প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বনামধন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী 'রুস্তমজী টার্ণার এণ্ড কো' নামে এইরূপ একটি যৌথ কারবার খুলেন, এবং তিনি স্বয়ং ইহার অধ্যক্ষ হন। কুরিয়র-সম্পাদকও এই প্রতিবাদের সমর্থন করিয়া বলেন,—"দেশী-বিদেশী মিলিয়া যৌথ কারবার পরিচালনায় পথপ্রদর্শক আমাদের পার্শী বন্ধু রুস্তমজী কাওয়াসজীই। তবে হিন্দুদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখান।" *

১৮৩৫ সনের ২৬এ মে কলিকাতা কুরিয়র পত্রে বঙ্গীয় বাণিজ্য সংসদের (Bengal Chamber of Commerce) পরিচালনা সমিতি গঠনের যে সংবাদ বাহির হয় তাহাতেও

* The *National Magazine* for April 1908-p. 151.

* *Ibid*, p. 152.

† The *India Gazette*, July 7, 1828. Advertisement.

‡ The *Calcutta Courier*, May 21, 1835.

§ *Ibid*. May 27, 1835.

¶ *Ibid*. February 1 1838.

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট অংশে ইহার সম্পাদক মহাশয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। (পৃঃ ৩৩২)

ইহার একমাত্র ভারতীয় সদস্য হিসাবে রুস্তমজী কাওয়াসজীর উল্লেখ পাই। পরিচালনা সমিতি দুইটি অন্তঃকমিটিতে বিভক্ত ছিল,—(১) কর্ম্ম পরিচালনা কমিটি (Committee of Management and correspondence) এবং (২) সালিশী কমিটি (Committee of Arbitration)। রুস্তমজী ছিলেন কর্ম্ম পরিচালনা কমিটির অন্যতম সভ্য।

১৮৩৪ সন পর্য্যন্ত আমেরিকার বোষ্টন হইতে বরফ আমদানী করিয়া কলিকাতাবাসীদের বরফের অভাব দূর করা হইত। বরফ তখন দুষ্প্রাপ্য ও ব্যয়বহুল ছিল। লঙ্গেভিল ক্লার্ক নামক জনৈক ইংরেজের চেষ্টায় ১৮৩৪ সনে কলিকাতা টাউন হলে এক সভার অধিবেশনে বরফের কারখানা স্থাপন স্থির হয়। সভার অধিবেশনের তিন দিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অনুষ্ঠাতাদের ব্যাঙ্কশাল উদ্যানের এক অংশ ইজারা দেন, এবং কলিকাতার অধিবাসীরা পঁচিশ হাজার টাকার অংশ ক্রয় করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজীও একজন অংশীদার ছিলেন। *

রুস্তমজী কলিকাতা ডকিং কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি প্রায় ছয় লক্ষ টাকা মূলধনে খিদিরপুর ও সালকিয়া ডক ক্রয় করেন। † এই কোম্পানী খুব সম্ভব ১৮৩৭ সনে স্থাপিত হয়। কারণ, ১৮৩৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি সেক্রেটারিরূপে রুস্তমজী ডকিং কোম্পানীর প্রথম বার্ষিক সভা আহ্বান করেন। ‡ রুস্তমজীর দ্বিতীয় পুত্র মানকজী রুস্তমজী ইহার একজন অংশীদার ছিলেন। রুস্তমজী কোম্পানীর নিকট হইতে মাসিক দু' হাজার টাকা বেতন লইতেন। তাঁহার আমলে কোম্পানীর কার্য্য দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহিত হইত। ১৮৪৩ সনের ২৬এ অক্টোবরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত ডকিং কোম্পানীর ত্রয়োদশ অর্দ্ধ বার্ষিক সভার বিবরণে রুস্তমজীর কৃতিত্বের নিদর্শন পাই। বিবরণের তাৎপর্য্য নিম্নে দিলাম,—

সেক্রেটারি রুস্তমজী কাওয়াসজীর আপিসে ডকিং কোম্পানীর ত্রয়োদশ অর্দ্ধ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতাস্থ এই কোম্পানীর খুবই উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহার মূলধন প্রায় ছয় লক্ষ। শুনা যায়, সেক্রেটারিগণকে মাসে দু' হাজার টাকা হারে বেতন দিয়াও কোম্পানী অংশীদারগণকে শতকরা ষোল টাকা লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। সভায় আট জন উপস্থিত ছিলেন। হিসাবপত্র খুব সন্তোষজনক—এই মর্ম্মে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতা, কাশীপুর ঘুসুরি প্রভৃতি স্থানে জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। * ১৮৩৮ সনের ২৭এ মার্চ্চ কলিকাতায় ভূম্যধিকারী সভার প্রথম অধিবেশন হয়। সভার উদ্দেশ্য—সরকারকে 'যেমন সৌদাগরী সভায় বাণিজ্যবিষয়ক পত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে সেইরূপ এ সভায় সেক্রেটারি দ্বারা ভূম্যধিকারিগণের সাধারণ উপকারার্থ পত্রাদি প্রেরণ হয়।'—১৮৩৮ সনের ২৮এ মে রুস্তমজী এবং ২৩এ জুন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মানকজী রুস্তমজী ভূম্যধিকারী সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এবং কোথাও কোথাও পরেও ‡ ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে ব্যক্তিগতভাবে ঘরে ঘরে এবং সংঘবদ্ধ হইয়া প্রচুর লবণ উৎপন্ন করা হইত। এই সময়েই আবার বিলাতী লিভরপুলি লবণও ক্রমশঃ দেশের বাজার ছাইয়া ফেলিতে থাকে। বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি

* *Calcutta Old and New.* By (Sir) Henry Evan A. Catton. 1907.

১৮৭—১৯০ পৃষ্ঠায় বরফ গৃহ (Ice House) সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। কলিকাতা কুরিয়রে (২রা নবেম্বর, ১৮৩৫) বরফ গৃহের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বঙ্গের লাট এই সর্ত্তে ব্যাঙ্কশাল উদ্যানের এক অংশ ইজারা দেন যে, চারি মাসের নোটিশে বরফ গৃহ তুলিয়া লইতে হইবে। তবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে উঠাইয়া দিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও বরফ গৃহ—উভয়ের মনোনীত লোকের নির্দ্ধারণ অনুসারে গবর্ণমেণ্টকে গৃহের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

† *Famous Parsis.* pp. 22-23

‡ The *Calcutta Courier*, January 20, 1834. Advertisement.

* *The Indian Review* for December 1839. p. 750. Calcutta.

† সমাচার দর্পণ, ৯জুন, ১৮৩৮।

‡ "মান্দ্রাজের অন্তর্গত করমেণ্ডল কোষ্ট নামক স্থানে ৭১৩২৬ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে ঝড়ে যদি হানি না করিত তবে আরও ১০০০০ হাজার মণ অধিক হইত।"—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। ১০ বৈশাখ, ১২৪৭ (২১ এপ্রিল, ১৮৬৫)।

নামে লবণ তৈরি করিবার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে সাহেবদের পরিচালনায় এক কারখানা খোলা হইলে রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহার একজন প্রধান অংশীদার হন। সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে কর্ম্মচারীরা টিকিতে না পারায় এবং প্রচুর বারিপাতে লক্ষাধিক টাকা নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪১ সনের ২৬এ জুন কলিকাতা টাউনহলে অংশীদারদের সভায় কারবার গুটাইবার প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। * কোম্পানীর হিসাব ও লেনদেন পরীক্ষা এবং সম্পত্তি বাটরার রিপোর্ট করিবার ভার যে দুই জন অংশীদারের উপর পড়ে রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহাদের একজন। †

রুস্তমজী ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ‡

১৮৪২ সনের ১৬ই জুলাই রুস্তমজী কাওয়াসজী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ২১এ জুলাই তারিখের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ,—

"গত শনিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এক সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন—মেসার্স জন এ্যালান, লঙ্গেভিল ক্লার্ক, জন বেকউইথ, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও বিশ্বনাথ মতিলাল।"

১৮৪৮ সনে ব্যাঙ্কের পতন পর্য্যন্ত রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইহা রক্ষার্থ তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সফলকাম না হওয়ায় তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

জাহাজের মালিক রুস্তমজী কাওয়াসজী

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে ভারতবাসী পরিচালিত বহুসংখ্যক জাহাজ কোম্পানী ছিল। কলিকাতায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী এবং রুস্তমজী কাওয়াসজীর রুস্তমজী কাওয়াসজী এণ্ড কোম্পানী নামক দুইটি জাহাজ কোম্পানী সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী এণ্ড কোম্পানী কত সনে স্থাপিত হয় তাহা জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৩৫ সনের ৭ই ডিসেম্বরের কলিকাতা কুরিয়রে প্রকাশিত কাওয়াসজী ফেমিলি নামক জাহাজের ভাসান-উৎসবের বিবরণে ইহার প্রধান মালিকরূপে রুস্তমজীর উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং রুস্তমজী যে এই সময় হইতেই জাহাজের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাহারও মতে রুস্তমজী চল্লিশখানা * কাহারও মতে ত্রিশখানা † জাহাজের মালিক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে একুশখানা জাহাজের নাম ৺প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার "রুস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনী" শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর জাহাজগুলি কলিকাতা, মান্দ্রাজ, সিংহল, বোম্বাই এবং সিঙ্গাপুর, চীন, মেলবোর্ণ প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যখণ্ডে ব্যবসায় কার্য্যে খাটান হইত। §

সে-সময়ে আধা খৃষ্টিয়ানী আধা পৌত্তলিকভাবে জাহাজ ভাসান উৎসব খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইত। * সমকালিক সংবাদপত্র পাঠে রুস্তমজীর একাধিক জাহাজ ভাসানের বিবরণ জানিতে পারি। এই সকল বিবরণ হইতে সেকালের জাহাজ, জাহাজের নির্ম্মাতা, এবং দেশী-বিদেশীর সামাজিক মেলামেশা, আমোদ-প্রমোদ ও উৎসবাদির একটা চিত্র পাওয়া যায়।

* বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর সেক্রেটারি কিন্তু বলেন যে, এইরূপ বিপৎপাত সত্ত্বেও তিনি এ বৎসর ৫০।৬০ হাজার মণ লবণ তৈরি করিতে পারিবেন। *The Friend of India.* October 14, 1841.

† *The Friend of India.* July 1, 1841. Proceedings of the Salt Meeting.

‡ *The Calcutta Courier*, January 17, 1838. Advertisement.

* "Baboo Rustomji...actually built a dock and sailed 40 ships at a time under his own ownership." *Famous Parsis.* Messrs. G. A. Natesan & Co. P. 23.

† *Calcutta Old and New.* By H. E. A. Cotton. P. 766. "The firm [Rustomjee Cowasjee & Co]...owned a fleet of not less than Thirty opium clippers."

‡ *The National Magazine* for April. 1908. P. 152. জাহাজগুলির নাম :—স্কুনার কাপা, জোভানা ফর্ণা, ব্রিগ ব্ল্যাক জোক, বার্ক সিক্স, রুস্তমজী কাওয়াসজী, কাওয়াসজী ফেমিলি, এরুয়াদ, স্কুনার পার্ল, ব্রিগ ফরসেয়ার, ফ্রেমজী কাওয়াসজী, মারমেড, খার্সেদজী কাওয়াসজী, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ, ব্রিগ প্রেমাভেরা, ব্রিগ লিনেট, বার্ক এ্যাগনেস, ব্রিগ পিয়ল, বার্ক টার্ণেট, স্কুনার ডেভিল, ব্রেমার, ফোর্থ।

§ *The Indian Review* for December, 1839. p. 750.

* *Chow-Chow.* By Lady Falkland, (who came to India in 1848). Chapter 1. p. 15.

'রুস্তমজী কাওয়াসজী' নামে রুস্তমজীর আর একখানা জাহাজ প্রথম যাত্রাতেই সেকালের সেব চেয়ে দ্রুতগামী ক্লিপার স্যর এড্‌ওয়ার্ড রায়ানকে হারাইয়া দিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল,—

'রুস্তমজী কাওয়াসজী, যাহা গত জুলাই মাসে (১৮৩৯) ভাসান হইয়াছে, ক্ষিপ্রতার জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।...ইহা সিঙ্গাপুর হইতে রওনা হইয়া ষষ্ঠ দিনেই এ-যুগের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজ স্যর এডওয়ার্ড রায়ানকে অতিক্রম করিয়া এগার দিনে মাকাও † পৌঁছিয়াছে। ‡

রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর জাহাজগুলি যে শুধু ব্যবসাতেই খাটান হইত তাহা নহে, দ্রুতগামী বলিয়া সুনাম থাকায় ১৮৩৯ সন হইতে চীন-অভিযানে ব্রিটিশ সরকার ইহাদের অন্যূন পনরখানা ভাড়া করিয়াছিলেন।* সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার কয়েকখানির উল্লেখ আছে। † রুস্তমজীর 'গোলকোণ্ডা' নামে একখানা জাহাজ চীন যুদ্ধে নষ্ট হয়।

রুস্তমজীর কোন কোন জাহাজে ডাক চলাচল করিত,—

"কাওয়াসজী ফেমিলি চীন হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ৬ই জানুয়ারি (১৮৩৮) পর্য্যন্ত ক্যাণ্টনের সব চিঠিপত্র আনয়ন করিয়াছে। ‡"

রুস্তমজী কাওয়াসজী কোম্পানীর 'ফ্রেমজী কাওয়াসজী', 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' প্রভৃতি কোন কোন জাহাজ ভারতবর্ষের বাহিরে মরিসস দ্বীপে শ্রমিক প্রেরণেও নিয়োজিত হইত! §

বাষ্পীয় পোত প্রবর্ত্তনে রুস্তমজী কাওয়াসজী

ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাহিরে বাষ্পীয় পোতে ডাক-চলাচল ও লোক-যাতায়াত প্রচেষ্টায় রুস্তমজীর কৃতিত্ব কম নহে। সে-যুগে ইংলণ্ড হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়া এবং সুয়েজ হইতে কলিকাতা ও প্রাচ্য খণ্ডের নানা বন্দরে বাষ্পীয় পোতে ডাক-চলাচল প্রবর্ত্তনের জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। বিলাতে কম্‌প্রিহেন্‌সিভ স্কীম কমিটি নাম দিয়া এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি স্থাপিত হয়। সুয়েজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ডাক-চালাইবার জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল ও রামকমল সেন এবং টার্টন প্রমুখ নয়জন ইংরেজ লইয়া 'প্রিকার্সর স্কীম কমিটি' নামে একটি কোম্পানী গঠিত হয়। * ১৮৪২ সনের মার্চ্চ মাসে এই কোম্পানীর আট শত অংশের মধ্যে মাত্র দুই শত চৌত্রিশটি বিক্রী হইতে বাকি ছিল। এমন সময়, এক আকস্মিক কারণে প্রথম কোম্পানীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায় এবং দ্বিতীয়টির কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। কি কারণে ইহা সম্ভব হইল তাহা নিম্নের উক্তি হইতে সম্যক বুঝা যাইবে,—

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সহজে ডাক-চলাচল ও যাতায়াতের জন্য কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও সিংহলের লোকেরা জাহাজ কোম্পানী খুলিবার উদ্দেশ্যে বিস্তর টাকা চাঁদা দিয়াছিল। লণ্ডনে স্থাপিত একটি কোম্পানী [Comprehensive Scheme Committee] সুয়েজ যোজকের উভয় পার্শ্বে এবং কলিকাতার একটি কোম্পানী [Precursor Scheme Committee] শুধু ভারতবর্ষের দিকের সমুদ্রগুলিতে জাহাজ চালাইবার সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগ-আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বিলাতের গভর্ণমেণ্ট হইতে আলেকজাণ্ড্রিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ডাক চালাইবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়া বিলাতের লোকেরা পেনিনসুলার এণ্ড অরিয়েণ্টাল নামে এক কোম্পানী খুলেন। এই কোম্পানী অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষের দিকের সমুদ্রগুলিতেও ডাকসমেত জাহাজ চালাইবার চমৎকার সনন্দ লাভ করেন। অতঃপর, সর্ব্বত্র জাহাজে ডাক লইয়া যাইবার পূর্ব্বে এই বিলাতী ডাক মাদ্রাজ ও সিংহল হইয়া সরাসরি কলিকাতায় লইয়া যাইবে, ইহার ডিরেক্টরগণ স্পষ্ট ভাষায় এই অভিপ্রায় প্রকাশ

† পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ, ক্যাণ্টন নদীর মুখে অবস্থিত। সেকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল।

‡ *The Friend of India*, December 19, 1839.

* *Calcutta Old and New*. 1907. P. 766.

† *The Friend of India*. July, 1840.

‡ *The Calcutta Courier*, February 15, 1838.

§ *The Friend of India*. March 9, 1843 & *The Eastern Star*, February, 20.

* *The Calcutta Courier*. November 25, 1839. The precursor Association.

করায় লণ্ডন ও কলিকাতার কোম্পানী দুইটি তাঁহাদের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন এবং লণ্ডন কোম্পানীর অংশীদারগণ অনেকেই পেনিন্‌সুলার এণ্ড অরিয়েণ্টাল কোম্পানীতে অংশগুলি স্থানান্তরিত করেন। *

গঙ্গার এপার-ওপার যাতায়াতের জন্য ষ্টীম ফেরি ব্রিজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিরূপে কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য নয় জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। †

নদীমাতৃক বাংলায় ও বাংলার বাহিরে সর্ব্বত্র ষ্টীমার-যোগে গমনাগমনের সুবন্দোবস্তের জন্য ১৮৪৪ সনের ২৩এ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) কলিকাতা টাউনহলে ত্রিশজন দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য লোক লইয়া এক সভার অধিবেশন হয়। কোম্পানীর উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপায় অবলম্বনের এবং অনুষ্ঠান-পত্র গঠনের ভার এই সভা দ্বারা মনোনীত এক অস্থায়ী পরিচালক কমিটির (Board of Directors) উপর পড়ে। দশ জন সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হয় এবং বাবু রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। ‡ ১৮৪৪ সনের ৮ই মে (বুধবার) কলিকাতা টাউনহলের সভায় অস্থায়ী কমিটি কর্ত্তৃক গঠিত অনুষ্ঠান-পত্র পাশ করা হয়। কোম্পানীর নাম হইল ইণ্ডিয়ান জেনরল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী। সভায় প্রকাশ পায় যে, কোম্পানীর অংশসমূহের মধ্যে ১,১৪৬টা অর্থাৎ ¾ ভাগ ক্রয়ের জন্য আবেদন ইতিমধ্যেই লব্ধ হইয়াছে। এই সভায় কোম্পানীর স্থায়ী পরিচালক কমিটি নিযুক্ত হয়। যাঁহাদের লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিল, রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহাদের অন্যতম ও একমাত্র ভারতীয়। §

বদ্যোৎসাহী রুস্তমজী কাওয়াসজী

উইলিয়ম উইলবারফোর্স বার্ড ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাটরূপে দাসপ্রথা নিবারণ (১৮৪৪), এবং শিক্ষা প্রচার কল্পে নানা প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতবাসী আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত-বিদায় স্মরণীয় করিবার জন্য ১৮৪৪ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) কলিকাতা টাউনহলের জনসভায় তাঁহার প্রিয় কার্য্য শিক্ষায় উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এগার জন দেশী বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া 'বার্ড স্মলারশিপ টেষ্টিমনিয়াল কমিটি' গঠিত হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন।* তিনি কমিটির পরবর্ত্তী অধিবেশনে যোগদান করি। ইহার কার্য্যের সহায়তা করেন। এই অধিবেশনে চাঁদার খাতা বিলি করিবার এবং আদায়ী টাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা দিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। †

দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের জন্য হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে সি. এইচ. ক্যামেরন ও জে. ই. লায়াল বিশেষ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কলেজ-মণ্ডপে এক সভায় (৯ই অক্টোবর, ১৮৪৪) অরুণচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বড়লাট স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জের হস্ত হইতে এই পদক গ্রহণ করেন। যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী একজন। ‡

১৮৪৫ সনের ২৭এ মার্চ্চ মেডিকেল কলেজের বাৎসরিক সভায় স্যর হেনরি হার্ডিং ছাত্রগণকে উপাধি, বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। §

পরবর্ত্তী বৎসর বাৎসরিক সভায় রুস্তমজী কাওয়াসজী কলেজের সফলকাম ছাত্রদের স্বর্ণ-পদক দিয়াছিলেন। সম্বাদ ভাস্কর (৭ই এপ্রিল, ১৮৪৬) লেখেন,—

"রুস্তমজী কাওয়াসজির গুণের কথা লেখা অধিক, তাঁহার গুণ কলিকাতার বাহির রাস্তায় জলপ্রণালীতেই নগরের মালাস্বরূপ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ঐ বাবু আরও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, বিশেষতঃ সাধারণের বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য মেডিকেল কলেজে স্বর্ণ মেডেল দিলেন।

* The *Friend of India*. December 14, 1843. Proceedings of the Steam Memorial Meeting.

† *Ibid*. August 4, 1842, & Bengal Hurkaru, August 3.

‡ *Ibid*. February 29, 1844.

§ *Ibid*. May 6, 1844.

* *The Friend of India*. September 19, 1844.

† *Ibid*. September 26, 1844.

‡ *Ibid*. October 17, 1844.

§ *Ibid*. April 3 1

অতএব এমৎ সৎস্বভাব মনুষ্য অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন।”

দ্বারকনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ১৮৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে স্যর জন পিটর গ্রাণ্টের নেতৃত্বে কলিকাতা টাউনহলে এক জনসভা হয়। সভার ধার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রধানটি এই,—লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে সাধারণ শিক্ষা বা কারু শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র পাঠাইবার উদ্দেশ্যে ‘দ্বারকানাথ ঠাকুর এন্‌ডাউমেণ্ট ফণ্ড’ নামে এক ভাণ্ডার খোলা হইবে। সরকারী বেসরকারী কয়েকজন ইহার ট্রাষ্টী নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, রুস্তমজী কাওয়াসজাও অন্যতম ট্রাষ্টী নির্ব্বাচিত হন। *

সাধারণ বিদ্যা ছাড়া অর্থকরী বিদ্যার প্রচারেও রুস্তমজী কাওয়াসজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। উইলিয়ম কেরি প্রতিষ্ঠিত কৃষি ও উদ্যান-রচনা সমিতি (Agricultural and Horticultural Society) দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃষি শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষে অনেক স্থলে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ সালে এই সমিতির সঙ্গে রুস্তমজীর যোগসাধন হয়। তিনি ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। † সমিতিতে রুস্তমজীর দানও ছিল যথেষ্ট। ১৮৪৫ সনের ২০এ নবেম্বর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ,—

“কৃষি সমিতির গত অধিবেশনে জানান হয় যে, মেটকাফ হল নির্ম্মাণে যে ঋণ হইয়াছে অংশমত তাহা পরিশোধ করিবার জন্য সমিতির সভ্য রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ও বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রত্যেকে এক শত টাকা এবং ডাঃ হফ্‌নেগ্‌ল ও রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রত্যেকে দুই বৎসরের জন্য বিনা সুদে পাঁচ শত টাকা আগাম দিতে সম্মত হইয়াছেন।”

৺প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,—‘রুস্তমজী সমিতিকে হাজার টাকা ধার দেন এবং পরে ইহা সমিতিকে দান করেন।’ ‡

৺প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন,—‘রুস্তমজী কাওয়াসজী ১৮৪৮ সনে বঙ্গের এশিয়াটিক সোসৈটিতে যোগদান করেন।’ * বস্তুতঃ রুস্তমজী ১৮৪৪ সন হইতেই যে সোসাইটির সভ্য ছিলেন তাহা ইহার বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে। ১৮৪৮ সন পর্য্যন্ত রুস্তমজী ইহার বিশিষ্ট চাঁদাদাতা সভ্য ছিলেন। রুস্তমজীর পুত্র মানকজী রুস্তমজী ১৮৪৬ সনে সোসাইটির সভ্য হন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুস্তমজী একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলে পিতা-পুত্র উভয়েই সোসাইটির সভ্য পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। †

ভারতবর্ষের অস্থায়ী গবর্ণর জেনরল স্যর চার্ল্‌স মেটকাফ (১৮৩৫—১৮৩৬) মুদ্রাযন্ত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করিলে কলিকাতবাসী দেশী-বিদেশী প্রধানগণ তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য ‘মেটকাফ লাইব্রেরী’ নামে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের সংকল্প করেন। যাঁহারা গ্রন্থাগার স্থাপনে সর্ব্বপ্রথম অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী একজন। রুস্তমজী মেটকাফ লাইব্রেরিতে ২০০৲ দুই শত টাকা দান করেন। ‡

সভা-সমিতিতে রুস্তমজী কাওয়াসজী

সাধারণের হিতার্থ অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে রুস্তমজী কাওয়াসজী সাগ্রহে যোগদান করিতেন। তিনি স্বদেশের স্বার্থকেই আমরণ বড় করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত উপস্থিত হইলে তিনি শাসিতের পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। তাই বলিয়া রুস্তমজী বিদেশীর সকল উদ্যোগ-আয়োজন বা প্রচেষ্টাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন না। এমন অনেক ত্যাগী ভারত-বন্ধু বিদেশী ছিলেন যাঁহাদের গুণের আদর করিতে অথবা যাঁহাদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তিনি যে-সকল সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া গুণগ্রাহিতা, নির্ভীকতা ও স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, পুরাতন সংবাদ-

* *Vide* Memoir of Dwarkanath Tagore. By Kissory Chand Mitra. 1870. Appendix C. (Quoted from the *Hurkaru*, December 4, 1846.)

† *The National Magazine* for May 1908. Rustomjee Cowasjee (2). P. 173.

‡ *Ibid.*

* *The National Magazine* for May 1908. P. 173.

† Royal Asiatic Society of Bengal's Journal. Vols. (1844—1849)-Annual reports.

‡ *The Calcutta Courier*. September 3, 1835.



শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু দে ঘটক

জুম্মা রাতে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

পত্রের জীর্ণ ফাইল হইতে তাহার কয়েকটি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিব।

১। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে তাঁহার গুণাবলী স্মরণীয় করিবার উপায় নির্দ্ধারণার্থ যাঁহারা ১৮৩৪ সনের ৫ই এপ্রিল (শনিবার) কলিকাতা টাউনহলে জনসভা আহ্বান করেন, রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহাদের মধ্যে একজন। এই তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যর হেন্‌রি পিটর গ্রাণ্ট সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় একটি নির্দ্দেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য লোক মিলিয়া এক কমিটি গঠিত হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটির একজন সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি স্বয়ং রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাণ্ডারে আড়াই শত টাকা দান করেন। *

২। ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাসে সরকার নিজস্ব বীমা কোম্পানী স্থাপনের মানস করিয়া নিয়মাবলী গঠনের জন্য এক কমিটি স্থাপন করেন। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় বেসরকারী বীমা কোম্পানী-গুলি, এবং ইহাতে স্বার্থসংবদ্ধ ইংরেজ ও ভারতবাসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একযোগে সরকারের প্রস্তাবের দোষ ত্রুটি দর্শাইয়া এক আবেদন পেশ করেন। তাঁহাদের মতে নিম্নলিখিত কারণে লোকে বেসরকারী বীমা কোম্পানীগুলি ছাড়িয়া সরকারী বীমা কোম্পানীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের হানি হইবে—(১) সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকের অটল বিশ্বাস, (২) সরকারী বীমা কোম্পানীর অল্পতর হার (Premium)। রুস্তমজী কাওয়াসজী এই ব্যাপারে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। † বলা বাহুল্য, সরকার-ও এ ব্যাপারে আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

৩। ১৮২৩ সনের মার্চ্চ মাসে সরকার আইন করিয়া ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাট স্যর চার্ল্‌স মেটকাফ এই আইন রহিত করিয়া দেন। কলিকাতার গণ্যমান্য পঁচাশীজন লোক এই সুকৃতির জন্য মেটকাফ মহোদয়কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কলিকাতা টাউনহলে জনসভা আহ্বান করিতে ১৮৩৫ সনের ১৮ই মে সেরিফকে অনুরোধ জানান। * ৮ই জুন সকাল ৯-৩০ মিনিটের সময় সেরিফ ডব্‌লিউ হিকির নেতৃত্বে কলিকাতা টাউনহলে দেশবাসীর পক্ষ হইতে মহামতি মেটকাফকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা সমীচীন বলিয়া ধার্য্য হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী এ বিষয়েও বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। ‡

ভারতবর্ষ-ত্যাগের প্রাক্কালে ১৮৩৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউন হলে ভারত-বন্ধু মেটকাফ মহোদয়কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে এক ভোজ দেওয়া হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী এই কার্য্যেও খুব সহায়তা করিয়াছিলেন। §

৪। ১৮৩৫ সালের ১৮ই জুন ৪-৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা নেটিভ হাসপাতালের উদ্যোগে সি. ডব্‌লিউ. স্মিথের সভাপতিত্বে টাউনহলে মধ্য-কলিকাতায় একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন মানসে জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় গৃহীত এক নির্দ্দেশে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রমুখ বার জন * দেশীয় প্রতিনিধি লইয়া সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায়ের জন্য এক কমিটি গঠিত হয়। আর এক নির্দ্দেশে প্রকাশ থাকে যে, হাসপাতালের কার্য্য পরিদর্শনার্থ হিন্দু ও মুসলমান চাঁদা-দাতৃগণের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি ফিভার হাসপাতাল কমিটিতে নিযুক্ত হইবেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী ফিভার হাসপাতালে তিন হাজার টাকা দান করেন। সভাক্ষেত্রেই ষোল হাজার টাকা চাঁদা আদায় হয়। †

* সমাচার দর্পণ। ২৬ মার্চ্চ ও ৯ এপ্রিল, ১৮৩৪। প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৮ সংখ্যায় (পৃঃ ৪৭৯,৪৮০) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কলিকাতার সাময়িক সংবাদপত্রে রামমোহন রায়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† The *Calcutta Courier*. May 26, 1835.

* *Ibid*. June 6, 1835.

‡ *Ibid*. June 8, 1835.

§ *Ibid*. February 1838.

* রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন, রসময় দত্ত, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাজচন্দ্র দাস, আগা কুরবোলি মাহোম, মথুরানাথ মল্লিক, রাজা রাজনারায়ণ রায়, মহম্মদ মাহাদি মাস্‌কি, মতিলাল শীল, বিশ্বনাথ মতিলাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর।

† *The Calcutta Courier*. June 1, 1835.

৫। ভারতহিতৈষী কর্ণেল জেম্‌স্ ইয়ং ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে, ভারতবাসীদের নাগরিক এবং রাষ্ট্রীক অধিকার লাভের আন্দোলনে, জুরি দ্বারা বিচারকার্য্য হওয়ার ব্যাপারে, সর্ব্বোপরি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪০ সনের জুন মাসে তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। এই ব্যাপারেও রুস্তমজী কাওয়াসজী অগ্রণী ছিলেন। ‡

৬। পেনিন্‌সুলার এণ্ড অরিয়েণ্টাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ সুয়েজ হইতে মান্দ্রাজ ও সিংহল হইয়া ডাকসহ সরাসরি কলিকাতায় পৌঁছিবে—এইরূপ একটা মৌখিক বুঝাপড়া হওয়ায় রুস্তমজী প্রমুখ লোকেদের পরিচালিত প্রিকার্সর কমিটি কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। তখন বহু কলিকাতাবাসী পেনিন্‌সুলার কোম্পানীর অংশ ক্রয় করেন। ১৮৪৩ সনের শেষভাগে পেনিন্‌সুলার কোম্পানি প্রস্তাব করেন যে, জাহাজ ডাক লইয়া সুয়েজ হইতে বোম্বাই হইয়া তবে কলিকাতায় যাইবে, এবং এই জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইহার অনুমতি চাহিয়া পাঠান। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইলে কলিকাতায় ডাক পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে, ফলে প্রাচ্য-খণ্ডের ব্যবসায় অচল হইয়া পড়িবে। কলিকাতায় পূর্ব্বে বোম্বাই ডাক পৌঁছিলে উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবসায়গত পার্থক্য অর্থাৎ এক স্থানের সুবিধা ও অন্য স্থানের অসুবিধা হওয়াও অনিবার্য্য। কাজেই, উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ কল্পে ১৮৪৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ডব্‌লিউ-পি-গ্রাণ্ট সভার তথা কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে পেনিন্‌সুলার কোম্পানীর প্রস্তাবের প্রতিবাদপূর্ণ এক স্মারক লিপি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের সভাপতি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা প্রভৃতি উপরওয়ালাদের নিকট প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রস্তাবটি সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। *

সভাক্ষেত্রে যে-সব দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা,—

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	২,০০০ টাকা
রাজচন্দ্র দাস	২,০০০ „
দ্বারকানাথ ঠাকুর	৫,০০০ „
মথুরানাথ মল্লিক	২,০০০ „
রুস্তমজী কাওয়াসজী	৩,০০০ „
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১,০০০ „
মাধব দত্ত	১,০০০ „
মোট	১৬,০০০ টাকা

‡ *The Friend of India* January 23, 1840.

* *The Friend of India* December 14, 1843: Proceedings of the Steam Memorial Meeting.

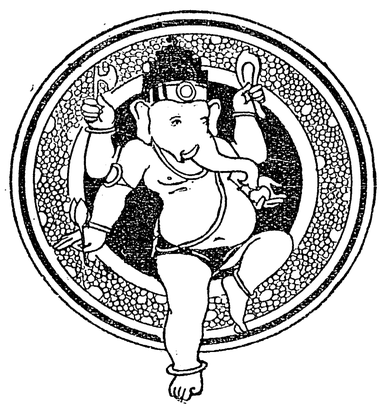

"মণির মোহে জীবন দহে..."

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

সুদখোর পঞ্চানন মুখুয্যের নাম গ্রামের বা তাহার চারিদিককার লোকগুলি ভাল রকমেই জানিত। সকাল বেলায় কেহ পঞ্চাননের নাম লইত না; প্রবাদ ছিল—সকালে তাঁহার নাম লইলে সেদিন অদৃষ্টে অন্ন জুটিবে না।

গ্রামের অনেকেই, এমন কি প্রতাপশালী জমিদার পর্য্যন্ত, পঞ্চাননের নিকট ঋণী। সুদের আশায় পঞ্চানন সকলকেই টাকা ধার দিতেন,—মাস মাস বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সুদ আদায় করিতেন। অনেক সময় সুদের সুদও আদায় হইত।

পঞ্চাননকে লোকে বলিত ছিনে জোঁক; যাহার গায়ে তিনি একবার দাঁত বসাইবেন তাহার খানিকটা রক্ত টানিয়া লইবেনই।

বাড়ীতে তাঁহার কেহ ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ একা। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া তিনি তাগাদায় বাহির হইতেন; কোন কোন দিন ফিরিতে বারটা-একটা হইত। কোন কোন দিন সকাল সকাল ফিরিতেন। যেদিন বিলম্ব হইত সেদিন আর অনর্থক কাঠ কয়লা পোড়াইয়া অপব্যয় করিতেন না, যা হয় দুইটা খাইয়া দিন কাটাইয়া দিতেন।

পয়সা যে কিরূপে সঞ্চয় করিতে হয় তাহা পঞ্চানন জানিতেন। যদি কোনদিন চিঁড়া মুড়কি দুই পয়সার কিনিয়া খাইয়া দিন কাটাইতে পারা যায়, ভাত তরকারী তাঁহার রাঁধিবার দরকার হয় না। সূক্ষ্মরূপে হিসাব করিয়া দেখিতেন ইহাতে খরচ অনেক বাঁচিয়া যায়। ভাত রাঁধিতে কেবল চালেরই খরচ নাই। কাঠ কয়লা প্রথমেই দরকার। তাহার পর তরকারী আছে,—লবণ আছে, তৈল মসলা কোনটাই বা না লাগে।

একদিন একটা হাঁড়ি দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি তিন দিন আর ভাত রাঁধেন নাই—চিঁড়া গুড় খাইয়া দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। লোকে বলিল তিনি হাঁড়ির মূল্য উসুল করিয়া লইতেছেন। একটা পয়সা, একটা অতি তুচ্ছ জিনিসও ছিল তাঁহার গায়ের রক্ত। এতটুকু জিনিস তাঁহার অপব্যয় হইবার যো ছিল না। যেখানে যাহা পড়িত তিনি তাহা খুঁটিয়া ঘরে তুলিতেন।

লোকে জিজ্ঞাসা করিত—"কার জন্য সঞ্চয় করছেন মুখুয্যে মশাই? আপনি কি চিরকাল বেঁচে থেকে এ সব ভোগ করবেন?" পঞ্চানন এ প্রশ্নে যে বিশেষ খুসি হইতেন না, তাহা বলাই বাহুল্য; মনের রাগ মনেই চাপিয়া তিনি মুখে হাসি ফুটাইয়া উত্তর দিতেন—"না হয় তোমাদের বিলিয়ে দিয়ে যাব।" পরক্ষণেই শক্ত হইয়া গম্ভীর মুখে বলিতেন, "তা বলে ভেব না আমি এখনই মরব, আর তোমরা আমার টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে খাবে। যা ধার দিয়েছি সুদশুদ্ধ সব আদায় করব, তবে আমার নাম পঞ্চানন মুখুয্যে। তার পর মরব, তার আগে যমদূত আমায় ছুঁতে পারবে না, তা জেনো।"

যেদিন ছিদাম মণ্ডলের যথাসর্ব্বস্ব দেনার দায়ে নিলাম করাইয়া তিনি নিজের টাকা আদায় করিয়া লইলেন—সেদিন প্রবীণ বিহারী ভট্টাচার্য্য একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "কি করতেই বা এত কাণ্ড করছ পঞ্চানন, সত্যিই তোমার টাকা ভোগ করবে কে? যে নাতির আশায় তুমি সব রাখছ সে সত্যি আছে কি না তাই বা কে জানে?"

পঞ্চাননের বুকে ধক্ করিয়া এই কথাটাই লাগে।

কিন্তু কে তাঁহার পুত্র, কে তাঁহার নাতি? কোথায় তাহারা গিয়াছে, আছে কি না আছে, তাই বা কে জানে?

সে কি আজিকার কথা? স্ত্রী এতটুকু ছেলে যোগেশকে রাখিয়া মারা যান। পঞ্চানন পুত্রকে বুকে করিয়া মানুষ করেন। সেই পুত্র বড় হইল, তাহার বিবাহ দিলেন। তখন তো তাঁহার বয়স বড় কম নয়—বোধ হয় ছত্রিশ

সাঁইত্রিশ হইবে। যোগেশ তখন সতের বৎসরের; এবং পুত্রবধূ দুর্গা তখন বার বৎসরের।

কি কুমতিই তখন হইয়াছিল, এতকাল সংযমের মধ্যে কাটাইয়া এই সময়েই তাঁহার অধঃপতন হইল। তিনি কৃপণ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অত আদরের পুত্রকে যে তিনি কখনও কোন জিনিস দেন নাই, সেই তিনি একটী অস্পৃশ্যা নারীকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া গেলেন, এবং তাহারই জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন।

যোগেশ কিছুদিন চুপ করিয়া সহিয়া গেল। তাহার পর একদিন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। স্নেহপ্রবণ পিতার বুকটা ফাটিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু কেবল পুত্রের কার্য্যের উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্যই তিনি তাহাকে ডাকিলেন না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল। যে মেয়েটীকে লইয়া এত কাণ্ড বাধিয়াছিল, সে একদিন কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল।

পঞ্চানন পুত্র ও পুত্রবধূকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যোগেশ আসিল না। লোক আসিয়া সংবাদ দিল—সে আসিবে না। শুনা গেল যোগেশের একটী পুত্র হইয়াছে। ইহার পর শুনা গেল, যোগেশ পশ্চিমে কোথায় কাজ পাইয়া স্ত্রী-পুত্রসহ সেখানে চলিয়া গেছে। পিতাকে সে ক্ষমা করিতে পারে নাই; তাই পিতার কাছে আর আসে নাই।

তাহার পর এই উনিশটা বৎসর কাটিয়া গেছে, পঞ্চাননের বয়স তেষট্টি বৎসর পার হইয়া গেছে, মাথার সব চুলগুলা সাদা হইয়াছে, দেহটা সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তবু পঞ্চাননের মনে আশা আছে—পুত্র তাঁহার কাছে না ফিরিয়া আসুক, পৌত্র একদিন আসিবেই। তাহারই জন্য তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলেন। পুত্রকে কিছুই দিতে পারেন নাই, পৌত্রকে তিনি ধনবান করিয়া রাখিয়া যাইবেন।

দিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। অনেক রকমে পুত্র ও পৌত্রের খোঁজ লইতেছিলেন, কিন্তু তাহাদের কোন সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই!

(২)

গ্রামের লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল—পঞ্চাননের বাড়ীতে কোথা হইতে একটা ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে।

বয়স বোধ হয় ষোল সতের হইবে, লম্বা পাতলা ধরণের ছেলেটী! মুখ দেখিলে মনে হয় খুব চালাক, আর সত্যই তাই। তাহা না হইলে পঞ্চাননের মত লোক তাহাকে আশ্রয় দিত না।

প্রথমে তাহাকে আবিষ্কার করিল ছেলেরা। ঘাটে স্নান করিতে গিয়া অপরিচিত এই ছেলেটীকে দেখিয়া তাহারা নিজেরাই আসিয়া আলাপ করিয়া জানিতে পারিল সে কাল বৈকাল হইতে একটী বৃদ্ধের বাড়ীতে আছে, সে বৃদ্ধের আর কেহ নাই!

দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল। কাল পঞ্চানন পাঁচ ক্রোশ দূরস্থিত চাতরা গ্রামে তাগাদায় গিয়াছিলেন, সম্ভব সেইখানেই ইহাকে পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত লোক যে অনায়াসে একটী এত বড় ছেলের ভার লইল, ইহাই হইল সকলের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয়।

পঞ্চানন সত্যই চাতরার পথে এই ছেলেটীকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। মলিন-মুখ ছেলেটী যখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতরমুখে জানাইল সে আজ দুই দিন কিছু খায় নাই, তখন তিনি তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া আসার সময় হঠাৎ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক তাঁহার হারান ছেলের মুখ। হাঁ, এমনই মুখ চোখ তাহার ছিল,—এই বয়সে এমনই রোগা, লম্বা, এমনই গৌরবর্ণ ছিল সে।

পঞ্চানন কি ভাবিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন। নিজে ওবেলা চিঁড়া গুড় খাইয়া কাটাইয়া দিয়া এবেলার জন্য মুগের ডাল সিদ্ধ ভাত রাঁধিয়াছিলেন; তাহাই ছেলেটীকে খাইতে দিয়া নিজে এবেলাও চিঁড়া গুড় খাইয়া কাটাইয়া দিলেন।

রাত্রে শুইয়া আপন মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন—আর একটী লোক পুষিতে তাঁহার খরচ বড় কম লাগিবে না। সকালে উঠিয়াই তিনি ছেলেটীকে বলিয়া দিলেন—

"আজই বিকেলের দিকে তুমি তোমার পথ দেখো বাপু, আমি অনর্থক তোমায় পুষতে পারব না।"

ছেলেটী কোনও উত্তর দিল না। আহারাদি করিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে বারাণ্ডায় মাদুরটী পাতিয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া দিব্য এক ঘুম দিয়া সন্ধ্যাবেলা জাগিল। তাহার পর গম্ভীর মুখে উঠিয়া মাদুর তুলিয়া এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল।

পঞ্চানন ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিলেন। যাদব যে সহজে নড়িবে সে আশা করাও ভুল। একদিন একটা রাত্রির জন্য আসিয়া সে যেন এখানে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিল। গ্রামের লোক তামাসা করিয়া বলিল, "কি মুখুয্যে মশাই, ওটি কি আপনার নাতি নাকি?"

গলার সুর সপ্তমে চড়াইয়া মুখুয্যে মশাই উত্তর দিলেন, "হাঁ, নাতিই বটে। হতভাগাটা কোথা হতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, দেখ না,—আর উঠবার নাম নেই। এত করে অপমান করছি—এখান হতে চলে যেতে বলছি—তবু যদি নড়ে। আরামে আছে, দিব্যি দুবেলা রান্না ভাত পাচ্ছে—কাপড় ছিল না—নিজের একখানা কাপড় দিয়েছি—ও কি আর সহজে নড়ে?"

দিন দশ বার পরে একদিন আবার তিনি যাদবকে ডাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "তা বাপু, অনেক দিনই তো রইলে, এইবারে আস্তে আস্তে সরে পড়বার যোগাড় দেখ।"

যাদব মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাব?"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া পঞ্চানন বলিলেন, "কোথায় যাবে, তা আমি কি জানি? তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ তো আছে, সেখানেই যাও।"

যাদব সরল ভাবে উত্তর দিল, "কেউ নেই মশাই। থাকলে কি আপনার কাছে সেদিন ভাত খেতে চাইতুম, না পরবার কাপড় নিতুম? এসেছি যখন, আর দুদিন থাকি, তার পর না হয় চলে যাব তার জন্যে আর কি।"

পঞ্চাননের অন্তরটা হঠাৎ যেন কোমল হইয়া গেল,—আহা অভাগা, কেহই নাই। গলার সুর খাদে নামাইয়া বলিলেন, "বেশ, আর দুদিন থাক, তার পরই না হয় যেয়ো।"

(৩)

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে টিঁকিয়াই গেল। সকলেই দেখিল, যে পঞ্চাননের হাত দিয়া এতটুকু জল বাহির হইত না, এই পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া ছেলেটীর জন্য সেই তিনিই পয়সা খরচ করিতেছেন। আজকাল তাঁহার দুবেলা ভাত তৈয়ারী হয়। ছেঁড়া বালিসগুলা বিদায় লইয়াছে; তাহার স্থানে নূতন বালিস আসিয়াছে। অনেক বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে।

দুধ তিনি কখনও খান না, কিন্তু তাঁহার পোষ্যটীর দুধ না হইলে চলে না; কেন না, তাহার দুইবেলা চা খাওয়া চাই। কেবল একটু দুধ হইলেই না হয় চলুক, তা নয়, আবার চা চাই, চিনি চাই। মাঝে মাঝে আবার দু একজন বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটে, তাহাদের সুদ্ধ চা খাওয়ায়। পঞ্চানন আর খরচ বহিতে পারেন না। লোকের কাছে বলেন—"ছোঁড়াটা আমার শনিগ্রহ, ও এবার আমায় ফতুর করতে এসেছে। আমার সব খাবে দেখছি, সব সব উড়াবে।"

লোকে বলে—"এ আপনার অন্যায় কথা মুখুয্যে মশাই,—ওকে যেতে বলুন না কেন?"

পঞ্চানন বলেন, "গেলে তবে তো বলব। ওর যে যাওয়ার গা-ই দেখছি নে। হুঁ, এমন নবাবের মত খাওয়া-পরা ফেলে ও না কি আবার যাবে?"

যাদব হুকুমও চালায় বড় কম নয়,—সত্যই সে নবাবের মত চলে। লোকে বলিতে লাগিল, "বুড়ো এই ছেলেটাকে পোষ্যপুত্র নেবে। হায় রে, নিজের ছেলে নাতি ভেসে গেল, এখন—'উড়ে এল চিল, জুড়ে নিল বিল'—তাই হয়েছে।"

পঞ্চানন যাদবকে নিষেধ করেন—সে যেন গ্রামের লোকের সহিত না মেশে। গ্রামের লোকেরা তাহাকে এ গ্রাম হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছে; কারণ, উহারা কখনই লোকের ভাল দেখিতে পারে না।

যাদব সে কথা কাণে তুলে না, সে গ্রামের লোকের সহিত মিশে। পঞ্চানন তাহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার উপদেশ দিয়া তাগাদায় বাহির হন। ঠিক দুপুর রৌদ্রে একটা ছাতা মাথায় দিয়া পথে

পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হাঁপাইয়া উঠেন, মনে মনে হাজার বার যাদবকে গালাগালি দেন।

সত্যই তো, এ আপদ যদি না আসিয়া জুটিত, তাঁহাকে তো এ জ্বালা সহ্য করিতে হইত না। সকালে তিনি বাহির হইতেন, দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া কোন দিন ভাত রাঁধিতেন, কোনদিন চিঁড়া মুড়কি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন। এখন ভোরে উঠিয়া নবাবপুত্রের চায়ের জলের জন্য উনানে আগুন দিতে হয়। সেদিন নিতান্ত রাগ করিয়াই বলিয়াছিলেন—"উনান নিজে জ্বালাইয়া জল বসাও।" ইহাতেই নবাবপুত্র রাগ করিয়া সেদিন চা খায় নাই।

নিতান্ত পঞ্চানন বলিয়াই উহার এত আবদার সহ্য করিতেছেন। অন্য কেহ হইলে একদিনও যে যাদবকে বাড়ীতে স্থান দিত না, এ জানা কথা।

তাগাদা হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ী ফিরিয়া দেখিতে পান, যাদব ঘরে চাবী তালা দিয়া বাহির হইয়া গেছে। দরকার পড়িতে পারে বলিয়া তিনিই তাহাকে একটা চাবি তালা দিয়াছিলেন,—কিন্তু সে যে প্রত্যহই দরজা দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বেড়াইতে যাইবে তাহা তিনি জানিতেন না।

সেই চাবির জন্য তাঁহাকে আবার কষ্ট করিতে হইত বড় কম নয়। বাহিরে বসিয়া থাকা অসহ্য বলিয়া তিনি আবার যাদবের খোঁজে বাহির হইতেন। কোন দিন তাহাকে মৈত্রদের চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের দাবাখেলার নিকট গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত; কোন দিন পাড়ার সব বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া কোথাও তাস খেলিত, অথবা চক্রবর্ত্তীদের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে বসিয়া যাইত।

পঞ্চানন বেশী তিরস্কার করিতে পারেন না, ভয়—পাছে সে চলিয়া যায়।

সেদিন রামা আসিয়া তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিল—যাদব তাহার গাছের তিন চারটা শশা লইয়া গেছে। আজ যদিও সেগুলি আঙ্গুলের মত ছোট, তবু একদিন সেইগুলাই দেড়-হাত না হোক সওয়া হাত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতগুলা শশা বিক্রয় করিয়া সে পয়সাটা পাওয়া যাইত, তাহারই কথা মনে করিয়া রামা চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তাহার সহিত বীরত্বও বড় কম ছিল না। পঞ্চাননের যেমন খাইয়া দাইয়া কাজ নাই, তাই একটা হতভাগা ছেলেকে জায়গা দিয়াছেন, ওটাকে এখনই ঘরের কড়ি দিয়া বিদায় করা উচিত—ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঞ্চানন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহার দাবীর এক টাকার স্থলে আটআনা দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

যাদব বাড়ী আসিলে তিনি খুব রাগের ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই রামার গাছের শশা নষ্ট করে দিয়েছিস্?"

যাদব দমিল না, গর্ব্বিতভাবে বলিল, "হ্যাঁ, দিয়েছি ই তো। উঃ, বেটা কি পাজি, আবার এখানে নালিশ করতে এসেছিল বুঝি? একটা শশা দুটো পয়সা দিয়ে নিতে চাইলুম, তা যেমন দেয় নি, তেমনি তার চারটে শশা নষ্ট করে দিয়েছি। খেয়েছি এ কথা কেউ বলতে পারবে না। যে ছোটলোক একটা শশা পয়সা নিয়ে দিলে না, তার জিনিস আবার ভদ্রলোকে খায়? চারটে শশা ওরই সামনে পা দিয়ে থেঁতলে দিয়ে এসেছি।"

এই ভদ্রলোকের ভদ্রত্ব যে কোন্‌খানে তাহাই দেখিবার জন্য পঞ্চানন বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

(৪)

পূজার প্রারম্ভে শুনা গেল যোগেশ সপরিবারে বাড়ী আসিতেছে। গ্রামের সকলেই এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গেল; সকলেই বলিল—"আহা, বাপের ছেলে বাপের কাছে ফিরে আসুক, শূন্য ঘর আবার পূর্ণ হোক।"

নবীন চক্রবর্ত্তী তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "মুখুয্যে, ও আবাগের বেটা ভূতের বিষদাঁত এবার ভাঙ্গবে, তাই আমার আনন্দ হচ্ছে। কি নন্দদুলালই পেয়েছ তুমি,—যত আদর করছ, তত যেন আরও মাথায় উঠছে। কাউকে এতটুকু খাতির করে না, এইটেই না বড় ভয়ানক কথা। তুমি যে তুমি, ওকে পথ হতে কুড়িয়ে এনে রাজার হালে রেখেছ, তোমাকেই কি না বলে, তোমার সঙ্গেই বা কি ব্যবহার করে। হয়েছে,—ও মনে করেছিল, নিয়ে যখন এসেছ, তখন সবই ও পাবে। সেই জন্যেই ওর এত বাড় হয়েছে। বেঁচে থাক তোমার ছেলে নাতি, তাদের সব তারাই নেবে। তারা থাকতে এই কুড়িয়ে-পাওয়া মাণিকটী

যে তোমার সব বিষয় দখল করবে, তা আমরা সহ্য করতে পারব না বলেই তো যোগেশকে খবর দিয়ে আনছি।"

ঘটনাটা জলের মতই পরিষ্কার হইয়া গেল। পঞ্চানন বুঝিতে পারিলেন দীর্ঘকাল পরে পুত্রের বাড়ী ফিরিবার কারণ কি? সে তাঁহার জন্য আসিতেছে না, সে আসিতেছে—পাছে তাহার প্রাপ্য বিষয় অপরে গ্রহণ করে সেই জন্য। নিমেষে বিগলিত মনটা কঠিন হইয়া পড়িল।

যাদবের দৌরাত্ম্য কমিল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। সঙ্গী শ্রীদাম একটা হার্ম্মোনিয়াম কিনিয়াছিল। তাহাই দেখিয়া যাদব আসিয়া পঞ্চাননকে ধরিয়া বসিল, তাহাকে একটা হার্ম্মোনিয়াম কিনিয়া দিতে হইবে। একটা হার্ম্মোনিয়াম পাইলে সে আর বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না, দিনরাত বাড়ীতেই থাকিবে।

পঞ্চানন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত?"

যাদব উৎসাহিত হইয়া বলিল, "দাম বেশী নয়, মাত্র তিরিশ টাকায় পাওয়া যাবে। আমি দর দাম সব ঠিক করে এসেছি, টাকা পেলেই দিয়ে আনব। মাত্র তিরিশটা টাকা বই তো নয়—"

মাত্র তিরিশ টাকা! পঞ্চানন যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন—"তিরিশ পয়সা এখানে আসবার আগে চোখে দেখেছিস কখনও, যে আজ তিরিশ টাকা নিতে এসেছিস? তিরিশ টাকা আমি ওই বাজনা কিনতে দেব,—আমার রক্ত জল করা টাকা!"—ক্রোধে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল।

যাদব খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"উঃ, আমার রক্ত জল করা টাকা, মরবার সময় যখ দেবে ওই টাকায়। সিন্ধুক বোঝাই টাকা, তিরিশটা বার করতে গেলে মরে যাবে।" পঞ্চানন নীরবে তাহার অস্ফুট উক্তি শুনিয়া গেলেন।

বৈকালে যাদব যখন ফিরিল, তখন তাহার মুখখানা বড় গম্ভীর। পঞ্চানন তখন বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, যাদবকে দেখিয়া নিকটে ডাকিলেন। গম্ভীর মুখে সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন শান্তভাবে বলিলেন, "শোন্ যাদব, তুই যে হার্ম্মোনিয়াম কিনবি বলে ঝোঁক করছিস, ও:ত তোর কি লাভ হবে? বাড়ীতে এখন ছেলে পুলে সব আসবে, বাজনা তুই রাখবি কোথায়, ওদের হাতে যে ভেঙ্গে যাবে।" যাদব শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কারা আসবে?" পঞ্চানন উত্তর দিলেন, "আমার ছেলে বউ নাতি নাতনীরা।" "তবে থাক—" আস্তে আস্তে যাদব সরিয়া গেল।

তাহার মলিন শুষ্ক মুখখানা পঞ্চাননের মনে বড় বেশী রকমই আঘাত দিল। খানিক গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা লোকের মাথায় হার্ম্মোনিয়ামের বাক্সটা চাপাইয়া যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাদবকে ডাকিয়া বলিলেন, "নে, সেই হার্ম্মোনিয়াম নিয়ে আসতেই হল। আমি বেশ জানি তুই আমার শনিগ্রহ, সব রকমে আমায় জ্বালাতে এসেছিস। সিন্ধুকের দিকে যখন তোর নজর পড়েছে, তখনই জেনেছি ও সিন্ধুক খালি হল বলে।" যাদব অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কেই বা তোমায় আসতে বলেছিল, আমি তো বলি নি।" সেদিন সন্ধ্যার পরে পঞ্চাননের নীরব ঘর হঠাৎ হার্ম্মোনিয়ামের মিষ্ট সুরে ভরিয়া উঠিল। যাদব মহানন্দে প্রদীপের কাছে বসিয়া উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে পর্দ্দা চিনিয়া সা-রে-গা সাধিতে লাগিল। আর বারাণ্ডায় মাদুরে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে পঞ্চানন চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেছিলেন ছেলেটা হার্ম্মোনিয়াম বাজাইতে শিখিল কোথায়?

(৫)

একদিন সপরিবারে যোগেশ আসিয়া পৌঁছিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই ছেলেটার দিকে দৃষ্টি পড়িল। পিতাকে বলিল, "এ ছেলেটীকে কোথা হতে জুটালে বাবা?" পিতা মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "গরীবের ছেলে, দুদিন খেতে পায় নি, সেইজন্যে—"

পুত্র খুসির ভাব দেখাইয়া বলিল, "ও, ওটাকে চাকর রেখেছ? তা বেশ করেছ, আমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখা শোনা করতে পারবে।" ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পঞ্চানন বলিলেন, "না না, চাকর কেন? বামুনের ছেলে, গলায় পৈতে রয়েছে দেখতে পাস নি?"

যোগেশ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "তাই ওকে ঠাকুর

করে রেখেছ? কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি বাবা, তোমার ওই পুষ্যি পুত্তুরের আদর আবদার আমার কাছে খাটবে না, কুকুরকে নাই দেওয়া আমি আদতে পছন্দ করি নে।" পঞ্চানন নিতান্ত অসহায় ভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

যোগেশ বাস্তবিকই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কোথা হইতে এই ছেলেটা আসিয়া সব যেন জুড়িয়া বসিয়াছে। তবু অদৃষ্ট ভাল যে সে আগেই আসিয়া পড়িয়াছে, পিতা ইহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া যাইতে পারিবেন না।

পঞ্চানন যাদবকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে তাঁহার নিজস্ব জিনিস, ইহাদের নিকট হইতে তাই তাহাকে দূরে, একেবারে নিজের কাছে রাখিতে চান। যোগেশ বা তাহার স্ত্রী যে যাদবকে মোটেই সহ্য করিতে পারিতেছে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বদা তাহাকে বুকের আড়ালে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

যাদবের বড় সাধের হার্ম্মোনিয়ামটা যেদিন যোগেশের পুত্র বাজাইতে সুরু করিল, সেদিন তিনি আর কোনক্রমে সহ্য করিতে পারিলেন না; পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বউ মা, উড়ে এসে তো জুড়ে বসেছ, সবই তো একে একে দখল করেছ, আবার ওই বাজনাটা কেন দখল করছ বল দেখি? ঘরের মধ্যে তো বাপু পা বাড়াবার জায়গা রাখ নি, ছোঁড়াটা সারা দিনই তো বাইরে বাইরে ঘোরে। ওর বড় সাধের বাজনাটাও তোমরা দখল করলে, তবে ও যায় কোথায় বল দেখি।"

তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কথাটা যখন যোগেশের কানে গিয়া পৌঁছিল, তখন সে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"আমি বুঝেছি বাবা, আমরা যে এখানে থাকি তা তোমার ইচ্ছে নয়,—তুমি ওই ছোঁড়াটাকে নিয়েই সুখে থাকতে চাও। বেশ, তাই বললেই তো হোত, অপমান করার কোনও দরকার ছিল না। আমি না হয় ওদের সকলকে নিয়ে আজই চলে যাব, জানব আমার বাবা নেই।"

পঞ্চানন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "কই, অপমান কি করেছি বল দেখি?"

যোগেশ রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "অপমান নয়? ওর বাজনাটায় নরেন একটু হাত দিয়েছে বলে তুমি তোমার বউমাকে যা না তাই শুনিয়ে দিলে। কোথাকার একটা পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া ছোঁড়া,—ও হয়েছে তোমার সাত-রাজার ধন এক মাণিক; বেশ, ওকে নিয়েই থাক, আমরাই না হয় চলে যাচ্ছি।"

পঞ্চানন নীরবে কেবল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, পুত্রকে বুঝাইয়া বলিতে পারিলেন না—তাঁহার প্রাণটা যখন একটা কোন স্নেহের পাত্রের জন্য অন্তরের মধ্যে কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেই সময়ই তিনি এই ছেলেটাকে পাইয়াছেন,—সেইজন্যই ইহার উপর তাঁহার বড় স্নেহ পড়িয়া গেছে।

মানুষ একটা কোনও উপলক্ষ্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। পঞ্চাননের জীবনে কোনও উপলক্ষ্য ছিল না তাই তিনি বড় কঠিন, নির্দ্দয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্তরের অন্তরালে কেহ যে নিরন্তর কাহারও জন্য কাঁদিয়া মরিত, তাহা অপরে জানা দূরে থাক, তিনি নিজেই জানিতেন না।

এই ছেলেটা আসিয়া পর্য্যন্ত এই নির্দ্দয় বৃদ্ধটার ভিতরকার সত্য রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি নিজেই এক এক সময় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন,—তিনি এত কোমল হইয়া পড়িলেন কি করিয়া?

এই তো সেদিন উদ্ধব দাসের বাড়ী তাগাদায় যাইতে যখন সদ্যবিধবা মেয়েটী একটী ছেলে লইয়া তাঁহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, তখন পঞ্চানন খানিকটা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ নিজেই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! পঞ্চানন নিজেই সে দিন বড় কম আশ্চর্য্য হইয়া যান নাই। এ রকম ব্যাপার তো তাঁহার জীবনে কখনও ঘটে নাই! এ রকম হইলেও তো চলিবে না। তিনি সুদখোর মহাজন, সেই অপবাদই তাঁহার শিরোভূষণ হইয়া থাক,—দয়ার্দ্র আখ্যায় বিভূষিত হইতে তিনি চান না।

কিন্তু এই ব্যাপারটাই তাঁহার কোমলতার প্রথম পরিচয় দেয় নাই। মনটা যেন কি রকম হইয়া গিয়াছিল,—কাহারও দুঃখ কষ্ট শুনিলে চোখে যেন জল আসিয়া পড়ে।

লোকে তাঁহার চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যাহার হাত হইতে একটী

পাই সুদ এড়াইবার যো ছিল না, তিনি এখন অনেক জায়গায় সুদ ছাড়িয়া দেন।

লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত, "মুখুয্যে মশাই, ব্যাপার-খানা কি, এ কি রকম হল?"

মুখুয্যে মহাশয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাদবকে দেখাইয়া বলিতেন, "ওই শনিগ্রহটা এসেই আমায় একেবারে মাটি করে দিলে, ওর জন্যেই তো আর কড়াকড়ি করতে পারি নে। ছোঁড়া সুদখোরকে দারুণ ঘেন্না করে। বলব কি—আমার মুখের ওপর পষ্ট বলে দেয়—'সকাল বেলায় যেন মুখ দেখিয়ো না, সুদখোরের মুখ সকালে দেখলে সেদিনটা ভারি খারাপ যায়।' ওই ছোঁড়াই আমায় সব রকমে মারলে। কি কাল শত্রুই যে এনেছিলুম বলতে পারি নে।"

যোগেশ পিতার সুদ ছাড়িয়া দেওয়ার কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিয়াছিল। সে স্পষ্টই পিতাকে জানাইল, "দেখ বাবা, সুদ তুমি আজ থেকে ছেড়ে দিচ্ছ শুনতে পাচ্ছি। আমি তা করতে দেব না। তোমার কাগজপত্র সব আমায় বুঝিয়ে দাও, আমি সব আদায়পত্র করব। ও রকম করে সুদ ছাড়তে গেলে সংসার করা চলে না। তুমি এখন বুড়ো হয়েছ, ঘরে বসে হরিনাম কর, এখন বিষয়কর্ম্মের মধ্যে তোমায় আর যেতে হবে না। বুড়ো হয়ে তোমার মন ভারি নরম হয়ে গেছে, তাই সব দেনদার চোখের জল ফেলে তোমার মন ভিজিয়ে দিচ্ছে। ও রকম করে কাজ করা চলে না—তা জান তো।"

বৃদ্ধ পঞ্চানন নির্ব্বাকে পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। দপ করিয়া তাঁহার মনে বহু বৎসর পূর্ব্বেকার একটা চিত্র জাগিয়া উঠিল। তখন যোগেশ ছিল কিশোর মাত্র, পিতার এই সুদ নেওয়ার বিপক্ষে সে সেদিন দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মূলে ছিল—সে সেদিন সংসারী ছিল না, সে সেদিন অর্থ কি তাহা চিনে নাই। তাই সে সেদিন ছিল সুদখোর অধার্ম্মিক পিতার ধার্ম্মিক পুত্র,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। আজ সে ঘোর সংসারী। আজ তাই তাহার কাছে একটী পাইয়েরও অনেক মূল্য। আজ সে হিসাব করিতে শিখিয়াছে, তিনটী পাইয়ে একটী পয়সা হয়। সেদিন যাহার মূল্য তাহার কাছে কিছুই ছিল না, আজ তাহারই মূল্য তাহার কাছে খুব বেশী।

(৬)

যাদব হঠাৎ যখন ঝড়ের বেগে আসিয়া পড়িয়া বলিল, "দাদু, এ রকম অত্যাচার করলে তো চলবে না,—এর একটা ব্যবস্থা কর"—তখন পঞ্চানন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে, ব্যাপার কি?"

যাদবের এমন মুখ তিনি কোন দিনই দেখিতে পান নাই,—সে যেন আজ যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

যাদব যাহা বলিল তাহার সার মর্ম্ম এই—বহুদিন পূর্ব্বে পঞ্চানন যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উদ্ধব দাসকে এক শত টাকা ধার দিয়াছেন, তাহা আজ সুদের সুদ ধরিয়া আসলের সহিত যোগ করিয়া অনেক হইয়াছে। পঞ্চানন কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আদায় করিতে যান, তাহারই দুদিন আগে মাত্র উদ্ধব মারা গিয়াছে। সদ্য-বিধবা ও তাহার বালক পুত্রটীর রোদনে বিচলিত পঞ্চানন চলিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি ইচ্ছা করিয়াই সে কথা আর মনে করেন নাই।

যোগেশ পিতার কাগজপত্র হাতে পাইয়া সকলের নিকট হইতে জোর করিয়া, নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতেছে। বিধবার উপর অত্যাচার বড় কম হয় নাই, অবশেষে নালিশ। শেষটায় আজ আদালতের লোক গিয়া সেই বিধবা ও তাহার শিশু পুত্রটীকে টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরে তালা দিয়াছে।

পঞ্চানন দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিলেন। যোগেশ যে এরূপ করিতে পারে ইহা যেন তাঁহার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। হায় রে সংসার, তোমার ফাঁদে পা দিয়া দেবপ্রকৃতি মানুষও একদিন দানবে পরিণত হয়।

তিনি কি বলেন জানিবার জন্য যাদব দাঁড়াইয়া ছিল; তিনি একটী কথাও বলিলেন না।

সন্ধ্যার সময় যোগেশ ফিরিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলুম নাকি উদ্ধবের স্ত্রীপুত্রকে ঘর হতে বার করে দিয়ে ঘরে তালা দিয়েছ, কথাটা সত্যি কি?"

যোগেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "এ খবর কে দিলে, তোমার পুষ্যিপুত্তুর বুঝি?"

পঞ্চানন বলিলেন, "যেখানেই হোক আমি শুনেছি। কিন্তু এ রকম কাজ করা কি উচিত যোগেশ?"

যোগেশ বলিল, "উচিত অনুচিত সে আমি বুঝব এখন বাবা, তুমি হরিনাম কর গিয়ে, এ সব দিকে দেখবার তোমার কোনও দরকার নেই।"

পঞ্চানন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস কোনমতে রোধ করিতে পারিলেন না; তখনই মনে পড়িয়া গেল—এ তাঁহারই কৃতকার্য্যের ফল,—তিনি যে গাছ রোপণ করিয়াছেন আজ তাহাতে ফল ধরিয়াছে।

রাত্রে তাঁহার পার্শ্বে শুইয়া যাদব জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে ওদের কোনও উপায় করবে না দাদু?" কঠিন স্বরে পঞ্চানন উত্তর দিলেন, "না"—হঠাৎ যাদব একেবারে নীরব হইয়া গিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পঞ্চানন ঝাঁজের সঙ্গে বলিলেন, "তোর যদি অত মাথাব্যথাই হয়ে থাকে যেদো, তুই গিয়ে তাদের দেনা শোধ করগে না কেন? যখন ধার করেছিল তখন মনে ছিল না যে শোধ করতে হবে?"

যাদব একটু কঠিন স্বরেই বলিল, "তখন তো উদ্ধব জানত না সে এত শীগ্‌গীরই মরে যাবে?"

বিকৃতমুখে পঞ্চানন বলিলেন, "ওরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আর কথা বলিসনে, চুপ করে থাক। অসহ্য বোধ হয় চলে যা, আমি তো তোকে ধরে রাখি নি। সুদখোর মহাজনের বাড়ীতে রয়েছিস, কেবল দেখে যাবি—কথা বলা পাপ তা জানিস?" যাদব রোখের সঙ্গে বলিল, "বেশ তাই হবে।" সে রাত্রিটা বেশ ঘুমাইয়াই কাটিয়া গেল।

পরদিন সকালে যাদব যখন আসিয়া পঞ্চাননের পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, "কোথায় যাচ্ছিস রে যেদো?"

যাদব একটু হাসিয়া বলিল, "একটা কাজ পেয়েছি, তাই চলে যাচ্ছি।"

"কাজ করতে যাবি—তুই—?" বিস্ময়ে পঞ্চানন তাহার মুখের পানে তাকাইলেন।

যাদব বলিল, "কি করব? সেই বিধবাটী আর তার ছেলের ভার যখন নিয়েছি, তখন একটা উপায় তো করতে হবে, ওদের বাঁচানো তো চাই। তোমার কাছে বললুম, তুমি সোজা জবাব চাইলে ওরা ধার করেছিল কেন? সে জবাব যে দিত সে আজ চলে গেছে, কাজেই জবাব দেওয়া হল না দাদু। আচ্ছা চললুম দাদু—"

সে চলিয়া গেল, পঞ্চানন কেবল তাকাইয়া রহিলেন।

(৭)

পুত্রবধূ বলে—"বুড়ো পাগল হয়েছে।" যোগেশ মহা ব্যস্ততা দেখাইয়া কবিরাজ দেখাইয়া ঠাণ্ডা তৈলের ব্যবস্থা করে। পঞ্চানন কাহারও কথায় কান দেন না, চুপচাপ নিজের ঘরেই বসিয়া থাকেন। দিনের মধ্যে একশবার যাদবের কাপড় জামাগুলা পাড়িয়া আবার গুছাইয়া তুলেন, জুতাজোড়াটা ঝাড়িয়া মুছিয়া আলমারীতে সাজাইয়া রাখেন। হার্ম্মোনিয়ামটার ডালা খুলিয়া তাহাতে সুর দিয়া দেখেন ঠিক আছে কি না। নাতি নাতনীরা হাসে—।

একদিন যাদবেরই সমবয়স্ক নাতি প্রভাস আসিয়া বলিল, "হার্ম্মোনিয়ামটা আমায় দাও না ঠাকুরদা, তুমি আর ওটা নিয়ে কি করবে?"

পঞ্চানন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পরের জিনিস দিই কি করে বল দেখি? আমার নিজের যদি হতো তোকে এতদিন ক—বে দিয়ে দিতুম।"

প্রভাস বলিল, "পরের জিনিস কি করে? তুমিই তো যেদোকে নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিয়েছিলে।"

মুখখানা বিকৃত করিয়া পঞ্চানন বলিলেন, "হ্যাঁ, তা দিয়েছি, তাকে দান করেছি। এখন সেই দান ফিরিয়ে নিতে পারব না। তোর অত ঝোঁক হয়ে থাকে তোর বাবাকে বল গে যা, কিনে দেবে এখন।"

বৃদ্ধ যে কেন এমন করিয়া যাদবের জিনিস আগলাইয়া থাকেন তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। যোগেশ বলে, "ওগুলো প্রভাসকে দিয়ে দাও না বাবা, যখের মত ও সব আগলে আছ কেন?" পঞ্চানন নীরবে তামাক খান, উত্তর দেন না।

লোকে বলে—সে আর আসিবে না, কিন্তু তাঁহার মন এ কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। মন বলে—সে আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে। দীর্ঘ দুইটা বৎসর সে এখানে কাটাইয়া গেছে, দুই বৎসরের মায়া এত সহজে—একটা দিনেই সে পরের জন্য ত্যাগ করিতে পারে? এই গ্রাম, এই ঘর, ইহার প্রতি স্থান—এমন কি প্রতি কোন্ পর্য্যন্ত তাহার বড় পরিচিত। কোন দিন কি তাহার

মনের এক কোণে এখানকার স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে না, কোন দিন কি সে এখানে আসিবে না? লোকে বলুক সে আসিবে না, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মন বলে—সে আসিবেই, এখানে তাহার সবই যে পড়িয়া আছে—সে যাইবে কোথায়? দেয়ালে তাহার ঘুড়ি লাটাই, আলমারীর মাথায় তাহার লাটিম সুতা প্রভৃতি আজও রহিয়াছে, নাতিরা চাহিয়া চাহিয়াও এগুলি পায় নাই।

আজ জীবনে কোন উদ্দেশ্য নাই, কোনও বন্ধন নাই। নিজের পুত্রও যেন তাঁহার নিজের নয়, সে একেবারেই পর হইয়া গেছে। তাঁহার যাহা কিছু সব উহারা লইয়াছে, তাঁহার হাতে হরিনামের মালা দিয়া দূর পরলোকের চিন্তা করিতে বসাইয়া দিয়াছে। ছন্নছাড়ার জীবনে একটী মাত্র মায়ার বাঁধন পড়িয়াছিল, সে বাঁধন আজ ছিঁড়িয়া গেলেও দাগ তো মিলায় নাই। তাহারই স্মৃতিতে তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন। রুদ্ধ দ্বারে আর কয়টী ছেলেমেয়ে কোলাহল করিয়া আসিয়া আঘাত করে, তাঁহার সাড়া পায় না।

দিন এ-দিকে ক্রমে কাছে আসিতেছিল, বিজয়ার বাদ্য বাজিয়াছিল। একদিন পঞ্চানন বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না।

কর্ম্মিষ্ঠ যোগেশ সারাদিন পিতার খোঁজ লইতে পারে নাই, রাত্রে খোঁজ লইয়া জানিল—তিনি আজ উঠেন নাই, জলস্পর্শও করেন নাই। পিতার ঘরের দরজা বন্ধ, রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া যোগেশ ফিরিয়া আসিল। পরদিন অনেক বেলায় ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া যোগেশ ঘরে প্রবেশ করিল।

দরজার কাছেই মেঝের উপর পড়িয়া পঞ্চানন—হয় তো দরজা খুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া গেছেন, আর উঠিতে পারেন নাই। ঘরের মেঝেয় চারিদিকে ছড়ানো পড়িয়া আছে যাদবের জিনিসগুলি, এমন কি তাহার লাটিম সুতা পর্য্যন্ত।

বিকারের ঝোঁকেই হয় তো এগুলো তিনি পাড়িয়াছিলেন; তাহার পর আর তুলিতে পারেন নাই।

কবিরাজ আসিলেন, ডাক্তারও আসিলেন; বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া সকলেই জবাব দিয়া গেলেন। পঞ্চানন তখন প্রলাপ বকিতেছিলেন—দুই একটা অসংলগ্ন কথা মাত্র—"কে, যাদব, এসেছিস?"

রুদ্ধ কণ্ঠে যোগেশ বলিল, "না বাবা, আমি তোমার পাশে বসে আছি।" পঞ্চানন চক্ষু মুদিলেন।

"ওর জিনিসগুলো রইল, কে ওর কাছে পৌঁছে দেবে? ছেলেমেয়েগুলো যেন কি,—ওর এই জিনিসগুলো নেবার জন্যেই চারিদিকে ঘুরছে, আমি একবার ঘর হতে বার হলে হয়—ওরা একটা কিছু এ ঘরে রাখবে না। আমিও বার হব না, এই বসে রইলুম। বউমা, এই ঘরেই আমার ভাত দিয়ো মা, ও ঘরে গিয়ে আমার খাওয়া হবে না।"

সমস্ত দেহ ক্রমেই শীতল হইয়া আসিতেছিল।

শেষ সময়ে একবার তিনি জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন; বিছানা হাতড়াইতে হাতড়াইতে জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "কই, উদ্ধবের টাকা নেওয়ার রসিদখানা গেল কোথায়? ওখানা পুড়িয়ে ফেলতে হবে—যাদবকে মুক্তি দিতে হবে যে।" প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই দেহটা ধপ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেল।—

মুক্তি কে পাইল—তিনি না যাদব, সে কথা জানেন একমাত্র ভগবান।

যাদবের জিনিস সবই পড়িয়া রহিল,—যিনি সব দিয়া সেই ক্ষুদ্র জিনিস কয়টী বুক দিয়া রক্ষা করিতেছিলেন, তিনিই চলিয়া গেলেন।



রেঙ্গুন

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী বি-এ

ছবির মত উপকূলটি। এতদিন পরেও স্মৃতির নেগেটিভ থেকে সে ছবিখানি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেদিন মানুষে ও দেবতায় মিলে দৃশ্যখানি এঁকে তুলেছিলেন। সেদিনও অন্যান্য দিনের মত ধরণীর পায়ের তলায় জলদেবী ইরাবতী তনুখানি এলিয়ে রয়েছেন বঙ্কিম ভঙ্গীতে, তাঁর দেহের বাঁকে বাঁকে তটের উপরেই মানুষের হাতের কারিগরিও তেমনি রয়েছে, সেগুলি বিদেশী সওদাগরদের আপিস মাত্র হলেও আকারে প্রকারে

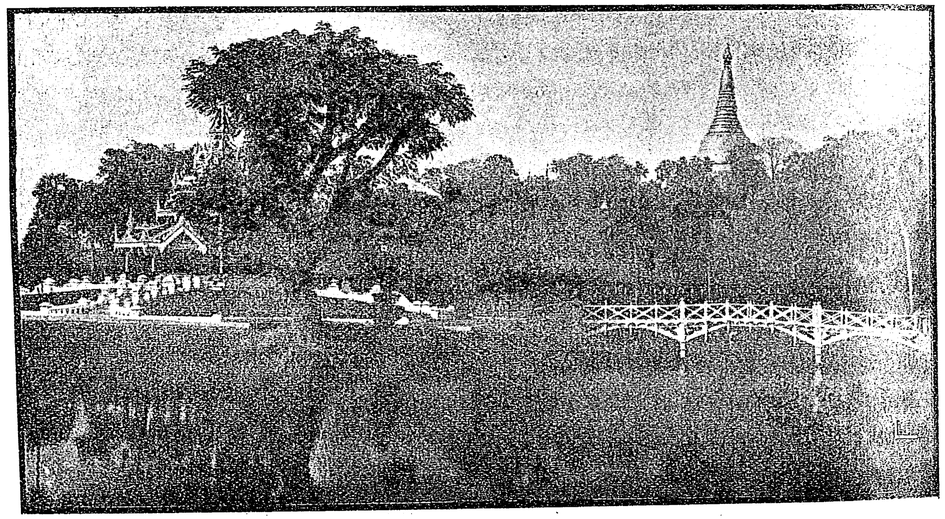

পাগোডা ও উদ্যান—রেঙ্গুন

সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে যেন বেমানান হয়নি। কলকাতার উপকূলবর্ত্তী সৌধের মত নয় তারা, আর এক ছাঁদের হয়ে নূতন দেশের নূতনত্বের অংশ যেন তারাও বহন করছে।

মানুষের হাত পেরিয়ে আকাশ যেখানে দেবতার হাতে পৌঁছেচে, সেই অন্তরীক্ষেই সেদিন কিন্তু আসল কারিগরি দেখলুম। কে এক চিত্রকর এমন তুলি হাতে সেখানটায় এঁকেছেন, দেখলে অবাক্ হতে হয়। বোধ হয় তিনি রোজই আঁকেন—সমতল বাঙ্গলায় আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা সূর্য্যোদয় দেখি যখন সূর্য্য আকাশে খানিকটা চড়েছেন, একখানা সোনার থালার মত। কিন্তু সেদিন যে সূর্য্য আঁকা দেখলুম, সে যথার্থই বাল-সূর্য্য, গালখানি টক্‌টকে, শিশুর মত কোমল স্থির নির্ব্বাক দৃষ্টিতে ধরণীর প্রতি চেয়ে রয়েছে। আর নদীর দর্পণে নিজের মুখখানি দেখে বিস্ময়-বিস্ফারিত হচ্ছে।

তারপরে, ডাঙ্গায় নেমে আর এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। সহরের যেখানেই যাও, যেদিকেই ঘোরো ফেলো এক একটি অভ্রভেদী সোনালী টোপর নগরকোতোয়ালের মত নগরের প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে। নবাগতের দৃষ্টি যেমন ক্রমাগতই তাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, তাদেরও দৃষ্টি নবাগতের প্রতি প্রতিমুহূর্ত্তে আপতিত রয়েছে। কলকাতার মত ট্রাম, মোটর ও বাস্‌বহুল আধুনিক সহরের বুকের ভিতরই তাদের প্রতিষ্ঠা। টোপরযুক্ত রক্ষীগুলির শরীর নীচের দিকে ক্রমশঃ স্ফীত ও বিস্তারিত হয়ে এক একটি গম্বুজের আকার ধারণ করেছে। চূড়ায় সমৃদ্ধি ও গর্ভে শান্তির বার্ত্তাবহ

এই সৌধগুলি এক একটি বৌদ্ধ মন্দির বা পাগোডা; এদের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ শোয়ে-ডাগন, আর একটি সুলে-পাগোডা। এই মন্দির ও তাদের সংশ্লিষ্ট সাধু আবাসগুলি ভারতবিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ-জীবনপদ্ধতি বর্ম্মায়িত হয়ে এখানে যে বিশেষতা লাভ করেছে তা প্রতিপদে ব্যক্ত করছে। রেঙ্গুনের রাজপথে নানাজাতির বিচরণ, তার বাণিজ্য ব্যাপারে সর্ব্ব-জাতির সমানাধিকার, কিন্তু সে যে বর্ম্মীর দেশ, তার সেই বর্ম্মীত্ব, বর্ম্মীপ্রাণ ও প্রকৃতির বিশেষত্ব সমস্ত কলকোলাহলের মধ্যে একটা নিজস্ব সুরের মত এই মন্দিরগুলিতে পরিস্ফুট হয়ে আছে।

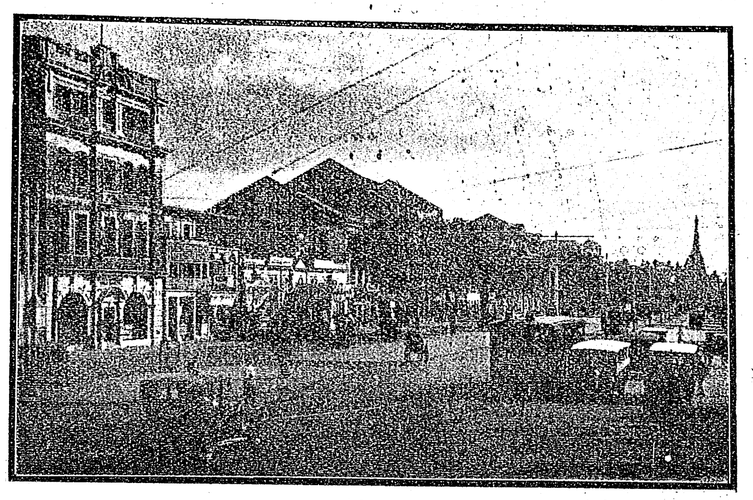

বার ষ্ট্রীটের অপর দৃশ্য—রেঙ্গুন

কলকাতা যে বাঙ্গালীর দেশ, কলকাতার সার্ব্বজনীনতার মধ্যে সেই বাঙ্গালীত্বের কোন বাহ্য পরিচয় পাওয়া যায় কি? কোথায় ফুটে আছে? কোন্ স্থাপত্যে বা কোন্ কারু-কার্য্যে? নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশ শিবমন্দিরে ছাড়া করেনি। বর্ম্মীদের মন্দিরের মত সেগুলি অভ্রভেদী হয়ে দিনে সোনায় ও জহরতে এবং রাত্রে বিজলির দীপমালায়

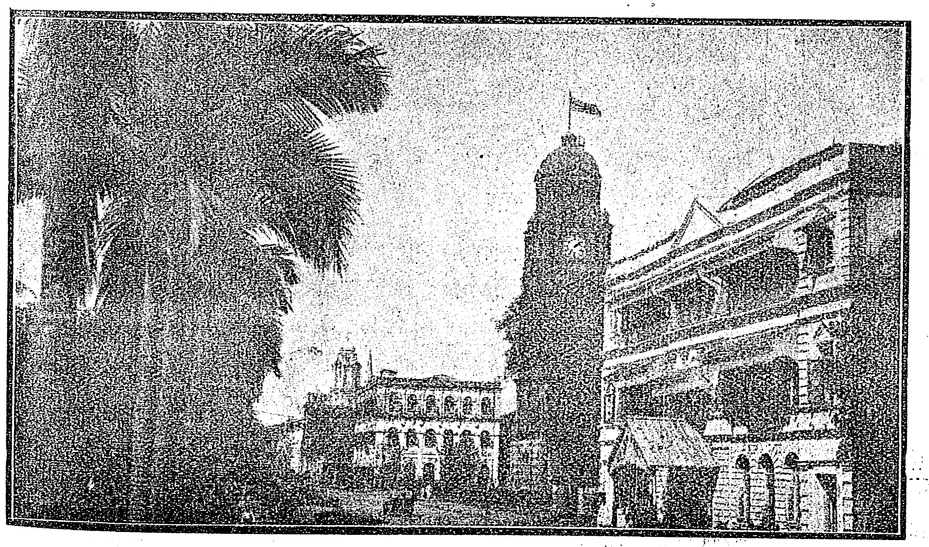

বার ষ্ট্রীট—রেঙ্গুন

বর্ম্মাদেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই এই প্রশ্ন মনে উদয় হতে লাগল—সারাটা বঙ্গদেশের গায়ে বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ঝক্‌ঝকিয়ে দূরদূরান্তর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের মন্দিরগুলির মত ভাস্কর্য্যের

কোন গরিমাও তাদের নেই। আর ভিতরের দৃশ্যেও কত প্রভেদ। থাক, সে কথা পরে বলব।

রেঙ্গুনে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বন্দরখানা ছোট। এক একজন মানুষের নিরীহ চেহারার পিছনে যেমন কখন কখন একটা প্রচণ্ড জীবন-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকে, এই বন্দরের পিছনে সরহখানাও তেমনি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বাইরে থেকে তার কোন আভাষ পাওয়া যায় না। ডক পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লেই প্রথমত দেখা যায় দক্ষিণভারতের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের মত কেবলই অর্দ্ধ-উলঙ্গ মাথার সামনেটা কামান, পিছনে বেনে খোঁপা বাঁধা বা ঘাড়-পর্য্যন্ত-লম্বমান-চুল মাদ্রাজী কুলি ও রিক্‌শ-ওয়ালার দল। এক বৎসর পূর্ব্বে এদেরই সঙ্গে বর্ম্মী কুলিদের ভীষণ দাঙ্গা

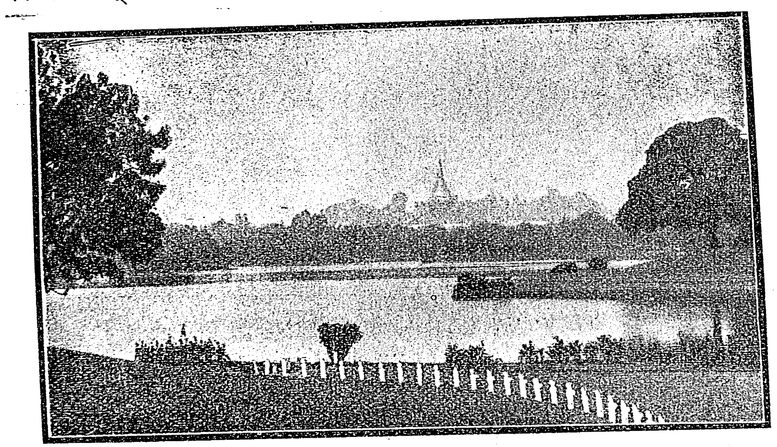

সরকারী হ্রদ—রেঙ্গুন

হয়ে গেছে, যেমন সে বছর ঢাকায় পুলিসের চোখের উপর হিন্দু ও মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল। এদের নিরস্ত্র আত্মীয় স্বজনদের ছোট ছোট গলির মধ্যে অবরুদ্ধ করে মারপিট ও হত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছিল। সেই অবধি নাকি হাজার হাজার বিদেশী কুলি বর্ম্মা থেকে দেশে ফিরে গেছে।

কলকাতা যেমন সার্ব্বজনীন সহর, তার কোন কোন পাড়ায় বাঙ্গালীর মুখ প্রায় দেখাই যায় না, রেঙ্গুনও তাই; এরও রাস্তাবিশেষে বর্ম্মীমুখদর্শন দুর্লভ। ছোটলোক মাদ্রাজীর পর ভদ্রলোক গুজরাটীর সংখ্যা এখানে খুব বেশী, তাছাড়া ভারতীয় মুসলমান ভদ্র ও অভদ্র সব রকমের। তাদের মধ্যে যারা এখানে বিয়ে থাওয়া করে ঘরবসত করছে, তাদের একটা স্বতন্ত্র নামই হয়ে গেছে—'জেরবাদি'। পথে ঘাটে বাঙ্গালী খুব বেশী দেখা যায় না, পাঞ্জাবীও না, কিন্তু পরে অভিজ্ঞতা লাভ হল বর্ম্মার বন্দরে কন্দরে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর অধিষ্ঠান।

প্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রামী, মণিপুরী ও আরাকান বাঙ্গালীর গতিবিধি ত এখানে আছেই, তাদের রক্তে বর্ম্মী রক্তও অনেকটা মিশ্রিত হয়েছে, তাদের ভাষা আচার-ব্যবহারও বর্ম্মী হয়ে গেছে—তথাপি ধর্ম্ম ও সঙ্গীতগত একটা স্বাতন্ত্র্য তারা আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করে এসেছে—সে বিষয়ে পরে বলব। কিন্তু আধুনিক ব্রিটিশ শাসনের অঙ্গীভূত বাঙ্গালীর সমাবেশ এখানে অত্যধিক। তাঁরা প্রায়ই উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা চাকুরে; ব্যবসায়ী খুব অল্প। পাঞ্জাবীরা একেবারেই আধুনিক। তাঁদের মধ্যে চাকুরে ছাড়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকও অনেক আছেন।

রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙ্গালীদের গৃহিণী ও কন্যারা একদিন সভা করে আমার সঙ্গে মিলনোৎসুক —এ সম্বাদ স্বামী শ্যামানন্দ তীর্থ পদার্পণের পূর্ব্বেই আমাকে জানিয়েছিলেন, এবং উত্তর বর্ম্মার মেমিও নামক পার্ব্বত্য সহরে আর্য্যসমাজের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবাসী পাঞ্জাবী এবং তাঁদের গৃহিণীরাও আমায় আমন্ত্রণ-অভিলাষী—একজন পাঞ্জাবী ডাক্তারের প্রমুখ এ সম্বাদও জাহাজ থেকে উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম।

দেশের মেয়ে দেশের লোকের সঙ্গে দেখাশুনার আনন্দলাভের জন্য আগ্রাহান্বিত ত ছিলুমই;—কিন্তু যে নূতন দেশে এসেছি সেই দেশের নরনারীর সঙ্গে, তাঁদের আচার-বিচার, রীতিনীতি, কাব্য-ইতিহাস, কলা ও কারু সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের জন্যেও বিশেষ লোলুপ ছিলুম। সে লোভ চরিতার্থতার সুযোগ যে গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করলুম সেই গৃহে প্রশস্ততম—এ কথা প্রত্যেক ভারতবাসী

আমায় জানাবেন। জষ্টিস সেন ও তাঁর গৃহিণীর বন্ধুমণ্ডলটি সুবিস্তৃত, এবং তাঁদের বন্ধুবাৎসল্য সুপ্রসিদ্ধ। কি স্বদেশী কি বিদেশী, কি ভারতীয় কি বর্ম্মীয়, কি আর্ম্মানী কি পারসী, কি বাঙালী কি গুজরাটী—সকলের সঙ্গেই তাঁদের মেলামেশা ও হৃদ্যতার আদান-প্রদান সমভাবে প্রবর্ত্তিত। তাই তাঁরা রেঙ্গুনে সর্ব্বলোকপ্রিয়। প্রতিদিনই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেতে থাকলুম।

অতিথিসৎকার-পটীয়সী সখা আমার জানতেন যে কেবল ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে, আরামে আদরে যত্নে

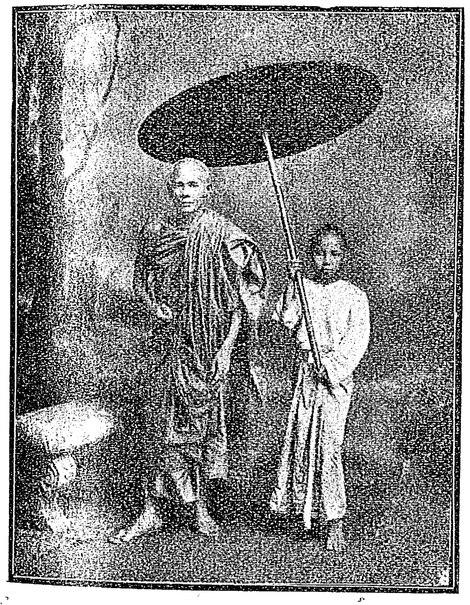

বৌদ্ধ-পুরোহিত

রেখেই তাঁর অতিথিসেবা সম্পূর্ণ হবে না;—যতক্ষণ না বর্ম্মার যা কিছু দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য তা আমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর কর্ত্তব্যের অবসান নেই। এই আদর্শ-আতিথ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি জানবার আগে, ভাববার আগে, বলবার আগে তিনি আমায় বর্ম্মার সর্ব্বতোরস উপভোগ করাবার জন্যে চিন্তিত থাকতেন, এবং ভিতরে ভিতরে তার আয়োজন করতেন। যার নিজের রসবোধ নেই, সে অপরকে রসাস্বাদনের জন্যে ভাবিত হয় না। তাঁর নিজের রসগ্রাহিতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, —কেশবচন্দ্রের কন্যা ত তিনি,—তাঁর অতিথিকেও রসদানে তাই এত আগ্রহান্বিত থাকতেন।



ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা

আমি রেঙ্গুনে এসেছি একটা গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে,—বর্ম্মা প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করতে।



কবরীর ফুলসাজ

সমস্ত দিনটা তাতে ব্যাপৃত থাকি। তার ঠাট সব রাজনৈতিক সভার মত। প্রেসিডেণ্টের 'ব্যাজ' ধারণ করে "বন্দে

মাতরম্” ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লাইন করা ভলান্টিয়ারদের ‘স্যালুট’ গ্রহণ করে, লাল কাপড় পাতা নির্দ্দিষ্ট পথে সভাস্থলে প্রবেশ করে, সহস্র সহস্র ভারতবাসীদের সঙ্গে সম্মিলিত হই। বৌদ্ধ ও মস্‌লিম ভাইদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য রক্ষা করে বর্ম্মাপ্রবাসী হিন্দুদের হিতকল্পে যত কিছু প্রস্তাব ও পন্থা ভাবা যেতে পারে, তার পর্য্যালোচনায় সাহায্য করি। তর্ক-বিতর্ক, বাক্‌বিতণ্ডা, রাগারাগি ও দলাদলির সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সভার কার্য্যতরীখানি বেয়ে চলি। সারাদিনের পর শ্রান্তক্লান্ত দেহে বন্ধু-গৃহে ফিরি। সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্রামান্তে সতেজ হয়ে উঠে তাঁর আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করি।



ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা ধূমপান করিতেছে

তাঁর প্রথম রাত্রির আয়োজন হল দুটি উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট বর্ম্মী বন্ধুকে তাঁর গৃহে ডিনারে আমন্ত্রণ করা। ইতিপূর্ব্বে সকালেই একজন ‘লীডার’ আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন ‘মাউঙ নাম—’। তারপরে আসেন ‘চমিন’। দুজনেই যুবা ও দুজনেই ন্যাস্‌নলিষ্ট। মাউঙ বাল্যকাল হতেই ভারতবর্ষে হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত, থিয়সিফিষ্টদের হাতে মানুষ; তাই ভারতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহযুক্ত, ভারতবর্ষ থেকে বর্ম্মা-ব্যবচ্ছেদের অত্যন্ত বিরোধী ও সেই দলের অন্যতম নেতা; চমিনও তাই। চমিন ভারত কৌন্সিলের একজন সদস্য। ইনি গল্প করলেন, গত বৎসর দিল্লী থেকে মহাত্মা গান্ধী যখন বম্বে ফিরে যান ইনি ষ্টেসনে ছিলেন। যে বিপুল জনতা মহাত্মাজীকে বিদায় দিতে গিয়েছিল, সেই হাজার হাজার লোকের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন তিনজন মাত্র খদ্দরপরিহিত নয়—সেই তিনজনের মধ্যে একজন তিনি—বাকী সকলের পরিধানে শুভ্র খদ্দর। সেই শুভ্র স্বদেশীয়তার প্রচণ্ড প্রভাব তাঁর হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হল, তিনি সেই মুহূর্ত্তে অনুভব করলেন—ভারতীয় ন্যাসনালিজ্‌মের শক্তি কোথায়, এবং শিক্ষালাভ করলেন বর্ম্মায় তাঁদের মত নেতাদের কি কর্ত্তব্য।

মাউঙ ভারতবিচ্ছেদ নিবারণের জন্য তীব্রভাবে

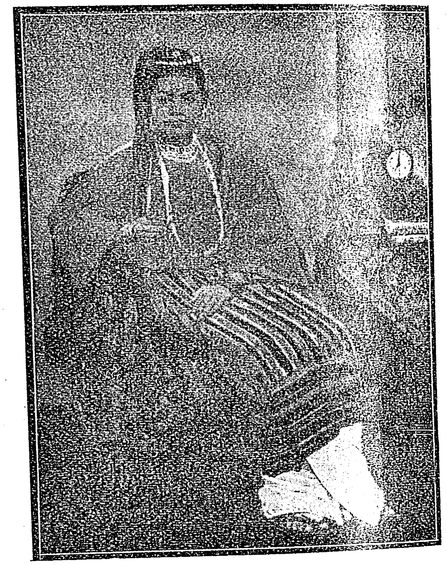

ব্রহ্ম সুন্দরী

প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁর এ বিষয়ে ছাপান কাগজপত্র ও পুস্তিকা সকল আমায় দিয়ে গেলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সবরমতি আশ্রম পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন, ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আবার শীঘ্রই ভারতে ফিরে যাবেন, এবং সেখান থেকে বিলেত যাবেন। মাউঙ ও চমিন দুজনেরই পোষাক ভদ্রশ্রেণীর বর্ম্মীয়োচিত,—রেসমি লুঙ্গি, রেসমি চীনে-কাটের কুর্ত্তা, ও রেসমি রুমালের ছোট পাগড়ি—এমন সুশ্রী, এমন ফিটফাট, এমন ক্যাসি ড্রেস উপযুক্ত—চোখ জুড়িয়ে যায়। আমি চমিনকে বল “তোমরা যে একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ভিতর রয়ে

তা তোমাদের পোষাক দেখলে মনে হয় না। যুদ্ধে নেমেও ভারতবাসীর মত সব শোভা সৌন্দর্য্য তোমাদের ত্যাগ করতে হয়নি সে ভাল।”

তিনি বল্লেন—“আমাদের দেশেও খদ্দর হয়, তাকে আমরা বলি ‘পিনি’, গরীবগুরবারা পরে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেটা ন্যাশনালিষ্টদের পরিধান করে আনব।”

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জাহাজে ফার্ষ্ট ক্লাসে এক-জন ন্যাশনালিষ্ট বর্ম্মীকে পিনির কুর্ত্তা পরিহিত দেখলুম,—সাদা নয়, আমাদের দেশের ফিকে খাকি খদ্দর। কিন্তু রঙচঙে রেসমি লুঙ্গি ও পাগড়ি থাকায় তাতে ঠাটের কিছুমাত্র ন্যূনতা হয়নি।

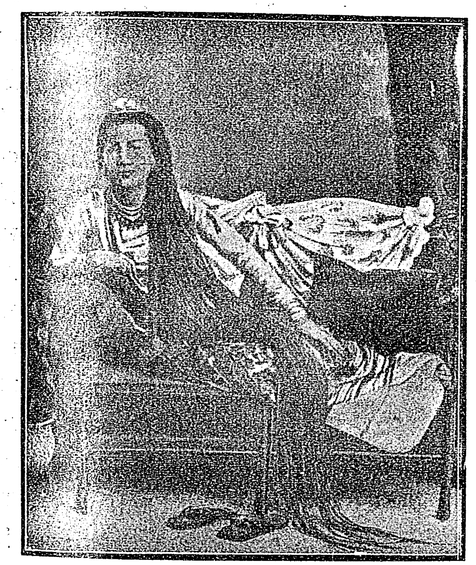

সুকেশা ব্রহ্ম-মহিলা—(কেশবতী কন্যা)

মিসেস সেন তাঁর গৃহে সান্ধ্যভোজে যে দুজন বর্ম্মা বন্ধুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন, তার মধ্যে একজন সস্ত্রীক মিষ্টার বার্দুন এবং আর একজন পর্ত্তুন্। বার্দুন উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, পলিটিক্সের ধার ধারেন না; পর্ত্তুন ব্যারিষ্টার ও একটি পোলিটিকাল দলের নেতা।

বার্দুন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। বর্ম্মার ইতিহাস, সাহিত্যকলা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান তাঁর অগাধ। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী ও ভারি একটি সৌকুমার্য্যসম্পন্না। তাঁর বেশভূষায় কথাবার্ত্তায় এমন একটি মোহিনী আছে যা বর্ম্মী মেয়েদের বিশেষত্ব।

পর্ত্তুনের পত্নী আমেরিকান, আজ অসুস্থ বলে আসতে পারেন নি। পর্ত্তুন ইংরেজী ডিনার স্যুটে বিভূষিত হয়ে এসেছেন, বর্ম্মার আত্মা যেন তাঁর দেহত্যাগ করে চলে গেছে মনে হল। এর পরে আর একদিন তিনি সস্ত্রীক চায়ের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, সেদিন কিন্তু বর্ম্মীজ পোষাকে শোভিত ছিলেন। সেদিন তাঁর দেহের ভিতর স্বাভাবিক মানুষটাকেও যেন চেনা যাচ্ছিল।

বার্দুনের কথায় জানতে পারলুম, আদৎ যে বর্ম্মা জাতি, তারা নিজেদের মূলতঃ তিব্বতী আর্য্য জাতি বলে বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষের প্রতি তাদের বিশেষ টান নেই। বৌদ্ধধর্ম্মগত যে টান সেটা সিংহলের উপরেই বেশী পড়েছে।



বীণ-বাদক

কেননা প্রথম প্রথম উত্তরপূর্ব্ববঙ্গ থেকে বৌদ্ধ প্রচারকের দল বর্ম্মাদেশে অভিযান করলেও শেষাশেষি সিংহলের মহাযান-পন্থার বৌদ্ধধর্ম্মই তাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করেছে; সিংহল থেকে বুদ্ধের দন্ত প্রভৃতি অনেক স্মৃতি-চিহ্নও তারা লাভ করেছে; তাই প্রায় দুতিন শতাব্দী থেকে সিংহলের সঙ্গেই বর্ম্মার বৌদ্ধদের বেশী ঘনিষ্ঠতা, এবং সিংহলে যাতায়াতও বেশী।

এদিকে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সংঘর্ষে বর্ম্মাস্থ ভারতবর্ষীয়দের প্রতি অনেক বর্ম্মীরা সম্প্রতি বিশেষভাবে

বিমুখ হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রতি তাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ঋণ একেবারে ভুলে যাবার যোগাড় হয়েছে। হিন্দু মহাসভার সভানেত্রী যে বৃহত্তর ভারতের স্বপ্ন ও সন্দেশ নিয়ে এখানে উপনীত হয়েছে, তার কর্ণকুহরে বর্ম্মীমুখপ্রসূত এ-সব তথ্যগুলি বড় শ্রুতিমধুর হল না। কিন্তু বার্দুন এ-সব ঝগড়াঝাঁটির ধার ধারেন না। সকলের সঙ্গে মেলা-মেশাতেই তাঁর আনন্দ। ভারতবর্ষ থেকে যে কোন খ্যাতনামা লোক আসেন তাঁদেরই তিনি সম্বর্দ্ধনা করেন। লাহোরের তথা-কথিত বৌদ্ধ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর স্বজাতি, পণ্ডিত শিবনারায়ণ একবার বর্ম্মা

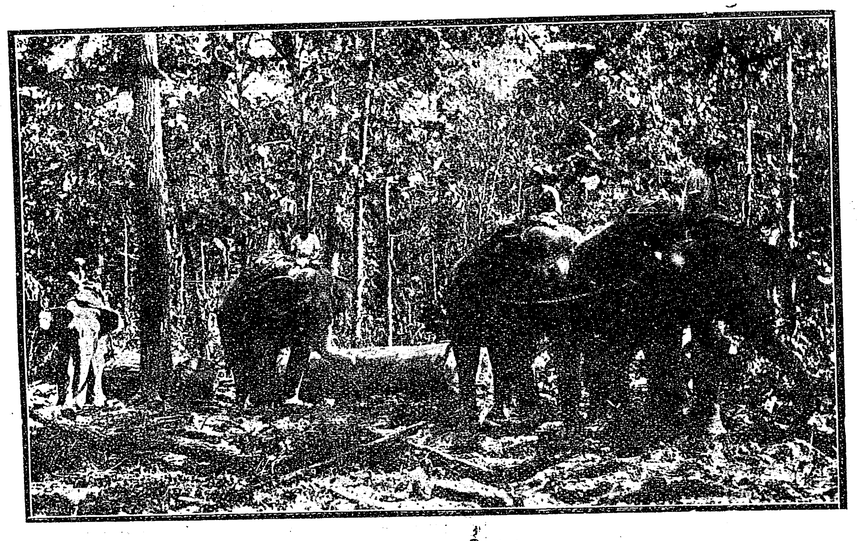

রেঙ্গুনের হস্তী (২)

পরিভ্রমণে আসার পর বার্দুনের পরম বন্ধু হয়েছেন। পূজনীয় মাতুল রবীন্দ্রনাথকেও নাকি তিনি বর্ম্মী কলাগহনের মধ্যে পরিচালিত করেছেন। ভারতবর্ষে কিন্তু কখন যান নি; সিংহলে ও শ্যামে যেতেই তাঁর সমস্ত অবসর কেটে যায়। আমায় তার পরদিন প্রভাতে শোয়েডাগন পাগোডা দেখানর ভার তাঁরা নিলেন। তার বর্ণনা পরে দেব।

দুদিন পরে আমার জন্যে বার্দুন একটা মস্ত বড় বার্ম্মীজ ভোজের আয়োজন করলেন। সে রাত্রি বাকী সকল নিমন্ত্রিতদের জন্যে কিছু কিছু আমিষ খাদ্য থাকলেও আমার হিতকল্পে মিসেস বার্দুনের স্বহস্তে রাঁধা বর্ম্মীজ নিরামিষ ব্যঞ্জনে টেবিল ভরে গিয়েছিল। তিনি নিজে সে-দিন আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে পারেন নি। বর্ম্মীজ-চটিপরা-পায়ে দুখানা টেবিলে দ্রুতগতিতে পরিবেশন করতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, আমাদের সঙ্গে বসে খাবার তাঁর তিলমাত্র অবসর ছিল না। আমি আনারির মত খাচ্ছি লক্ষ্য করে, আমার প্রতি বিশেষ স্নেহে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলেকে মা যেমন সব মেখেচুকে খাইয়ে দেয়, তেমনি আমার প্লেটে একরাশ বার্মিচেলি সিদ্ধ ভাতের মত তুলে দিয়ে, তাতে সব রকম ব্যঞ্জন একত্রে মিশিয়ে অনেকটা তেঁতুলগুলা ঢেলে সুমিষ্টভাবে বল্লেন—"এইবার ঠিক হয়েছে, ভাল করে খান।" তরকারিগুলি অধিকাংশ সামুদ্রিক ঘাসের। আমি প্রত্যেকটা একটু একটু করে খেলে হয়ত বেশী স্বাদ গ্রহণ করতে পারতুম—কিন্তু সেটা বর্ম্মীজ রীতি হত না। গৃহকর্ত্রী যে ভাবে মিশিয়ে দিলেন সেটা ঠিক বর্ম্মীজ কায়দা, কিন্তু তাতে সে রাত্রে আমি প্রায় অভুক্তই থেকে গেলুম। দু একটি গ্রাস কষ্টে-সৃষ্টে গলাধঃকরণ করে, শেষে দু একটা আম খেয়ে ক্ষুধার তৃপ্তি করলুম। আমার পাশে মাউঙ ছিলেন। তিনি স্বদেশী নিরামিষ খাদ্যের দিব্যি মান রক্ষা করলেন। স্বাদ জিনিষটা অভ্যাসের বশবর্ত্তী। যে জিনিষটা যে রকম ভাবে আমরা খেতে অভ্যস্ত সেই রকমেই সুস্বাদু লাগে, অন্যথা রুচিকর হতে কিছু সময় চাই। সেই একই জিনিষ মিসেস সেন একদিন নিজের বাড়ীতে বাঙালী রকমে রেঁধে আমায় খাওয়ালেন, পরম উপাদেয় লাগল।

সে-দিন টেবিলে আর একটা জিনিষ ছিল। 'ডোরিয়ান্' নামে কাঁঠাল জাতীয় এক ফল আমার জন্যে

বিশেষ করে আনা হয়েছিল। এই ফল সম্বন্ধে আমার সখীর কাছে ইতিপূর্ব্বেই আমি বর্ণনা শুনেছিলুম যে, এ ফল ভাঙবার সময় এক মাইল দূর থেকে এর উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হতে হয়—খাওয়াও সকলের সাধ্য নয়। কিন্তু সামনা-সামনি ভাঙা হয়নি বলে, শুধু কতকগুলি কোয়া টেবিলে রাখা ছিল বলে বোধ হয় গন্ধের কোন তীব্রতা কেউ অনুভব করেনি। কোয়াগুলো খেয়ে যা দেখলুম, তাতে কিছু সুস্বাদ না পেলেও বিশেষ কিছু বিস্বাদও পেলুম না, নিকৃষ্ট জাতের নেও কাঁঠালের মত মনে হল। বাড়ী ফিরে এসে আমার বান্ধবী, এবং তাঁর স্বামী ও কন্যারা আমায় খুব বাহাদুরী দিলেন, বল্লেন —"বীরাঙ্গনা বটে! নয় ত প্রথমবারেই ডোরিয়ান এমন নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করলে।"

আমার সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্যে বার্দুন সাহেব সেদিন তাঁদের দেশের চারপাঁচ নব্য যুবতীকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটি খ্রীষ্টান, আবাল্য মিশনরিদের হাতে মানুষ, কলেজে পাশ করা—নাকে মুখে চোখে কথা কন। মাউঙও সে ডিনারে উপস্থিত ছিলেন বলেছি। তিনি থিয়সফিষ্ট, সুতরাং নিরামিষাশী, তাছাড়া কোন কোন ইঙ্গবঙ্গ বা ইঙ্গবর্ম্ম যুবকের

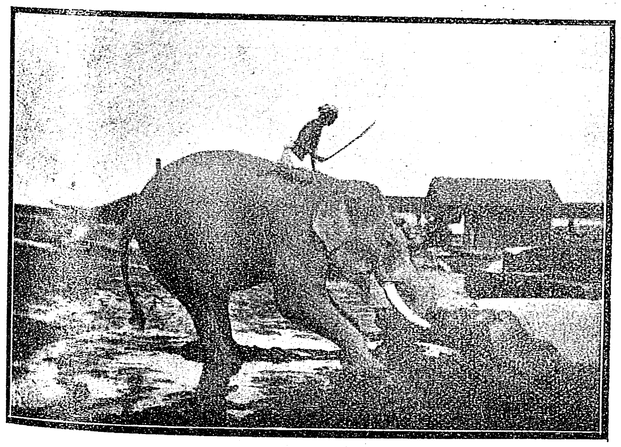

কার্য্যনিরত হস্তী

মত ডিনার টেবিলে কথার তুবড়ি চালাতে পারেন না। তাঁর ভিতর একটি প্রাচ্য সৌম্য সংযম আছে। এই সবগুলি কারণে পূর্ব্বোক্ত নব্য বর্ম্মীজ মেয়েটির তিনি বিশেষভাবে উপহাসের পাত্র দেখলুম। ভদ্রলোককে প্রতি পদে পদে সে মেয়েটি বাক্যবাণে দিগ্ধ করতে লাগল। মাঙচ তাঁর শোভন ধৈর্য্যের বলে নিজেকে অক্ষত রাখলেন। বরঞ্চ শ্রোতারা শুনে শুনে হাসির আড়ালে অধীর হতে থাকল।

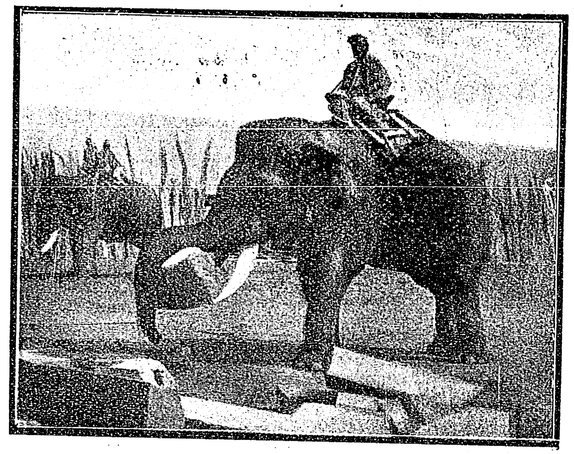

রেঙ্গুনের হস্তী (১)

মাউঙ আমাকে একবার নেপথ্যে বললেন—"এ মেয়েটিকে বর্ম্মিজ শিক্ষিত মেয়েদের আদর্শ ভাবলে একটা ভুল ধারণা নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ আমাদের মেয়েরা এ রকম নয়, তারা শিষ্ট ও সংযত, এ মেয়েটি মিশনরি শিক্ষার ফল।"

তা সত্য। দোষে গুণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্পর্শের নমুনা এ মেয়েটি। দোষগুলি উপেক্ষা করলে দেখা যায় সে অনেক গুণে গুণান্বিতা। সে গুণগুলি ফুটবার অবসর পেয়েছে মিশনরিদের কল্যাণে। সে গান গায় অতি সুন্দর। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে সিদ্ধ গায়িকা, আবার ইংরেজী হাল গানে, মজার গানে, নাচুনে গানে, প্রেমের গানেও পরিপক্ক। তার মুখে সুমিষ্ট, বর্ম্মীজ গানও শুনলুম; আমি তখনি তখনি তার স্বরলিপি করে নিলুম। সামাজিক সম্মিলনীতে যে কোন সমাজে তার পাসপোর্ট সহজলভ্য। এমন হাসিমুখা, জীবন্ত, প্রাণবন্ত মেয়ে

উপস্থিত সবাইকেই প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রাচ্য সমাজের আদর্শ তা হয় ত নয়; কিন্তু মনুষ্য সমাজে সেটা সর্ব্বত্র আদরণীয়। মেয়েটি শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাবে—বিলেতের সমাজে সে নিজের মার্কা মারতে পারবে সন্দেহ নেই।

এ দিকে যতই ইংরেজী প্রভাবন্বিতা হোক্, সে সাজ-সজ্জায় সম্পূর্ণ বার্মিজ। ইংরেজী পোষাক ও প্রসাধনের চেয়ে বর্ম্মীজ বেশে ও কেশবিন্যাসে যে তাদের আকর্ষণী শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হবে, সে বিষয়ে নব্য বর্ম্মীজ মেয়েদের মেয়েলি বুদ্ধি টন্‌টনে আছে। নিজের চুলটা পিছন থেকে আঁচড়িয়ে মাথার মধ্যিখানে তুলে নিয়ে পরিপাটি করে একটা ছোট বিঁড়ে মত করে তারা খোপে দেয়। তারপরে



হস্তী কাষ্ঠ টানিতেছে

পরচুলা নিয়ে সেই গোল ভিত্তির চারপাশে জড়িয়ে জড়িয়ে সেটাকে বড় ও উঁচু করে তোলে। যে যত উঁচু করতে চায় সে ততগুলো পরচুলা ব্যবহার করে। মধ্যে মধ্যে সুচারু কাঁটা ও চিরুণি বসায়। খোঁপার উচ্চতার পরিমাপ ফ্যাসনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। এই মেয়েটি একবার সগর্ব্বে বললে--তার খোঁপায় তার দিদিমার চুলের পরচুলা জড়ান।

নব্য বর্ম্মিণীদের কাপড়ের ফ্যাসানে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। রঙিন ঘাঘরা বা লুঙ্গির সঙ্গে উপরের জামাটা এখন শুভ্র শ্বেতরঙের পরা ফ্যাসন হয়েছে। তাও খুব পাৎলা হওয়া চাই, যেন ভিতরের লেসওয়ালা বডিস সকলের চক্ষুগোচর হয়। এ তথ্যটা একজন বিবিয়ানার বিরোধী বর্ম্মীজ পুরুষের সকাশাৎ লাভ করি। নব্য সহুরে মেয়েদের পরিধানে আর একটী বিশেষত্ব দেখা যায়। তাদের গলায় একটি সাদা শিফনের ছোট স্কার্ফ বা উড়নী থাকে, তাতে সাদা জামার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়।

খ্রীষ্টান মেয়েটি ছাড়া আরও দুটি কুমারী মেয়ে ছিল—তারা দুই বোন। তারাও নব্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, কিন্তু পুরাকালের মেয়েদেরই মত স্বল্পভাষিণী। তাদের মধ্যে একজন চিত্রকর ও একজন সঙ্গীতানুশীলনপর। চিত্রকর মেয়েটি একমাস পরে নিজের চিত্রের একটি প্রদর্শনী খুলবে তার আয়োজন করছে। সঙ্গীতপরায়ণা মেয়েটি বর্ম্মীজ সঙ্গীতে ইংরেজী হার্ম্মনি কি করে ঢোকান যায় তার অনুসন্ধানে রত। মিসেস সেনের অনুরোধে আমার রচিত হার্ম্মনিযুক্ত দুই একটি বাঙ্গলা গান তাদের শোনান হল।

একটি বিবাহিত বর্ম্মীজ মেয়ে স্বামীসহ সে ডিনারে উপস্থিত ছিল; সে একেবারে চুপচাপ। শুনলুম বিবাহের পূর্ব্বে সে খুব চটপটে ও কইয়ে-বলিয়ে ছিল। ভদ্র বর্ম্মীজ পরিবারের রীতি অনুসারে বিবাহের পর তাকে এই রকম মৌন স্থবির ভাব ধারণ করতে হয়েছে। অনেকের ধারণা বর্ম্মার স্ত্রীরা পুরুষপরতন্ত্র নয়, অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আমার বন্ধুরা বল্লেন সেটা ভ্রান্তধারণা। তাদের পর্দ্দা নেই বটে, তারা ইচ্ছে করলে নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করতে পারে বটে, কিন্তু ভদ্র-ঘরের বর্ম্মীজ পত্নী কখন পরপুরুষের সঙ্গে বেশী মেশামিশি, কথা-কওয়াকয়ি করে না। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় আদর্শ ও বর্ম্মী আদর্শ একই। একটি বর্ম্ম ফরাসী দম্পতি ছিলেন। ফরাসী পত্নীর ভারতবর্ষের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ, কোনদিন হয়ত ভারতবর্ষে আসবেন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করছেন। কিন্তু স্বামীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনলুম তার থেকে মনে হল না, সে আশা অচিরে পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা আছে। তাঁর স্বামী বর্ম্মীজ 'বীণা' বাজান, আমাদের বাজিয়ে শুনালেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বর্ম্মীজ ভদ্রলোক বর্ম্মীজ তবলার সঙ্গত রাখলেন। সে বীণাকে বর্ম্মী

ভারতবর্ষীয়েরা বলেন কাঠতরঙ্গ। একখানা নৌকাকৃতি কাঠের উপর সাতখানা চওড়া লোহার পাতের পরদা, দুধারে দুটি ছিদ্রে সুতো দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। সাতখানা পরদা—সা, রে, মা, পা, নি, র্সা, র্রে, 'কোমল' এই সাতটা সুরে বাঁধা। যতই গান বা বাজনা হোক্ না, ঐ কটা সুর অতিক্রম করে সরগমের আর কোন সুর স্পর্শ করার যো নেই। তাই প্রত্যেক বর্ম্মা সঙ্গীত গান্ধার ও ধৈবৎ বর্জ্জিত কতকটা আমাদের সারঙ্গের মত।

মিসেস সেন আমায় বর্ম্মার 'পোয়ে' নাচ দেখাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন, তার সুযোগ যখন তখন হয় না। বার্দ্দুন শুনে বল্লেন "আমার এক ভাইঝির বিয়ে পরশু, তদুপলক্ষ্যে পোয়ে হবে। যদি অনুমতি দেন আপনার অতিথিকে সকালে বিয়েতে ও বিকেলে পোয়েতে নিয়ে যাব।"

মিসেস সেন যেন আমার হয়ে চাঁদ হাতে পেলেন, আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে ব'ল্লেন—"আশাতীত সুযোগ। বর্ম্মীজ বিয়ে ও 'পোয়ে' দুই দেখতে পাবে। কি শুভক্ষণে এসেছ।"

বর্ম্মার শ্বেত হস্তীর কথা উঠল। তাঁরা বল্লেন শ্বেত হস্তী আর দেখা যায় না, তবে বর্ম্মা শেল কোম্পানীতে ও অন্যত্র হাতী দিয়ে ভারতোলা দেখা একটা দর্শনীয়

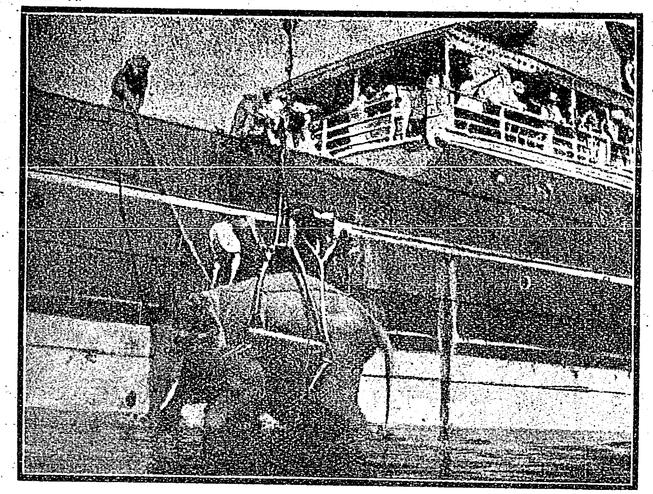

জাহাজে হাতী-তোলা

বস্তু বটে; কিন্তু সে কারখানাগুলিও এখন বন্ধ। তার ছবি সংগৃহীত হতে পারে। অনেক রাত্রে ডিনার পার্টি ভঙ্গ হল। পরদিন বিয়ে ও নাচ দেখার আশা মনে রেখে আমরা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করলুম।

পুরানো দপ্তর

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল্

ছুটীর দিন।...

অত্যন্ত অলস ভাবে ছোট্ট বাগানখানিতে বসে' আছি—শীতের রোদটুকু পিঠে বেশ মিষ্ট আমেজ দিচ্ছে। মনে কোনো চিন্তার বালাই নেই; খালি চায়ের পেয়ালাটি নিশ্চিন্ত আরামের স্মৃতিটুকু নিয়ে সাম্‌নে পড়ে' আছে।

আটবছরের কন্যা এসে বল্লে, ও বাবা! এই দেখ, কী কাণ্ড হ'য়েচে। কি কর্‌বে কর এগুলো নিয়ে।

হাতে তার একটা অতি জীর্ণ ন্যাকড়ায় বাঁধা ছোট দপ্তর।

বিরক্ত হ'য়ে বললুম, কি হবে ওটা নিয়ে? কোত্থেকে নিয়ে এলি?

—মা দিলে গো! দেখচ' না, সব রুই ধরেচে!...

ভিতর থেকে গৃহিণী গম্ভীরস্বরে মেয়েকে সমর্থন করে' যা বল্‌লেন, তা হ'তে এইটুকু বুঝলুম, তিনি আজ ছুটীর অবসরে ঘরের জিনিষপত্র ঝাড়ামোছা কর্‌তে উঠে পড়ে' লেগেচেন। এই উই-ধরা দপ্তরটিতে কি-সব কাগজপত্র আছে, দেখেশুনে রাখবার আমার ওপর হুকুম হ'য়েচে।

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই দপ্তরটি নিয়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে তার বাঁধন খুলে ফেল্‌লুম।

খুলেই বুঝ্‌লুম, এই মহামূল্য সম্পত্তিটি আমার নয়, আমার স্বর্গগতা পিসিমাতার। মরবার সময় তিনি তাঁর এই সম্পত্তিটি আর একটী ভাঙ্গা টিনের ট্রাঙ্ক আমারই কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন।

দপ্তরটির ভিতর থেকে এক-একটি জিনিষ বার করে' নিয়ে তার ধূলো ঝেড়ে রাখ্‌তে লাগলুম। অতি জীর্ণ তেলে-ভেজা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আবাঁধা তারকনাথের ছবি, স্কুলপাঠ্য গ্রামার ইত্যাদি। তাদের সঙ্গে আছে আর তিনটি জিনিষ, দু'খানি পোষ্টকার্ডে লেখা চিঠি, আর একখানি প্রীতি-উপহার।···

এই পোষ্টকার্ড ও প্রীতি-উপহারগুলি আমি একে একে পড়্‌তে বসলুম;—অলস মনের একটা খোরাক জুটে গেল।·····

প্রথম চিঠিখানি লিখেচেন, পিসিমার বড় ছেলে নারাণ। প্রবাস থেকে সে লিখ্‌চে, মা, আমি যে পরীক্ষায় সফল হ'য়েছি, সেটা কেবলই তোমার ঐকান্তিক চেষ্টা ও শুভেচ্ছার ফলে। আর, এই সফলতা সার্থক হবে শুধু সেইদিনই, যেদিন আমি তোমার দুঃখ-অভাব ঘোচাতে পারবো।·····

দ্বিতীয় চিঠিখানি পিসিমার ছোট ছেলে রেণুর লেখা। সে লিখেচে, মা, আমি দাদার মত লেখাপড়া শিখ্‌তে পারলুম না বলে' সবাই দুঃখ করে, আমারও সত্যই দুঃখ হয়। কিন্তু আবার এটুকু না-ভেবেও আমি পারিনে যে, যে-লেখাপড়ার ফলে ছেলে বৌকে নিয়ে বিদেশে চাকরী করতে চলে' যায়, আর মা থাকেন গ্রামে পড়ে' ভিটেয় প্রদীপ জ্বাল্‌তে, সে রকম লেখাপড়া আমার কপালে সহ্য হবে না ব'লেই বোধ হয় আমি আজ মূর্খ!···

শেষে রেণু লিখেচে, মা, মূর্খ ছেলে ব'লেই তুমি হতাশ হ'য়ো না।···এমন দিন আমারও আস্‌বে, যেদিন তোমার এই মূর্খ ছেলেই তোমার মুখে হাসি আন্‌তে পার্‌বে।···

·····ঐ দুটী ছেলেকে নিয়ে পিসিমা অল্প বয়সে বিধবা হন। আমাদেরই বাড়ীতে তিনি তাঁর ছেলে দুটীকে মানুষ করেছিলেন। নারাণ বি-এ পাশ করে' বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে' বিদেশে চাক্‌রী করতে চলে' গেল বউকে সঙ্গে নিয়ে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে মাকে কিছু সাহায্য কর্‌তো, কিন্তু সে কু-অভ্যাস সে শীঘ্রই ত্যাগ করেছিল।·····

আর রেণু,—মায়ের কোলের ছেলে বলে' অত্যধিক আদরে সরস্বতীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হ'লো, কিন্তু সমস্ত দোষকে ছাপিয়েও ঐ একটা অতিবড় গুণ তার জেগে রইল, তার অসীম মাতৃভক্তি!···

সেই রেণু যখন সে-বছর হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে তার মায়ের কোলে মাথা রেখে পরপারের দিকে চলে' গেল, সে-দিনটা এখনো আমার চোখে স্পষ্ট জেগে রয়েছে।··· তখন তার বয়স আঠারো বছর।···তার ঐ চিঠিতে যে ভবিষ্যতের দিনটি সম্বন্ধে সে তার মায়ের কাছে আশার বাণী শুনিয়েছে, সে-দিনটি আস্‌বার পূর্ব্বেই ভগবান্ তাকে তাঁর চিরন্তনের ডাক শুনিয়ে দিয়েছিলেন।···

আর নারাণ? সে এখনও দিল্লীতে সরকারী কর্ম্মচারী, চার-পাঁচটী ছেলে-মেয়ে নিয়ে তার এখন পরিপূর্ণ সংসার।···সেই নারাণেরই হাত থেকে কোনো দিন যে তার দুঃখিনী মায়ের দুঃখকষ্ট ঘোচাবার অতিবড় অলীক ইচ্ছা লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সে কথা বোধ হয় সে আজ নিজেই বিশ্বাস কর্‌তে পারবে না।·····

আমার অলস মস্তিষ্ক ক্রমশঃ জটিল চিন্তায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। পূর্ণাহুতি দিলে ঐ ১৩২২ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখের লেখা প্রীতি-উপহারখানি।···

ষোল বৎসর পূর্ব্বে তরুণ মনের রাশি-রাশি কল্পনা নিয়ে ঐ প্রীতি-উপহারখানি আমিই লিখেছিলুম, আমার ছোট বোন্ অরুণার বিয়েতে।·····

···মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা!···কিন্তু, এই ষোল বৎসরের মধ্যে কী না ঘটে গিয়েছে!·····

কত ধূমধামের মধ্যে—কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িয়ে অরুণার সে বিয়ে! বাড়ীর ছোট মেয়ে, রং ছিল তার কালো, কিন্তু বড় আদুরে, বড় অভিমানী ছিল অরুণা!··· পাছে শ্বশুরবাড়ীতে তার কোনো কষ্ট, কোনো কথা সহ্য কর্‌তে হয়, বাবা-মা তাই সাধ্যের অতিরিক্ত দান-সামগ্রী তত্ত্বতাবাস পাঠাতেন। কিন্তু তাতেও বড়লোকের আদুরে মেয়ে' বলে' শ্বশুরবাড়ীতে তার উপর টিকা-টিপ্পনী চল্‌তে লাগ্‌লো।

···মা দুঃখ কর্‌তেন, বাবা বোঝাতেন; অমন একটুতে চঞ্চল হ'লে কি চলে! বাঙ্গালীর মেয়ের বৌ-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তেই হবে!

বিশেষ কিছু জান্‌বার আমাদের উপায় ছিল না। বুদ্ধিমতী মেয়ে শ্বশুরবাড়ীর কোনরূপ নিন্দা আমাদের কাছে কর্‌তো না। কিন্তু তবু এটুকু বুঝ্‌তুম, অরুণা সুখে ছিল না।·····

এমনি ক'রেই কেটে গেল তিন বৎসর। হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, অরুণার সাংঘাতিক অসুখ, বাঁচে কি না!

···বাবা ছুটে গেলেন ডাক্তার নিয়ে।···গেলেন সকালে, ফিরে এলেন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই!

অসুখের খবর মিথ্যা,—আসল ব্যাপার, অরুণা কেরোসিনে পুড়ে' ম'রেছিল। বাবা যাবার পূর্ব্বেই লাস নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল শ্মশানে।

···অরু মরে' গেল, আত্মহত্যা কর্‌লে; কিন্তু কেন, কি তার হ'য়েছিল, কী অব্যক্ত দারুণ যন্ত্রণা তার বুকে বাজ্‌লো, সেটা সে জলন্ত আগুনের চেয়েও অসহ্য মনে কর্‌লে, তার কোনো খবরই আমরা পেলুম না।···শ্বশুর-বাড়ীতে তার শোনা গেল, কিছুই তো হয়নি, কেন যে অমন কর্‌লে, তা তাঁরাও বুঝ্‌তে পারেন না!

···ব্যস্, এই পর্য্যন্ত! আর কিছু না।·····

·····সে আজ তের বৎসরের কথা!

তার পর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ঐ অরুর স্মৃতি তিলে-তিলে তাঁকেও দগ্ধ করেচে!···কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে তিনি বল্‌তেন, ওরে, যে অরুর মরা দেহ আগুনে পুড়্‌তে দেখ্‌লেও আমি পাগল হ'য়ে যেতুম, সেই অরু আমার টাট্‌কা আগুনে পুড়েচে!···কতবড় আগুন তার বুকে জ্বলেছিল, যার জ্বালা সে আগুন নইলে ঠাণ্ডা কর্‌তে পার্‌লে না?···

·····সেই অরুর বিয়েতে আমারই লেখা ঐ প্রীতি-উপহার! চক্‌চকে মোটা কাগজে টক্‌টকে লাল অক্ষরে ছাপা ঐ কবিতা!···কিন্তু, কতবড় মিথ্যা সে!·····

লিখেছিলুম,—

* * *

ঐ অচেনার ঘরে ব'সো গিয়ে বোন
চির-আপনার বেশে,—
যেথা স্নেহ-ভালবাসা প্রীতির নিঝর
অমিয়-সাগরে মেশে;—

* * *

এতবড় মিথ্যাবাদ—এতবড় অলীক স্বপ্ন আর যে কিছু সংসারে হ'তে পারে, তা আমি আজ ভাব্‌তে পারি না। কিন্তু, ষোল বৎসর আগে যখন ঐ কথাগুলি আমার প্রাণ থেকে বেরিয়েছিল, তখন কতখানি রঙীন কল্পনা আমার চোখে ও মনে সোণার কাঠি বুলিয়ে দিয়েছিল!·····

'মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন!'···কথাটা শুনে আস্‌চি জ্ঞানের উন্মেষ থেকেই, কিন্তু এই পরম সত্যকে কোনো গুরুই এ পর্য্যন্ত আমাকে এমন করে' বোঝাতে পারেন নি, যেমন বুঝিয়ে দিলে এই উইয়ে-খাওয়া পুরানো দপ্তরটি!··· প্রকাণ্ড এক মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে' কেমন আমরা মশ্‌গুল হ'য়ে জীবনের দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছি!···যখন সেই মিথ্যা ধরা পড়্‌বে, তখনো আমাদের চৈতন্য হয় কৈ? সেই ঘা-খাওয়া মনই তো আবার নিত্য-নূতন কত রং-বেরংএর তাসের-বাড়ী গড়ে তুল্‌চে!·····

···ঐ নারাণ-রেণুর চিঠি, আর অরুর বিয়ের এই প্রীতি-উপহার, কত আবেগ, কত সহৃদয়তা জমা হ'য়ে আছে ওদের প্রতি ছত্রে-ছত্রে। কিন্তু সত্যিকারের সবই যে ভুয়ো, সবই যে মিথ্যা, সবই যে আত্মপ্রবঞ্চনা, এ কথা আজ কেমন সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি!·····

ছুটীর দিনের অলস মুহূর্ত্তগুলি হঠাৎ এক উত্তাল চিন্তার তরঙ্গে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। এম্‌নি করে' তন্ময় হ'য়ে যখন বসে' আছি, তখন গৃহিণী খোকাকে কোলে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে কাছে এসে বল্‌লেন, শুন্‌লে গো, ছেলের কথা! ওর পকেটে ঐ যে চারটে পয়সা জমেচে, তাই থেকে ও দু'পয়সার বাড়ী, আর দু'পয়সার মোটর গাড়ী কিন্‌বে।

—বলে' খোকার পানে-মুখে চুমু দিয়ে-দিয়ে বলে' উঠ্‌লেন, ছেলের কি সবই আজগুবি!···

মনের কোন্ কুয়াসা-ঘেরা প্রান্ত থেকে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।·····

হা রে সংসার! কোন্‌টা তোমার আজগুবি নয়? শিশুর মনের ঐ সরল আকাঙ্ক্ষা আজ যে-ভাবে অলীক মনে হচ্চে, ঠিক তেমনিই তো কত সুচিন্তিত আশার বাণী মাত্র ক'টা বৎসরের ব্যবধান অতিক্রম করে' অলীক এবং অসম্ভব হ'য়ে আমাদের চোখে ধরা পড়চে, আর ব'লে দিচ্চে, কত নগণ্য এই মানুষ, আর কত নগণ্য তার আশা-আকাঙ্ক্ষা!·····

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ঢাক-ঢোল বাজাইয়া যাঁহারা দান করিয়া থাকেন, নামের প্রয়াসী হইয়া যাঁহারা দান করেন, তাঁহাদের দান - দান বটে, সাধারণের তাহাতে মঙ্গলও হয় বটে, কিন্তু উহাতে যে স্বার্থের গন্ধ থাকে, সেই কারণে উহার মাহাত্ম্যের কতকটা অপচয় ঘটে। কিন্তু যাঁহারা নাম হইবে বলিয়া দান করেন না, যাঁহারা বিনা আড়ম্বরে দান করেন, তাঁহাদের দানই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান; এইরূপ দানেই ধনের যথার্থ সদ্ব্যয় হয়। ইহার সহিত যদি দাতার বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ স্বীকার করিতেই হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তের অধ্যাপনার সুব্যবস্থা আছে। এই অধ্যাপনার জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাও আছে। এই বৃত্তির নাম শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বৃত্তি। যে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় এই বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেদান্তশিক্ষার্থী ছাত্রমণ্ডলী এবং বাঙ্গলাদেশের অধিবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় জনসাধারণ সবিশেষ অবগত নহেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, দাতা নামের প্রয়াসী ছিলেন না। বেদান্তের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ-বশতঃ বেদান্তচর্চ্চার সাহায্যার্থ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তিনি আত্মতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন মাত্র। আজ আমরা বহু চেষ্টায় দাতার জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতেছি।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিকবংশে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বসু মল্লিকবংশের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কাঁটাগড় গ্রামে ছিল। জ্ঞানালোচনা ও জনহিতকর কার্য্যের জন্য এই বসু মল্লিকবংশ চিরদিনই প্রসিদ্ধ। শ্রীগোপাল বসু মল্লিক এই বংশের উপযুক্ত বংশধর।

শ্রীগোপাল বাবুর পিতা রাধানাথ বসু মল্লিক মহাশয়ের নামে পটলডাঙ্গার একটি রাস্তার নাম আছে। রাধানাথ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। শ্রীগোপাল অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেও পিতৃপরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির সহিত তাঁহার সদ্‌গুণাবলীরও অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি যেমন অসাধারণ ছিল, তিনিও তদ্রূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পরম স্নেহভাজন ছিলেন।

শৈশবকাল হইতেই জ্ঞানার্জ্জনে শ্রীগোপালের অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মে। সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং অচিরে 'কন্টিনেণ্টাল' অর্থাৎ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা, এবং এই শাস্ত্রে নব-নব জ্ঞানার্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রত্যহ তিন চারিজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বেদান্ত-দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা চলিত। বেদান্তের প্রতি তাঁহার এমন গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, মৃত্যুকালে উইল করিয়া বেদান্ত-বৃত্তি স্থাপনের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার উইলের সর্ত্তানুযায়ী ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে বোদ্ধ অধ্যাপনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে, এক একজন বেদান্ত-অধ্যাপক তিন তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। তিনি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবেন এবং মৌলিক গবেষণা করিবেন। অধ্যাপকের মাসিক বৃত্তি পরিমাণ হইবে ১২৫ টাকা। তিন বৎসর অন্তে তিনি আরও থোক ১৪০০ টাকা পাইবেন। তাঁহার অধ্যাপ ও গবেষণার ফল, সংস্কৃত ভাষা, বিশেষতঃ বেদান্তচর্চ্চা সহায়তাকল্পে ঐ থোক টাকা হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রি হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের ৪০০ খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা

এবং ১০০ খণ্ড দাতার বংশধরগণ তাঁহাদিগের বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণার্থ প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট পুস্তক ও টাকা অধ্যাপক স্বয়ং প্রাপ্ত হইবেন। এই বৃত্তির টাকা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীগোপাল ফেলোসিপ লেকচারারের" চেয়ার স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীগোপালের বিদ্যানুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল, নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভে তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা তাঁহার পারিবারিক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। এই সমুদয় পুস্তক তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে গ্রন্থাগারটি সুসজ্জিত। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য বিষয়ক বহু দুরূহ ও দুর্লভ গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়া এই দুই শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

যিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত—শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শ্রীগোপাল বৃত্তি। দরিদ্র সন্তানরা অর্থাভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিতে তিনি সদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দুস্থ হিন্দু বিধবাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার জননী ৺ বিন্দুবাসিনীর নামে একটি তহবিল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই তহবিল হইতে অসহায়া বিধবা-দিগের অভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী দুই-চারি টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত, ইহার অনুরূপ আরও বহু সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

প্লেগ নামক মহামারী যখন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা আক্রমণ করে, তৎকালে শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়ের দুঃখকাতর চিত্ত দুষ্ট প্লেগ রোগীদিগের দুঃখে বিগলিত হইয়া উঠে। সেই জন্য তিনি হ্যারিসন রোডস্থ তিনখানি বৃহৎ অট্টালিকা প্লেগরোগীদিগের হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ছাড়িয়া দেন।

হিন্দু-সুলভ ধর্ম্মপ্রবণতা ও ভগবদ্ভক্তি তাঁহাতে অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ শ্রীধরজীর সেবার্থ উইল করিয়া দিয়া যান।

স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন তখন, শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন জানিয়া, এই অনুষ্ঠানের পক্ষ হইতে এক ভদ্রলোক বসু মল্লিক মহাশয়ের নিকট আসিয়া চাঁদার জন্য আবেদন করেন। শ্রীগোপাল বাবু এই অনুষ্ঠানে এককালীন বহু অর্থ প্রদান করেন। চাঁদার খাতায় টাকার অঙ্ক লিখিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবার সময় তিনি চাঁদা-সংগ্রাহক ভদ্রলোককে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যে এই দানের কথা যেন প্রকাশ করা না হয়। নাম জাহির করা সম্বন্ধে এরূপ ঔদাসীন্য এ দেশ কেন, কোন দেশেই বিশেষ সুলভ নহে।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজাইয়া নাম জাহির করিয়া সদনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি ছিলেন নীরব কর্ম্মী। তাই তিনি নীরবে নিঃস্বার্থ ভাবে বহু সদনুষ্ঠান করিলেও এবং বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিলেও, আজও তাঁহার বহু অবদানের কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের অজ্ঞাত। বঙ্গীয় সমাজে এমন আদর্শ চরিত্র সুদুর্লভ।

সন ১৩০৬ সালের ১০ই চৈত্র (১৯০০খৃঃ, ২৩এ মার্চ্চ) দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ন নরনারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক এই মহাত্মা অমরধামে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সদনুষ্ঠানগুলির কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। তাঁহার নশ্বর দেহ ধ্বংস হইলেও তাঁহার কীর্ত্তিগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীগোপাল বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয় পিতৃ অনুষ্ঠিত সকল কীর্ত্তি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। তবে তিনি এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ায় তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মল্লিক ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসু মল্লিক এখন বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

বে-মানান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

(১)

ভাদ্র মাস।

তিন দিন আগে হইতে সেই যে বৃষ্টি পড়া সুরু করিয়াছে, তাহার যেন আর বিরাম বিশ্রাম ছিল না। তবে শেষের দিনে বৃষ্টির বেগটা কমিয়া গিয়াছিল বটে!

সহরের প্রান্ত;—খোলার বাড়ী ও কতকগুলি পাকা বাড়ী যেন গা-ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরের দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া আছে। সকলের অবস্থাই প্রায় সমান, অর্থাৎ চূণ-বালির নামগন্ধও নাই; জীর্ণ যক্ষ্মারোগীর মত শুধু দেহের ঠাট বজায় রাখিয়া যে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সহরের যে পথটা দুই পাশে বাড়ীগুলি ভাগ করিয়া দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া আবার দূরের দিকে মিলাইয়া গিয়াছিল, সেই পথে একখানা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি ঘড়্ ঘড় শব্দে পথিপার্শ্বস্থ ঘরবাড়ীর গাঁথুনীর মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলিয়া একখানা বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরের বাড়ীগুলির দৃশ্য দেখিয়া লইয়া বিনোদিনী মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর হইতে বন্ধ দরজা টপকাইয়া যে পুরুষটি নামিয়া আসিয়া কড়া নাড়িল, তাহার বয়স বোধ হয় চল্লিশের মধ্যে। একহারা লম্বা চেহারা, বর্ণ বোধ হয় আগে গৌরই ছিল, উপস্থিত তাম্রবর্ণ।

বেশের পারিপাট্যে—প্রথমেই নজরে পড়ে তাহার হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুল আদ্ধির চুড়ীদার, হাতে ছড়ি;—মাথার চুল ছ'আনা, দু'আনা, বার আনায় গন্ধতৈল সিক্ত, ফিরানো, এবং পায়ে পাম্পসু—···।

কড়া নাড়িতে নাড়িতে সে ব্যস্তস্বরে ডাকিল—

"মাসি,—বলি অ মাসি, দরজা কি খুলবে না? না দরজা থেকেই ফিরতে হবে?"

ভিতর হইতে অস্পষ্টস্বরে—নারী-কণ্ঠের উত্তর আসিল—"যাই"—তাহার পরই যে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল, সে একটি রমণী—বয়স কুড়ি বাইশের মধ্যে, কাল, লম্বা, একহারা।

কালাপাড় শাড়ীর আঁচলখানা ঘুরাইয়া স্কন্ধে ফেলিতে ফেলিতে হাসিয়া—অথচ অভিমানাহত স্বরে কহিল—"বৌ—নিয়ে এলে বুঝি?"

পরেশ এই দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তাই সে সেই হাসিটুকুর জবাবে হাসিল কি না ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু কণ্ঠস্বর গাড়ির মধ্যে উপবিষ্টা বিনোদিনীর কানে আসিয়া বাজিল—

"হু—ম্···।"

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসির শব্দ কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেই, বিনোদিনী শিহরিয়া আরও একটু জড়সড় হইয়া বসিতেই, গাড়ির নিকটে আসিয়া মেয়েটি পাদানে পা দিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরে হঠাৎ দুই হাতে বিনোদিনীর নত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—"বাঃ—বেশ নোলক নাকে ঘোমটাবতী ক'নে বউটি তো!"···আবার সেই হাসি।

বিনোদিনী শিহরিল,—মুখ তুলিতে পারিল না। মুখ ছাড়িয়া দিয়া সে কহিল—"পরেশবাবু তোমায় নামিয়ে নিয়ে যেতে আমায় ভার দিয়েছেন; চল গো ওঠ, বৌ বরণ ক'রবার পাট তো আর এখানে নেই যে তোমায় বরণ করে, খই ছড়াতে ছড়াতে উলু দিয়ে,—কোলে ক'রে নিয়ে যাব। শুধুই এখানে উঠতে হয়; আর উঠবার ইচ্ছে না থাকলে জোর করে উঠাতেও আমাদের বাধে না;—বিশেষ এই বিন্দী,—সব পারে গো বৌ ঠাক্‌রুণ,—সব পারে।"···

বিন্দু তাহার হাত ধরিবার পূর্ব্বেই বিনোদিনী নামিয়া বিন্দুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ছোট্ট অঙ্গন;—চারি দিকে পায়রার খোপরের মত

ছোট ছোট মানুষ বাস করিবার খোপর;—আলো বাতাসের সংস্পর্শ তাহাদের সহিত নাই;—তাহারই পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সরু সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিয়াই মাসির—অর্থাৎ বাড়ীউলি···মাসির ঘর।

বিন্দুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাসির কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পরেশকে দেখিয়াই বিনোদিনী আবার এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিল। অনুমানে বুঝিল, খাটের উপরে শায়িতা প্রৌঢ়া নারীই পরেশের সালঙ্কারে বর্ণিত মাসি।

পায়ের ধূলা লইতে যাইতেই মাসি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল; খাটের একধার দেখাইয়া দিয়া কহিল—"বোস বাছা, বোস।"

বিন্দু হাসিয়া পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিল—"বউয়ের যে অতি-ভক্তি দেখছি গো পরেশবাবু,—একেবারে এসেই মাসিকে পেন্নাম!—একটু সামলে থেক' গো মাসি বোনপো,—কথায় আছে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ!" হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরেশ কহিল—"নীচে চললুম গো মাসি, দরকার হ'লে ডেকে পাঠিও।"

হাতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বাহির হইয়া গেল; একটু পরেই নিচে হইতে বিন্দুর হাসির সহিত তাহারই কণ্ঠের গান শোনা গেল—

মনে কি পড়িল বঁধু এতদিন পরে,—
বল,— কোন অপরাধে, পাশরিয়ে রাধে
ছিলে হে মানের ভরে!

পরেশের চাপা কণ্ঠস্বরও শোনা গেল—"চুপ্—চুপ্···"

(২)

বিনোদিনী দেখিল এ বাড়ীর বাসিন্দারা সকলেই স্ত্রীলোক, এবং অবস্থাও কাহার' কাহার' ভাল নহে,—অর্থাৎ এক একদিন প্রায় উপবাসেই কাটাইতে হয়;—কিন্তু সেই অনাহারে থাকিয়াও দৈন্যের মধ্যে দিন কাটাইয়াও বেলাশেষে তাহাদের সাজসজ্জার সে কি উৎসাহ! সে যেন মনের মধ্যে বিস্ময় জাগাইয়া দেয়।

সন্ধ্যার পরে ঐ আলো-বাতাসহীন কুঠুরীগুলিই যেন এক একটি সুরসভা হইয়া উঠিয়া, গানে, গন্ধে,—আলোয় আপনাদের দিনের দৈন্য ঢাকিয়া ফেলে; তাহার পরে—রাত্রি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক একবার শুধু ভাসিয়া আসে পানোন্মত্তদের বিকৃত কণ্ঠের অশ্লীল গান,—চীৎকারধ্বনি।—

বিনোদিনী শিহরিয়া উঠে। যেদিন রাত্রে পরেশ ঘরে থাকে সেদিন সে "ওগো,—শুনছো···"

পরেশ প্রায় বেহুঁস অবস্থাতেই ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহার পরে নিদ্রার গভীর অঙ্কে বিনা দ্বিধায় গা' ঢালিয়া দেয়। তাই তাহার ঘুম ভাঙ্গে না, অস্পষ্ট স্বরে হাত নাড়িয়া শুধু আশ্বাস দেয়—"হুম্···" তাহার পরে আবার চুপ। বিনোদিনী দিন দিন যেন শুকাইয়া উঠিতেছিল।

যে ঘরখানি তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা উপর তলার এক প্রান্তে,—প্রায় কাহারও এদিকে আসিবার সম্ভাবনা নাই। দিনের বেলা ছাড়া সেও ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় না।

মাসির ঘর আর এক প্রান্তে,—কিন্তু তাহার ঘরে বড় গোলমাল হয় না, মাসি বোধ হয় নির্জ্জনতাপ্রিয়! কিন্তু সবই যেন কেমন!

বিনোদিনী ভাবে, কই, ইহাদের সঙ্গে তাহার গ্রামবাসীদের তো কোনও দিক মেলে না! সমস্ত যেন কেমন ওলট-পালট হইয়া যায়; নিঃশব্দে শুধু ভাবে—কেন এমন হইল?···এতখানি অমিল সে মনের মধ্যে কেমন করিয়া মানাইয়া লইবে! অশ্রুবন্যা নামিয়া আসিতে চাহে আপনার অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে খোলা জানালার উপরে বসিয়া বিনোদিনী শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের রৌদ্রদগ্ধ আকাশের পানে চাহিয়া ছিল; হঠাৎ ডাক আসিল "ও-, বৌ—···!'

বিনোদিনী চমকিয়া মুখ ফিরাইল, দেখিল, মাসি তাহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

বিনোদিনী উঠিয়া আসিতেই মাসি' তাহাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল; বসিয়া কহিল—"সময় যেন আর একা একা কাটতে চায় না বাছা, তাই একবার তোমায় ডাকলাম! বলি,—দুটো পাকাচুল তোলাও হবে, কথা কয়ে হাঁপ্ ছাড়াও হবে; দাও তো বাছা দু'টো পাকাচুল তুলে, একটু স্বস্তি পাই···!

বিনোদিনী মাসির আদেশ মত নির্ব্বাকে পাকাচুল

তুলিয়া দিতেছিল, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাসি প্রশ্ন করিল—"তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা বাছা? কে কে আছে সেখানে?" পিত্রালয়ের বিষয়ে বিনোদিনীর বিবাহিত জীবনে এই প্রথম প্রশ্ন—! সে ধরা গলায় উত্তর দিল—"সে অনেক দূরে,—যেতে আসতে দু'দিন লাগে; বুড়ো বাপ্—আর একটি ছোট্ট ভাই আছে,—বেহারীগুরুর পাঠশালায় পড়ে; আর কেউ নেই।"

মাসি' তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখের সাইল; মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া আজই যেন প্রথম ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পরে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"পরেশ তোমায় বিয়ে ক'রে এনেছে, কেমন?"

মাথা নাড়িয়া বিনোদিনী জানাইল "হ্যাঁ,—"

মাসি ক্ষণকাল নতমুখে কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিল—

"তুমি নীচের কোন' মেয়ের সঙ্গে মিশো না, বুঝলে বৌ? যা দরকার হবে, তা তুমি আমায় ব'লবে। পরেশ যদি না এনে দেয়, আমি এনে দেব!"

বিনোদিনী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলে মাসি উঠিয়া গেল; কুলুঙ্গী হইতে আয়না চিরুণী ও গন্ধতৈল আনিয়া রুক্ষ, অসংযত চুলগুলিকে আঁচড়াইয়া সযত্নে খোঁপা বাঁধিয়া দিল; তাহার পরে কহিল—"বেলা পড়'লে গা ধুয়ে ফেল,' আমি ওপোরে জল দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

সেদিনকার এই পরিচয় যেন বিনোদিনীকে মাসির দিকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিল, কিন্তু তবু সে 'আপনার' বলিয়া ভাবিতে পারিল না, কোথায় যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য রহিল।

রাত্রে পরেশ ফিরিলে প্রশ্ন করিল—"তুমি না ব'লেছিলে মাসি' আর তোমার ঐ বোনেরা ছাড়া আর কেউ নেই, তবে মাসিই বা তোমার বোনেদের সঙ্গে আমায় মিশতে বারণ করলো কেন?'

নেশার ঘোরে অস্পষ্টস্বরে কি একটা জবাব দিয়া পরেশ পাশ ফিরিয়া শুইল, সাহস করিয়া বিনোদিনী তাহাকে আর কোনও প্রশ্ন করিল না।

(৩)

বেলা প্রায় দশটা।

মাসি' বাড়ী ছিল না,—বাহিরে কোন দরকারে গিয়াছিল; পরেশের তো দিনের বেলায় দেখা মেলাই ভার,—সুতরাং উপরতল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। শুধু নীচে হইতে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল বাসন মাজার শব্দ, আর ক্বচিৎ কাহারও কণ্ঠস্বর; সমস্ত বাড়ীখানা যেন উৎসবের পরে অবসাদের ঘোরে তন্দ্রামগ্ন;—প্রতিদিনকার ঘটনা ইহাই,—তাই আর বিস্ময় জাগায় না।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের বারান্দা হইতে বিন্দু তাহার 'বাজ খাঁই' গলায় হাঁকিল—"ওগো, ও বৌ-ঠাক্‌রুণ, চিঠি নিয়ে যাও, তোমার চিঠি এসেছে।"

রান্না চড়াইয়া বিনোদিনী নিশ্চলভাবে বসিয়া উনুনের আঁচের দিকে চাহিয়া ছিল। নামিয়া আসিতে আসিতে হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল—"আমার নামের চিঠি এসেছে, বিন্দুঠাকুরঝি?—"

নীচের বারান্দায় যে কয়জন মেয়ে উপস্থিত ছিল, সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিতেই বিনোদিনী যেন এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল।

পত্রখানা বিন্দু বিনোদিনীর হাতে দিতেই এক দিক হইতে মলিনা বলিয়া উঠিল—"ঠাকুরঝি' ব'লতে তোকে কে শিখিয়েছে সত্যি করে বল্‌তো ভাই বৌ, মাথার দিব্যি,—সত্যি কথা বলবি।"

বিনোদিনী কথা কহিল না, পত্রখানা হাতে লইয়া নির্ব্বাকে নতমুখে ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি কহিল—

"পরেশবাবু বুঝি?" হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিন্দু বলিয়া উঠিল—"সে না হ'লে আর অমন চৌকস্ বুদ্ধি কার হবে? যেমন চেহারা, তেমনি তো বিদ্যে বুদ্ধিরও দৌড় হবে!" নিজের রসিকতায় সে নিজেই হাসিয়া উঠিল, তাহার পরে বিনোদিনীর কানের কাছে মুখ আনিয়া স্পষ্টস্বরে কহিল—"ঠাকুরঝি নই লো, ঠাকুরঝি নই; পারিস্ তো সতীন ব'লে ডাকিস্।"

আবার একটা হাসির স্রোত চলিয়া গেল। দয়ার্দ্র চিত্তে পটলী কহিল—"আহাঃ,—কেন ওকে তোরা ওম্‌নি করে নাকালের একশেষ করিস বিনি! তোদেরও যেমন সং···"

নিষ্কৃতি পাইয়া বিনোদিনী উপরে চলিয়া আসিল, কিন্তু পিতার চিঠিখানা পড়িতে গিয়া অশ্রুজলের ধারায় একটা অক্ষরও স্পষ্ট দেখিতে পাইল না; দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া কাঁদিয়া ডাকিল "বাবা···গো···।"

সেদিন রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া পরেশ কহিল—"চিঠি এসেছে? ভালই। কিন্তু···এই গিয়ে···দেখ্ বৌ! এখন, কি বলে, হ্যাঁ,···এখন আমার বড় হাত টান,—সংসারের ব্যাপার তুইও তো বুঝিস, বুঝিয়ে আর কি ব'লতে হবে। তাই ব'লছি, তোর বাপের কাছ থেকে কিছু টাকা ধারই চেয়ে নে' না হয়; লেখ,—···পরে নয় আমিই সুদ্ শুদ্ধ আসল সব শুধে দেব।"

মুখে একটা কঠিন জবাব আসিয়াছিল, সামলাইয়া গিয়া বিনোদিনী কহিল,—"নিজের সংসারই যে ধার করে চালায়, মাসে মাসে দোকানদারের মুখ খিঁচুনী, গালাগাল সহ্য করেও ধার খেতে হয়,—কারণ পেটে না দিলে চলে না,—সে আবার তোমার জন্যে ধার করবে কোথা থেকে? কেউ কি বিশ্বাস ক'রে দেবে?"

পরেশ সোজা হইয়া বসিয়া বিরক্তি দমন করিতে গিয়াও পারিল না, উষ্ণতা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ হইয়া পড়িল; হাত নাড়িয়া কহিল—"আরে···চেষ্টা করে দেখতেই বা দোষ কি?"

"দোষাদোষ তুমি বুঝবে না, কারণ বুঝবার ক্ষমতা তুমি মদ্ খেয়ে হারিয়ে ফেলেছো। সে ক্ষমতা যদি তোমার থাকতো—"

উঠিয়া আসিয়া একটা ঠেলায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া পরেশ বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গেল—"কী,··· আমাকে মাতাল,—দুশ্চরিত্র বলা? মেয়ে মানুষের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমাকে আবার উপদেশ দিতে আসা? আমি দোষাদোষ বুঝি না! আমি মাতাল? আর উনি খুব সতী—না? আরে আমার শা···রে! রোস্ আজ, মজাখানা টের পাইয়ে দিচ্ছি, আজ বিন্দি পটলাদের সামনে—বাবুদের সামনে তোকে সোজা করছি, দাঁড়া!"

কিছুক্ষণ পরে সকলকে সঙ্গে লইয়া সত্যই সে যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল ঘোমটাবৃতা একটি নারীমূর্ত্তি দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে আর তাহার মাথার কাপড় ভিজাইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে তাজা রক্তের ধারা। আর বড় কিছু জুলুম সেদিন হইল না, মাসির ইঙ্গিতে সকলেই ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, রহিল শুধু মাসি ও বিনোদিনী। মাথার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে মাসি সকরুণ স্বরে কহিল "ওটা গোঁয়ার! অমন মানুষের সঙ্গে কি ঘর করা পোষায় রে বাছা! আর মানুষের সব সময়েই কি মনের ঠিক থাকে? হ'লেই বা মেয়েমানুষ! তার কি প্রাণে কোনও সাধ আহ্লাদই নেই? অঙ্গে তো একদিন একখানা ভালো কাপড় ছোঁয়াতে দেখ্‌লাম না, সোনার আঁচড় তো নয়ই। আমার বাড়ীতে র'য়েছে বলে ওকে এই বেশে দেখে লজ্জায় আমারই যেন গা কেমন করে; তার চেয়ে এবার থেকে তুই আমার মতে চল্ দিকি বৌ, দেখবি কখনও' কোনও দুঃখ তুই পাবি'নে! আর তখন ঐ পোড়ারমুখোর মুখে সাত ঝেঁটা মেরে·····"

বিনোদিনী একবার যেন সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

(৪)

তাহার পরে আজ প্রায় সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গিয়াছে; পরেশ আর এ' বাসামুখো হয় নাই, বিনোদিনীর সহিত দেখাও করে নাই। সে কোথায় আছে তাহাও বিনোদিনী জানে না। তবে মাসির ব্যবহারে সদয়তা যে দিন দিন বাড়িতেছিল তাহা অনুভব করিয়া একটা অজানা আশঙ্কায় দিবারাত্রি হৃদয় যেন কাঁপিতেছিল; কিন্তু এ আশঙ্কার সে কোনও হেতুই আবিষ্কার করিতে পারিতেছিল না।

রাত্রে দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া সে একাই শয়ন করে, কিন্তু গরমের জন্য খোলা থাকে পার্শ্বের জানালাটা। সেদিনও খোলাই ছিল,—হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই বিনোদিনীর মনে হইল খোলা জানালা হইতে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া কে তাহাকে দেখিতেছিল, হঠাৎ সাড়া পাইয়াই টর্চ্চ নিভাইয়া সরিয়া গেল।

প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া সে উঠিয়া বসিল,—চীৎকার স্বরে প্রশ্ন করিল "কে? কে ওখানে?"

কোনও উত্তর আসিল না, শুধু মনে হইল যেন কাহার পদশব্দ জানালার পার্শ্ব হইতে দূরে সরিয়া গেল।

কক্ষের অপর পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া বিনোদিনী দ্রুতপদে মাসির ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—"মাসি, ও মাসি!—"

ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া গেল, দুই হাতে চোখ ডলিতে

ডলিতে বাহিরে আসিয়া মাসি যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল; প্রশ্ন করিল—"এত রাত্রে বৌ যে? কি মনে ক'রে গো?—"

তাহার প্রশ্নে—গোপনতা সত্ত্বেও কোথায় যেন বিদ্রূপের একটু রেশ ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার সময় তখন বিনোদিনীর ছিল না, বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া যেন ঢেঁকির ঘা পড়িতেছিল; শুষ্কস্বরে সে বলিয়া উঠিল—"বড় ভয় করছে মাসি!—" আলো ও পদশব্দের কথা সে ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গেল।

মাসি কয়েকবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিল,—যেন বিনোদিনীর মুখখানা হইতে অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত এক নিশ্বাসে দেখিয়া লইতে চায়! তাহার পরে কহিল—"তাই না কি? তা—বাছা, পরেশবাবু কি আজ রাতেও ঘরে ফেরেনি?" কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন কেমন!

মাথা নাড়িয়া বিনোদিনী জানাইল—"না।"

মাসি হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; কহিল—"আর বোধ হয় সে আসবেও না বৌ, তোর ভয় নেই!"

ভয় নেই! মাসি কি বলিতে চাহে! বিনোদিনী শিহরিয়া মুখ তুলিতেই মাসি যেন ইচ্ছা করিয়াই মুখের ভাব বদল করিয়া ফেলিল; কহিল—"না—আমি সে সম্বন্ধে কিছু ব'লছিনে, বলছি যে, তুমি কিছু ভেব না বৌ—"

একটু থামিয়া যেন কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—"তুমি শোও গে, ভয় নেই—আমি জেগেই আছি, ফের যদি ভয় পায়, মাসি ব'লে একটা ডাক দিও।"

উত্তর পাইয়া বিনোদিনী আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিল, ও চতুর্দ্দিক বন্ধ করিয়া শুইল, কিন্তু আর ঘুম আসিল না। এক একবার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল নীচেকার কলরব, উল্লসিত হাসির ধ্বনি।

পরদিন সন্ধ্যায় মাসি যখন বিনোদিনীর চুল বাঁধিয়া, আগ্রহাতিশয্যে একখানা পরিষ্কার শাড়ী পরাইয়া ও নিজের খরচে জলখাবার খাওয়াইয়া কোন কাজে বাহির হইয়া গেল, তখন মাসির যত্নের চুল বাঁধা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে কেন যে সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহা বিনোদিনী নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

ঠিক এমনি সময়ে নিঃশব্দ পদে যে আসিয়া দ্বারের উপরে দাঁড়াইল, সে মাসি নহে, পরেশও নহে; বিন্দু। বিন্দু ডাকিল—"বৌ—ওগো ঠাক্‌রুণ!"

জ্বলিয়া উঠিয়া বিনোদিনী চীৎকার করিয়া উঠিল—

"বেরোও আমার ঘর থেকে, তোমাদের মুখ দেখতে পর্য্যন্ত আজ আমার ঘেন্না করছে। শীগ্‌গির আমার সামনে থেকে সরে যাও,—নইলে—"

অন্য কোনও দিন হইলে ইহার উত্তরে বিন্দু কি বলিত, করিত, তাহা অনুমান করা শক্ত, কিন্তু সে আজ চীৎকার করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিল না, বাহির হইয়াও গেল না, যেন আহত স্বরেই বলিয়া উঠিল—"একটা কথাও কি আজ আমার মুখ থেকে শুনতে চাও না বৌ? সত্যিই কি তুমি আমায় এত ঘেন্না কর?"

বিনোদিনী মুখ তুলিয়া চাহিল,—দেখিল সে বিন্দুর সহিত এ বিন্দুর শুধু সাজসজ্জায় নয়, মুখের ভাবেও সম্পূর্ণ ভিন্নতা আছে। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া লইয়া কহিল—"না, কি ব'লবে শীগ্‌গির বল।"

বিন্দু বার কয়েক পশ্চাতে চাহিয়া পায়ে পায়ে সরিয়া আসিল, কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—

"নিজেকে বাঁচাতে চাও? যদি চাও, তবে তাড়াতাড়ি কথার উত্তর দাও, দেরী কোর' না। কারণ, হয় তো এখনই মাসি এসে পড়বে।"

বিনোদিনী ক্ষণকাল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অধীর স্বরে বিন্দু বলিয়া উঠিল—"শীগ্‌গির বল, আমার সময় নেই···"

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিনোদিনী বলিয়া উঠিল—"চাই।"

বিন্দু কহিল—"তাহ'লে সব গুছিয়ে রেখ, কি দু'একের মধ্যে একটা সুবিধে ক'রে তোমায় তোমার বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব। যার সঙ্গে তোমায় পাঠা জেন, সে বিশ্বাসী। আর যদি না যেতে চাও,—ত জেন,—যে আমাদের দশা ছাড়াআর কোনও পথ—"

হঠাৎ তাহার হাত দুইখানা জড়াইয়া ধরিয়া রো জড়িত স্বরে বিনোদিনী বলিয়া উঠিল—"আমায় বাঁচাও,—ওগো—আমায় তুমি বাঁচাও।"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে বিন্দু বলিয়া গেল,—

"চেষ্টা করব এই-পর্য্যন্ত বলতে পারি,—ব্যস্ত হ'য়ো আর আজ রাতে ঘরের দরজা খুলো না···সাবধান।"

সে চলিয়া গেল, বিনোদিনীও উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

··· ··· ··· ···

দিন দুই পরে মাসির সহিত বাসায় প্রবেশ করিয়াই পরেশ চীৎকার করিয়া ডাকিল—"বিন্দি!—"

বিন্দু এই ডাকটির জন্যই সম্ভব প্রস্তুত ছিল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত পরেশ তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িল—"বল্ হারামজাদি, আমার বৌকে কোথায় পাঠিয়েছিস্, বল শীগ্‌গির!" বিন্দুর তুলনায় পরেশ কৃশকায়, জোরও প্রায় সমানই; তাই এক ঝট্‌কায় তাহার আক্রমণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বিন্দু সরিয়া দাঁড়াইল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোর গলায় উত্তর দিল—"চুলোয়,—যেখানে তোর মত স্বামী নেই,—তোর মন্ত্রী ঐ মাসি নেই, আর এই জাত-ধর্ম্মখাগী বিন্দিও নেই—সেইখানে পাঠিয়েছি; পারিস্ তো নালিশ পুলিশ করে নিগে যা।"

"তোকে আমি খুন্ ক'রবো, তাতে ফাঁসি যেতে হয় সেও বি আচ্ছা, তবু আমি তোর রক্ত দেখব আজ; আমার নাম পরশা, জানিস! তোর মত কত শত বিন্দিকে মেরে টিট্ ক'রে দিয়েছি; আজ তোর পালা···"

পরেশ অগ্রসর হইয়া যাইতেই মাসি বাধা দিল···"আহা কি কর পরেশবাবু···?

বিন্দু দরজার পার্শ্ব হইতে নোংরা ঝাঁট দিবার ঝাঁটাটা ডান হাতে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আগাইয়া আসিল,—"তবে আমারই এক ঘা হজম্ কর্—···

সপাৎ করিয়া তাহার এক ঘা পরেশের মুখের উপরে পড়িতেই সে "বাপ্" বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মাসী চীৎকার করিয়া উঠিল—"মেরে ফেললে রে,—খুন করলে রে···।

বিন্দু ততখন বাসার বাহির হইয়া গিয়াছে।

মালবীয়-জয়ন্তী

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

গত ২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী) কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ ভগবান দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হয়। তাঁহার গুণানুরক্ত বহু মনীষী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিভিন্ন সভাসমিতি অভিনন্দন-পত্র প্রেরণ করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর সার সৈয়দ মামুদ, শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সর্দ্দার গুরুমুখ সিং তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। সার সি, ভি, রামণ্ জয়ন্তী-উৎসবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রবাসী বাঙালী সমিতির পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিনন্দন পাঠ করেন।

শ্রদ্ধেয় মালবীয়জী এই সব অভিনন্দনের উত্তরে কয়েকটি মাত্র কথা বলেন। "সারা জীবন আমি ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনে করিয়াছি। আমার দেশ-সেবা আমার ধর্ম্ম। লোভের বশে বা ভয়ে আমি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই। জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া আমি আমার দেশবাসীকে মাত্র এইটুকু জানাতে চাই, যেন কোন দিন আমার দেশ-সেবা ক্ষুণ্ণ না হয়, এবং যেন আমার এই জীর্ণ দেহের অবসানে আবার এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।" শেষ কয়টি কথা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পাকুল হয়, উপস্থিত জনসংঘের অনেকেরই চক্ষু সজল হইয়াছিল।

এলাহাবাদে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন; এবং জপ, তপ, আরাধনা ও পুরাণ কথায় দিন যাপন করিতেন। মালবীয়জী এখনও সগর্ব্বে বলেন যে, তিনি কথকের পুত্র; এবং দুঃখ করেন যে, তাঁহার পিতৃদেবের ন্যায় যদি তিনি ভগবানের নাম-গানে দিন যাপন করিতে পারিতেন—তাঁহার জীবন সার্থক

হইত। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য গর্ব্ব তাঁহার পিতৃদত্ত উত্তরাধিকার। 'দ্বিজাঃ উজ্জ্বল বেশাঃ' —ব্রাহ্মণ শুচি শুভ্র পরিচ্ছদ ধারণ করিবে ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। তিনি কখনও এই বিধি অমান্য করেন নাই। হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'একাদশী কথা' উপলক্ষে যিনি তাঁহার পুরাণ ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, অতীতের কাহিনীকে এমন সজীব ও সরল করিয়া বর্ণনা করিবার ক্ষমতা সংসারে দুর্ল্লভ। মালবীয়জীর মুখে 'হিন্দী' শুনিয়া মনে হয়, 'হিন্দী'ই ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত।

তাঁহার বাণী এত মিষ্ট, কারণ তাহার মূলে আছে ভাবুকতা। Gladstone সম্বন্ধে বলা হয়—তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহাতে তিনি বড় কবি, লেখক ও ধর্ম্মসাধক হইতে পারিতেন; মালবীয়াজী সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। তিনি যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে না নামিতেন—তিনি বড় লেখক, অধ্যাপক ও ধর্ম্মগুরু হইতে পারিতেন। তাঁহার মধ্যে যে ঐশী শক্তি নিহিত তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে রাজনীতিক্ষেত্রে, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় ও গঠনে।

এ সংসারে ছোট-বড় সকলেই নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, জীবিকার জন্য কোন কায করিতে বাধ্য। তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং ওকালতিতে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ওকালতি করিলে তিনি আজ লক্ষপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু স্বার্থের মোহ তিনি যৌবনেই কেমন করিয়া কাটাইলেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহার ন্যায় অনন্যকর্ম্মা সর্ব্বত্যাগী দেশসেবক ভারতে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? এমন কি রাজনৈতিক জীবনেও ইচ্ছা করিলেই তিনি বড়লাটের দরবারে আশী হাজারী কর্ম্মসচীব হইয়া, Knight খেতাবে ভূষিত হইতে পারিতেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে ভাল ভাল চাকরী দিতে পারিতেন। কিন্তু অর্থলিপ্সা বা যশোলিপ্সা কোন দিন তাঁহাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে যখন তাঁহাকে D. L. উপাধিতে সম্মানিত করিবার প্রস্তাব করা হইল, তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বিশেষ অনুনয় ও বিনয় সহ এই উপাধির হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিলেন। তিনি জীবনে এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, মানুষের প্রধান সম্পদ তাহার কীর্ত্তি, যাহা কালের নিকষেই ধরা পড়ে।

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় ২০ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনায় এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। হিন্দুর কৃষ্টি (culture) সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধনই ইহার মূল প্রেরণা। উত্তর যুগই ইহার পরিচয় দিবে এবং হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এইখানেই পাওয়া যাইবে।

মালবীয়জী বর্ত্তমান যুগের মহা-ভিক্ষু। দীন ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া 'অনাথ পিণ্ডদ সুতা'র ন্যায় ভিক্ষার দ্বারা এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন—এক ক্রোড় ত্রিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিলেন—তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তাঁহার পূত চরিত্র, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং একনিষ্ঠ দেশ-ভক্তির জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতে এমন অক্লান্তকর্ম্মী সুলভ নহে। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, ব্যায়াম (এখনও তিনি নিয়মিত ডন্ বৈঠক করেন) স্নান ও পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া তিনি কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন, এবং রাত্রি দশটার পর তবে বিশ্রাম। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু মহাসভা ও দেশের সেবাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের পরিচয় দেয়। এমন সদা-চলমান (Constantly mobile) কর্ম্মী কল্পনা করাও কঠিন হইয়া পড়ে। আজ তিনি কাশী, দুদিন পরে বোম্বাই, তিন দিন পরে লাহোরে, চার দিন পরে মান্দ্রাজ—এইভাবে তাঁহার জীবন গৃহ অপেক্ষা রেলওয়ে ট্রেণেই বোধ হয় বেশীর ভাগ কাটিয়াছে। মিতাহারী (এ বিষয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায়,) মিতাচারী, নিষ্ঠাবান ও সংযমী বলিয়াই আজ ৭০ বৎসর বয়সেও তিনি এত পরিশ্রম করিতে পারেন।

তাঁহার বাগ্মিতা সম্বন্ধে অনেকেই জানেন। তাঁহার বাক্য-বিন্যাস এমন সহজ এবং দ্রুততালে চলে যে কোথাও রসভঙ্গ হয় না এবং পারম্পর্য্য নষ্ট হয় না। কোন চীৎকার বা হস্তপদ সঞ্চালন বা মুখভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশ, যাহা Demagogueদের প্রধান সম্পদ, তাহা কখনও তাঁহার বাগ্মিতায় প্রকাশ পায় না। তাঁহাকে আদর্শ Speaker বলা যায়। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সময় স্বর্গীয় গোখলেকে মনে পড়ে। শ্রদ্ধেয় গোখলে মহোদয়ের বক্তৃতায় Statistic

খুব বেশী থাকিত। মালবীয়জীর বক্তৃতা সরস; কারণ, তিনি ভাবুক ও রসিক। কাযেই, তাঁহার বক্তৃতার ছন্দ আছে, দোলা আছে, কল্পনায় তাহা রঙ্গীন। তাঁহার ইংরাজীর উচ্চারণ বিশুদ্ধ, ভাষা মার্জ্জিত, কোথাও শব্দাড়ম্বর নাই, শ্রোতার নিকট তাঁহার আবেদনটি অতি সহজেই পৌঁছায়। শোনা যায় জালিয়ানওয়ালাবাগ ব্যাপারে Councilএ তিনি পুরা পাঁচ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের নিরন্তর বিরক্তিকর বাধা প্রদান সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার বক্তব্য,—নিরস্ত্র ও নিরীহ নরনারী-হত্যার করুণ কাহিনী ও পাঞ্জাবে Martial Lawর অত্যাচারের জ্বলন্ত ছবি তিনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরে হিন্দীতেও তিনি পুরা পাঁচ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই—ইহা তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতার পরিচয় দেয়। সার তেজবাহাদুর লিখিয়াছেন মালবীয়জীর Orthodoxy invulnerable নয়, কারণ তিনি সম্প্রতি 'কালাপানি' পার হইয়াছেন। তাঁহার মন যে গতিশীল (Dynamic) তাহার পরিচয় তিনি বহু কাল পূর্ব্বে দিয়াছেন। অব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ হইলে অধ্যাপনার অধিকারী, এই সত্য তিনি সহজেই মানিয়া লন—যদিও ইহাতে 'অচলায়-তনে'র পাণ্ডারা তারস্বরে চীৎকার ও আন্দোলন করেন। এই অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে গঙ্গাতীরে তিনি আপামর চণ্ডালকে স্বয়ং 'নারায়ণ' মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরম নিষ্ঠাবান, আচারবান, শাস্ত্র-বিশ্বাসী আদর্শ ব্রাহ্মণ, হিন্দু মহাসভার নিয়ন্তা ও সভাপতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সাহসের পরিচয় আর কি হইতে পারে। তাঁহার চিত্ত যে সংস্কার-মুক্ত, সত্যান্বেষী ও গতিশীল, বিশেষতঃ জীবনের এই অপরাহ্ণে—এই কয়টি ঘটনাই তাহার সম্যক পরিচয় দেয়।

ভারতের অতীত গৌরব তাঁহার জীবনের পথ-প্রদর্শক। 'আমারা দেশ' এই কথা যখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়, মনে হয় তাঁহার অন্তরাত্মা যেন এই বাণীতে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে সেই এক কথা—'আমার দেশ'। কি করিয়া দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, দেশের নরনারী দেশ-ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়, জগতের সম্বন্ধে ভারতের আত্ম-সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়, এই তাঁহার সারা জীবনব্যাপী সাধনা। তিনি স্বদেশ, স্বধর্ম্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; কিন্তু কখনও বিদেশ বা পরধর্ম্মের নিন্দা করেন না।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কখনও উগ্র নীতির পক্ষপাতী নহেন। Palmerston was a living compromise—মালবীয়জীও জীবনে তাহাই করিয়াছেন—তিনি চিরদিনই



পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়

মধ্যপন্থী। তিনি শুধু মুখে বলেন নাই, জীবনে পালন করিয়াছেন সেই অমূল্য নীতি—Truth lies in the golden mean. নানা মতের সংঘর্ষের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তিনি সত্যের সহিত, Principleএর সহিত কোন দিন compromise করেন নাই। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা যখন খুবই শোচনীয়, তখন শোনা যায় 1s. 6d. এ ভোটের জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রলোভন দেওয়া

হয়, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। Assemblyতে cotton duty লইয়া যে বিবাদ তাহাতে তিনি বলেন শত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হয় হউক, কিন্তু দেশের কল্যাণ যেন ব্যাহত না হয় এবং এই উপলক্ষে Assemblyর সভ্যপদ ত্যাগ করেন। বোম্বাইয়ে যখন তাঁহাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়, তিনি প্রকাশ্য বিচারালয়ে ব্রিটীশ রাজত্বের বিচার প্রণালী সম্বন্ধে এমন ভাবে হাকিম মহাপ্রভুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাহা ভারতবাসী কোন দিন ভুলিবে না। তাঁহার ন্যায় সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পক্ষে কারাবাস যে কি কঠোর, তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয়; কিন্তু তিনি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সানন্দে কারাবরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি কোন দিন তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি-চর্চ্চা করেন নাই, রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন নাই। শিক্ষা-কেন্দ্রকে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিলে তাহার অকল্যাণ হয়, ইহা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। আমাদের দেশে boy politician-এর সংখ্যা বড় বেশী, তিনি তাহার প্রশ্রয় দিতে চান না। শিক্ষক ছাত্রের জীবন মনন-রাজ্যে। ইহা সঞ্চয়ের ক্ষেত্র যাহার পরিচয় পাওয়া যায় কর্ম্মজীবনে।

'তন মন ধনসে' তিনি দেশের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত 'হামারা দেশ' তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইবে। দেশ মাতৃকার এমন বরেণ্য সন্তান লাভ কত যুগের তপস্যার ফল।

পর দুঃখে কাতরতা, সহৃদয়তা ও মাধুর্য্য তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার কথায় ও কাযে অহঙ্কার কোথাও প্রকাশ পায় নাই। তিনি পরম বৈষ্ণব, ভগবৎ-কৃপাই তাঁহার জীবনের পরম আশ্রয়।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিৎ ধনম্"

এই মন্ত্রই তিনি জীবনে পালন করিয়াছেন—এবং এই মন্ত্রই তাঁহাকে আজ ভারতের স্বদেশী যজ্ঞে প্রধান পুরোহিতের আসন দিয়াছে। Greatness, goodness and kindness এই তিন অসাধারণ গুণের সমন্বয়ই মালবীয় চরিত্রের বিশেষত্ব।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই মহতী বাণী মুখে মুখে উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জী সারা জীবন জন্মভূমিকে সত্যই স্বর্গাদপি গরীয়সী জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছেন।

জন্মভূমি তাঁহার নিকট মৃন্ময়ী নন, তিনি চিন্ময়ী; এবং মালবীয়জী তাঁহার একনিষ্ঠ সাধক। তাঁহার সাধনা সার্থক হউক এই আমাদের প্রার্থনা।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রে রূপসজ্জা)

প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীর পক্ষে যে কোনো চরিত্র অভিনয়েই রূপসজ্জা বা 'Make-up' একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার। 'রূপসজ্জা'কে যিনি অবহেলা করেন, তিনি যতবড় অভিনেতাই হোন না কেন, তাঁর অভিনয়ের অনেকখানি অঙ্গহানি ঘটে। অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতা যদি তাঁর আকৃতি ও বেশভূষার সামঞ্জস্য না রাখেন তাহ'লে সে অভিনয় কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। আবার কেবলমাত্র এই রূপসজ্জার গুণেই অনেক সাধারণ অভিনেতাও দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে সক্ষম হন। অভিনেয় চরিত্রকে সকলদিক দিয়ে পরিস্ফুট ক'রে তু'লতে শিল্পীকে প্রধানতঃ সাহায্য করে তার নিখুঁত রূপসজ্জা।

এই রূপসজ্জার প্রয়োজন রঙ্গমঞ্চেও যেমন অস্বীকার করা চলে না, চলচ্চিত্র-জগতেও যে তার আবশ্যকতা তেমনিই স্বীকার্য্য, এ কথা বলাই বাহুল্য। বরং রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের চেয়ে চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের রূপসজ্জা

সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হওয়া দরকার। রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের রূপসজ্জার জন্য খুব বেশী পরিশ্রম ক'রতে হয় না, অল্প আয়াসেই তাঁরা রূপান্তর গ্রহণ ক'রতে পারেন, কিন্তু চিত্র-লোকের শিল্পীদের রূপসজ্জার জন্য প্রভূত পরিশ্রম ক'রতে হয়, কারণ, মানুষের চোখকে অতি সহজেই



মুখে রং মাখা

ঠকানো চলে, কিন্তু ক্যামেরার লেন্‌সের তীব্র দৃষ্টি যেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি সূক্ষ্ম! তাকে ঠকানো ভারি কঠিন! শিল্পীর রূপসজ্জায় যদি কোথাও খুব সামান্য ফাঁকিও থাকে, ক্যামেরার চোখে তৎক্ষণাৎ তা' ধরা পড়ে যাবে।

এই সোজা কথাটা মনে না রেখে—আমাদের দেশী ছবিগুলিতে অনেক অভিনেতাই রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জা নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে ক্যামেরার সামনে

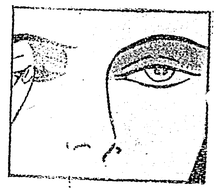

চোখের পাতায় রং মাখা

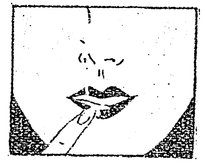

ঠোঁটে রং মাখা

অতি হাস্যাস্পদ রূপ ধারণ ক'রেছেন দেখতে পাই! যাত্রার দলের 'পরচুলো' আর ভাড়া ক'রে আনা পোষাকে বড়জোর একরাত্রি ইস্কুলের ছেলেদের সখের 'থিয়েটার' করা চ'লতে পারে, কিন্তু রূপ-দক্ষদের 'অভিনয়' করা চলে না। 'রূপসজ্জা' ছেলেখেলা নয়। এটা শিখতে হ'লে—সাধনা করা দরকার

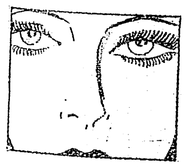

আঁখি-পল্লব আঁকা



নকল আঁখিপল্লব

কারণ, শিল্প ও বিজ্ঞান এই উভয় বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকলে 'রূপ-দক্ষ' হওয়া অসম্ভব। 'হাঞ্চ্‌ব্যাক্ অফ্ নোতার-ডেম্' ছবিতে স্বর্গীয় রূপ-দক্ষ লোন্‌চ্যানী এমন জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জ্জন ক'রতে কখনই পারতেন না,' যদি না রূপান্তর গ্রহণ করবার শিল্প-বিজ্ঞান-সম্মত সূক্ষ্ম তত্ত্বটি তাঁর জানা থাকতো! "A man of Thousand Faces" উপাধি পাবার

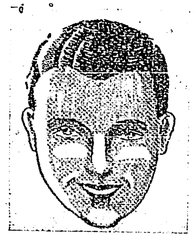

হাই লাইট্ মেক-আপ্
(গাল, নাক ও থুৎনি)



লো লাইট্ মেক-আপ্

যোগ্যতা তাঁর ছিল ব'লেই 'হাঞ্চ্‌ব্যাক্'র ভূমিকায় তার রূপসজ্জা ও অভিনয় চিত্রামোদীদের অমন নিখুঁত হ'য়ে উঠতে পেরেছিল। সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস্ শুধু অভিনয়ে নয়, রূপসজ্জাতেও অসাধারণ নিপুণ! শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমূরের রূপসজ্জাও প্রথম শ্রেণীর রূপদক্ষের উপযোগী। এই সকল অভিনেতা চলচ্চিত্র-জগতে



নাক (লো লাইট্ মেক্ আপ্)



নাক (হাই লাইট্ মেক্ আপ্)
বিশেষ চরিত্রাভিনয়ের রূপসজ্জা



মোটা নাক
সরু করা

সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন ক'রে অপরিমেয় যশের অধিকারী হ'য়েছেন।

চিত্রলোকে প্যানক্রোমেটিক্ ফিল্ম্ (Panchromatic Film) উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রূপসজ্জা'রও রকম ব'দলে গেছে অনেক। আগে 'অর্থোক্রোমেটিক ফিল্মের (Orthocromatic Film) আমলে চিত্রলোকে যে

রূপসজ্জা চ'লতো, এখন আর তা' একেবারেই চলে না। প্যানক্রোমেটিক্ ফিল্মের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে সব রকম রংয়েরই ছায়া ওঠে, অতএব এই ফিল্ম বা 'ছায়াবাহনে'র নাম দেওয়া যেতে পারে 'সবর্ণ ছায়াবাহন' এবং 'অর্থো-ক্রোমেটিক্ ফিল্মের' নাম দেওয়া যেতে পারে 'অসবর্ণ ছায়াবাহন'। কারণ, এই ফিল্ম বা ছায়াবাহনে সব রংই শুধু কালো হ'য়ে ওঠে! তারা আর 'সবর্ণ' থাকে না!

সুতরাং 'সবর্ণ-ছায়াবাহন' প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলোকে 'সবর্ণ-রূপসজ্জার'ও (Panchromatic Make-



১ম—স্বাভাবিক চোখের রূপসজ্জা ২য়—ছোট চোখ বড়ো করা ৩য়—বুড়ো রসিকের চোখ

up) আবির্ভাব হয়েছে। এই রকম রূপসজ্জার পদ্ধতি অনুসরণ করলে চিত্র-নাট্যের অভিনেতারা এমন কতকগুলি বাঁধাধরা রংয়ের হিসাব ও ওজন পেতে পারেন, যা শুধুই বর্ণের সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে না, আধুনিক বিবিধ আলোকসম্পাতের বর্ণ-বিলোপক শক্তিকেও প্রতিহত ক'রতে পারে। এই ধরণের রূপসজ্জা আলোকচিত্রকরকেও নানা দিক দিয়ে সাহায্য করে।

রূপসজ্জার প্রধান গুণ হ'চ্ছে [illegible]র



১ম—স্বাভাবিক ঠোঁট ২য়—বড়ো ঠোঁট ছোট করা ৩য়—ফুর্ত্তিবাজের ঠোঁট

আপত্তিজনক ক্ষত চিহ্ন, কাটা-পোড়া দাগ, কিম্বা মুখের উপরের কোনো বেমানান তিল, আঁচিল, জরুল বা আব এমন ভাবে ঢেকে ফেলা অথবা দাবিয়ে রাখা যায়—যাতে ক্যামেরার লেন্সের সামনে সে সব দোষ না ধরা পড়ে! তা'ছাড়া, মানুষের গায়ের যে স্বাভাবিক বর্ণ ক্যামেরার তোলা ছবিতে ঠিক সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু, রূপসজ্জায় নিপুণ নট অনুকূল অঙ্গরাগ ব্যবহার ক'রে—অতি সহজেই এ বাধা অতিক্রম ক'রতে পারেন। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে [illegible] অভিনেতাদে

রোদে জলে তেতে পুড়ে যাঁর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে তিনি ইচ্ছা করলে ছবিতেও তাঁর মুখের সেই বর্ণবিকারের ছাপ হুবহু বজায় রাখতে পারেন যদি রূপসজ্জার কৌশল তাঁর জানা থাকে। রূপ-সজ্জার গুণে অভি-নেতা তাঁর রূপের সকল ত্রুটীই সংশোধন ক'রে নিতে পারেন। আবার নিজের নির্দ্দোষ আকৃতিকে ইচ্ছামত বিকৃত ক'রেও তুলতে পারেন।



খুঁৎনি এবং নাক (হাই লাইট্ মেক্-আপ্)



খুঁৎনি এবং গাল (লো-লাইট্ মেক্-আপ্)

অনেক্ষণ ক্যামেরার সামনে অভিনয় ক'রতে ক'রতে, বিশেষ আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অভিনেতৃরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন। তাঁদের চোখেমুখে একটা অবসন্নতার ছাপ ফুটে ওঠে, বিরক্তি বা নিরানন্দের আভাস এসে পড়ে, একটা অবসাদ ও শ্রান্তির মালিন্যও দেখা দেয়। রূপসজ্জার প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্যটুকুও ক্রমেই ক্ষীণ-প্রভ হ'য়ে আসে। সুতরাং, অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্য অনুযায়ী প্রত্যেক অভিনেতারই নিজ নিজ রূপসজ্জা মাঝে মাঝে চান্‌কে নেওয়া দরকার।

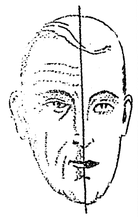

যৌবনের জরায় রূপান্তর

রূপসজ্জার কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট বিধি নিয়ম থাকলেও প্রতিভাবান শিল্পী অনেক সময় নিজের মাথা খেলিয়ে নব নব রূপান্তর গ্রহণ করবার একাধিক সহজ ও নূতন উপায় উদ্ভাবন করে নিতে পারেন। যাঁরা এ ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ তাঁদের অবগতির জন্য গোটাকয়েক প্রচলিত প্রাথমিক সঙ্কেত এখানে দেওয়া যেতে পারে, যেমন—



৪র্থ—দুঃখীর ঠোঁট

১। প্রত্যেক অভিনেতার উচিত মুখমণ্ডল মুণ্ডিত রাখা।

২। রূপসজ্জা সুরু করার আগে মুখখানি বেশ ভাল করে [illegible] ক'রে নেওয়া চাই। সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলবে [illegible]

৩। রং মাখবার আগে মুখে কোনো 'কোল্ড-ক্রীম' মে [illegible] না। তেলানো

নিতে পারলে ভাল হয়। যেমন 'হেজলীন' বা 'ভেন্‌য়ুশা' ক্রীম।

৪। তেলা-রংই (Grease paint) সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। রংয়ের টিউব থেকে সিকি ইঞ্চি পরিমাণ রং বামহাতের তালুতে নিয়ে ডানহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে সেই রং মুখের চারদিকে তিলক ফোঁটার মতো লাগিয়ে নেবে। তেলা রং খুব কৃপণতার সঙ্গেই ব্যবহার করা উচিত, কারণ ও রং বেশী হ'য়ে গেলেই—সব 'মেক্-আপ্' মাটি! তারপর হাতের তালু ও আঙুলের ডগা থেকে রং মুছে তুলে ফেলে, হাত দুটি' জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ভিজে হাতের আঙুল দিয়ে মুখের উপরের সেই তেলা রংয়ের তিলক ফোঁটা টেনে টেনে মুখময় সমানভাবে লেপ্‌টে লাগাতে হয়। লাগাবার সময় মুখের মাঝখান থেকে পাশের দিকে টেনে যাওয়াই নিরাপদ, কারণ রং কোথাও বেশী হ'য়ে গেলে ধারের দিকে টেনে এনে মুছে ফেলা চলে, কিন্তু মুখের মাঝখান থেকে মুছে ফেলা চলে না। আঙুল প্রতিবারই জলের বাটিতে ডুবিয়ে নেওয়া উচিত, তাহ'লে রং বেশ পাত্‌লা ও সমান হ'য়ে মুখে লাগবে। কী রকম রং মাখতে হবে সেটা নাট্যোক্ত চরিত্রের রূপ বর্ণনা অনুযায়ী ঠিক ক'রে নিতে হবে।

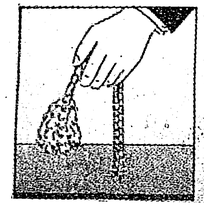

১ম—ক্রেপ্ চুলের পাটখোলা

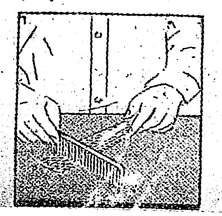

২য়—ক্রেপ্ চুল আঁচড়ে নেওয়া

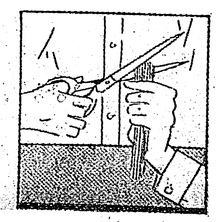

৩য়—ক্রেপ্ চুল ছাঁটা

৫। চোখের পাতার উপরও পাতলা ক'রে একপোঁচ রং টেনে দিতে হবে, যাতে চোখের উপর কোনো রেখা না দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র চরিত্রোপযোগী চেহারা করবার সময় প্রয়োজনমত চোখের উপর কালো রেখা টেনে নিতে হয়। নইলে, সাধারণত চোখের পাতার উপর রং লাগাবার পর ভ্রূ আঁকবার অঞ্জনা পেন্সিল (Dermatograph Pencil) দিয়ে শুধু চোখের পল্লবের কোল দিয়ে আঁখির প্রান্ত রেখাটুকু একটুখানি ঈষৎ টেনে স্পষ্ট ক'রে দিলেই যথেষ্ট।



১ম—স্পিরিট গাম্ দিয়ে দাড়িতে ক্রেপ্ চুল আঁটা



২য়—দাড়ি ছাঁটা



৩য়—সুসম্পূর্ণ দাড়ি

৬। ঠোঁটে রং দেবার সময় ঠোঁটের ভিতর পিঠেও রং লাগানো উচিত, নইলে, হাঁচলে কাশ্‌লে, হাসলে, হাঁ করলে রং মাখা ঠোঁট ধরা পড়ে যাবে। ঠোঁট সাধারণতঃ 'রুজ' (Rouge) লিপ্‌ষ্টিক্ দিয়েই রং করে। মুখে পাউডার দেবার পর জিব দিয়ে যদি সন্তর্পণে ঠোঁটটি মুছে নেওয়া হয় তাহ'লে ভারি চমৎকার দেখায়।

৭। তেলা-রং লাগাবার পর চোখের কোল এবং ঠোঁটের কাজ শেষ হ'লে মুখময় খুপে খুপে পাউডার দিতে হয়। যতক্ষণ না পাউডার মুখের তেলা-রংয়ের উপর সমানভাবে ধরে যায় ততক্ষণ লাগানো দরকার। কোথাও যদি বেশী লেগে যায় কিছু ক্ষতি নেই, কারণ তারপরই পাউডার-ঝাড়া নরম ব্রাশ্ দিয়ে সমস্ত মুখখানি আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। এতটুকু পাউডারের শুক্‌নো গুঁড়ো কোথাও না লেগে থাকে।

৮। এইবার ভ্রূ আঁকার পালা! ভ্রূ আঁকার আলাদা পেন্সিল পাওয়া যায়। সেই পেন্সিল দিয়ে খুব সুন্দর ভ্রূ আঁকা হয়। পেন্সিলের সরু শিস্ ঠিক ভ্রূর চুলের মতো দাগ কাটতে পারে। রং দিয়েও তুলির সাহায্যে ভ্রূ আঁকা যেতে পারে, কিন্তু সে ঠিক স্বাভাবিক

রূপসজ্জা চ'লতো, এখন আর তা' একেবারেই চলে না। প্যানক্রোমেটিক্ ফিল্মের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে সব রকম রংয়েরই ছায়া ওঠে, অতএব এই ফিল্ম বা 'ছায়াবাহনে'র নাম দেওয়া যেতে পারে 'সবর্ণ ছায়াবাহন' এবং 'অর্থো-ক্রোমেটিক্ ফিল্মের' নাম দেওয়া যেতে পারে 'অসবর্ণ ছায়াবাহন'। কারণ, এই ফিল্ম বা ছায়াবাহনে সব রংই শুধু কালো হ'য়ে ওঠে! তারা আর 'সবর্ণ' থাকে না!

সুতরাং 'সবর্ণ-ছায়াবাহন' প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলোকে 'সবর্ণ-রূপসজ্জার'ও (Panchromatic Make-



১ম—স্বাভাবিক চোখের রূপসজ্জা ২য়—ছোট চোখ বড়ো করা ৩য়—বুড়ো রসিকের চোখ

up) আবির্ভাব হ'য়েছে। এই রকম রূপসজ্জার পদ্ধতি অনুসরণ ক'রলে চিত্রনাট্যের অভিনেতারা এমন কতকগুলি বাঁধাধরা রংয়ের হিসাব ও ওজন পেতে পারেন, যা শুধুই বর্ণের সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে না, আধুনিক বিবিধ আলোকসম্পাতের বর্ণ-বিলোপক শক্তিকেও প্রতিহত ক'রতে পারে। এই ধরণের রূপসজ্জা আলোকচিত্রককেও নানা দিক দিয়ে সাহায্য করে।

রূপসজ্জার প্রধান গুণ হ'চ্ছে [illegible]



১ম—স্বাভাবিক ঠোঁট ২য়—বড়ো ঠোঁট ছোট করা ৩য়—স্ফূর্ত্তিবাজের ঠোঁট

আপত্তিজনক ক্ষত চিহ্ন, কাটা-পোড়া দাগ, কিম্বা মুখের উপরের কোনো বেমানান তিল, আঁচিল, জরুল বা আব এমন ভাবে ঢেকে ফেলা অথবা দাবিয়ে রাখা যায়—যাতে ক্যামেরার লেন্সের সামনে সে সব দোষ না ধরা পড়ে! তা'ছাড়া, মানুষের গায়ের যে স্বাভাবিক বর্ণ ক্যামেরার তোলা ছবিতে ঠিক সেটা বোঝা যায় না, কিন্তু, রূপসজ্জায় নিপুণ নট অনুকূল অঙ্গরাগ ব্যবহার ক'রে—অতি সহজেই এ বাধা অতিক্রম ক'রতে পারেন। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে [illegible] অভিনেতাদে

রোদে জলে তেতে পুড়ে যাঁর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে তিনি ইচ্ছা করলে ছবিতেও তাঁর মুখের সেই বর্ণবিকারের ছাপ হুবহু বজায় রাখতে পারেন যদি রূপসজ্জার কৌশল তাঁর জানা থাকে। রূপ-সজ্জার গুণে অভি-নেতা তাঁর রূপের সকল ত্রুটীই সংশোধন ক'রে নিতে পারেন। আবার নিজের নির্দ্দোষ



থুঁৎনি এবং নাক (হাই লাইট্ মেক্-আপ্)



থুঁৎনি এবং গাল (লো-লাইট্ মেক্-আপ্)

আকৃতিকে ইচ্ছামত বিকৃত ক'রেও তুলতে পারেন। অনেকক্ষণ ক্যামেরার সামনে অভিনয় ক'রতে ক'রতে, বিশেষ আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অভিনেতারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন। তাঁদের চোখেমুখে একটা অবসন্নতার ছাপ ফুটে ওঠে, বিরক্তি বা নিরানন্দের আভাস এসে পড়ে, একটা অবসাদ ও শ্রান্তির মালিন্যও দেখা দেয়। রূপসজ্জার প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্যটুকুও ক্রমেই ক্ষীণ-প্রভ হ'য়ে আসে। সুতরাং, অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্য অনুযায়ী প্রত্যেক অভিনেতারই নিজ নিজ রূপসজ্জা মাঝে মাঝে চান্‌কে নেওয়া দরকার।

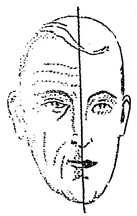

যৌবনের জরায় রূপান্তর

রূপসজ্জার কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট বিধি নিয়ম থাকলেও প্রতিভাবান শিল্পী অনেক সময় নিজের মাথা খেলিয়ে নব নব রূপান্তর গ্রহণ করবার একাধিক সহজ ও নূতন উপায় উদ্ভাবন করে নিতে পারেন। যাঁরা এ ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ তাঁদের অবগতির জন্য গোটাকয়েক প্রচলিত প্রাথমিক সঙ্কেত এখানে দেওয়া যেতে পারে।

৪র্থ—দুঃখীর ঠোঁট

যেমন—

১। প্রত্যেক অভিনেতার উচিত মুখমণ্ডল মুণ্ডিত রাখা।

২। রূপসজ্জা সুরু করার আগে মুখখানি বেশ ভাল ক'রে সাবান ঘ'ষে নেওয়া চাই। সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেললেই হবে।

৩। রং-মাখবার আগে মুখে কোনো 'কোল্ড-ক্রীম' মে[illegible] তোলাই

নিতে পারলে ভাল হয়। যেমন 'হেজলীন' বা 'ভেন্‌য়ুশা' ক্রীম।

৪। তেলা-রংই (Grease paint) সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। রংয়ের টিউব থেকে সিকি ইঞ্চি পরিমাণ রং বামহাতের তালুতে নিয়ে ডানহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে সেই রং মুখের চারদিকে তিলক ফোঁটার মতো লাগিয়ে নেবে। তেলা রং খুব কৃপণতার সঙ্গেই ব্যবহার করা উচিত, কারণ ও রং বেশী হ'য়ে গেলেই—সব 'মেক্-আপ্' মাটি! তারপর হাতের তালু ও আঙুলের ডগা থেকে রং মুছে তুলে ফেলে, হাত দুটি' জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ভিজে হাতের আঙুল দিয়ে মুখের উপরের সেই তেলা রংয়ের তিলক ফোঁটা টেনে টেনে মুখময় সমানভাবে লেপ্‌টে লাগাতে হয়। লাগাবার সময় মুখের মাঝখান থেকে পাশের দিকে টেনে যাওয়াই নিরাপদ, কারণ রং কোথাও বেশী হ'য়ে গেলে ধারের দিকে টেনে এনে মুছে ফেলা চলে, কিন্তু মুখের মাঝখান থেকে মুছে ফেলা চলে না। আঙুল প্রতিবারই জলের বাটিতে ডুবিয়ে নেওয়া উচিত, তাহ'লে রং বেশ পাত্‌লা ও সমান হ'য়ে মুখে লাগবে। কী রকম রং মাখতে হবে সেটা নাট্যোক্ত চরিত্রের রূপ বর্ণনা অনুযায়ী ঠিক ক'রে নিতে হবে।

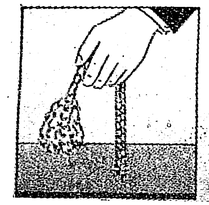

১ম—ক্রেপ্ চুলের পাটখোলা

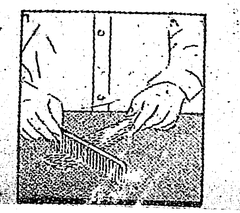

২য়—ক্রেপ্ চুল আঁচড়ে নেওয়া

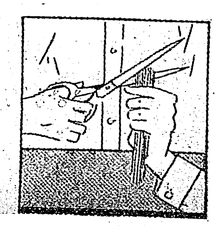

৩য়—ক্রেপ্ চুল ছাঁটা

৫। চোখের পাতার উপরও পাতলা ক'রে একপোঁচ রং টেনে দিতে হবে, যাতে চোখের উপর কোনো রেখা না দেখতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র চরিত্রোপযোগী চেহারা করবার সময় প্রয়োজনমত চোখের উপর কালো রেখা টেনে নিতে হয়। নইলে, সাধারণত চোখের পাতার উপর রং লাগাবার পর ভ্রূ আঁকবার অঞ্জনা পেন্সিল (Dermatograph Pencil) দিয়ে শুধু চোখের পল্লবের কোল দিয়ে আঁখির প্রান্ত রেখাটুকু একটুখানি ঈষৎ টেনে স্পষ্ট ক'রে দিলেই যথেষ্ট।

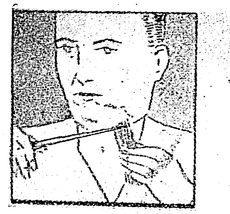

১ম—স্পিরিট গাম্ দিয়ে দাড়িতে ক্রেপ্ চুল আঁটা

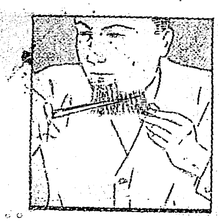

২য়—দাড়ি ছাঁটা



৩য়—সুসম্পূর্ণ দাড়ি

৬। ঠোঁটে রং দেবার সময় ঠোঁটের ভিতর পিঠেও রং লাগানো উচিত, নইলে, হাঁচলে কাশ্‌লে, হাসলে, হাঁ করলে রং মাখা ঠোঁট ধরা পড়ে যাবে। ঠোঁট সাধারণতঃ 'রুজ' (Rouge) লিপ্‌ষ্টিক্ দিয়েই রং করে। মুখে পাউডার দেবার পর জিব দিয়ে যদি সন্তর্পণে ঠোঁটটি মুছে নেওয়া হয় তাহ'লে ভারি চমৎকার দেখায়।

৭। তেলা-রং লাগাবার পর চোখের কোল এবং ঠোঁটের কাজ শেষ হ'লে মুখময় থুপে থুপে পাউডার দিতে হয়। যতক্ষণ না পাউডার মুখের তেলা-রংয়ের উপর সমানভাবে ধরে যায় ততক্ষণ লাগানো দরকার। কোথাও যদি বেশী লেগে যায় কিছু ক্ষতি নেই, কারণ তারপরই পাউডার-ঝাড়া নরম ব্রাশ্ দিয়ে সমস্ত মুখখানি আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। এতটুকু পাউডারের শুক্‌নো গুঁড়ো কোথাও না লেগে থাকে।

৮। এইবার ভ্রূ আঁকার পালা! ভ্রূ আঁকার আলাদা পেন্সিল পাওয়া যায়। সেই পেন্সিল দিয়ে খুব সুন্দর ভ্রূ আঁকা হয়। পেন্সিলের সরু শিস্ ঠিক ভ্রূর চুলের মতো দাগ কাটতে পারে। রং দিয়েও তুলির সাহায্যে ভ্রূ আঁকা যেতে পারে, কিন্তু সে ঠিক স্বাভাবিক

হয় না। ভ্রূ আঁকবার একরকম ছাঁচ পাওয়া যায়, তাতে বেশ ভালো কাজ হয় এবং শীঘ্রও হ'য়ে যায়। ছাঁচের উপর তুলি দিয়ে রং মাখিয়ে সেই ছাঁচ ভ্রূর উপর চেপে ধরলেই চমৎকার ভ্রূ হয়ে যায়।

৯। তারপর, আঁখি-পল্লব নিয়ে পড়তে হবে। পুরুষ



স্পিরিট্ গাম দিয়ে গোঁফ আঁটা



দু'চারদিন ক্ষৌর কার্য্যের অভাবে দাড়ির অবস্থা

অভিনেতারা এটাতে কেউ বড়ো একটা মনোযোগ দেন না, দেবার তেমন দরকারও হয় না, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে রূপসজ্জায় এটা একেবারেই অপরিহার্য্য! 'কস্‌মেটিক্' (Cosmetic) কিম্বা মোম-জমা রং দিয়ে



নাকের রূপান্তর

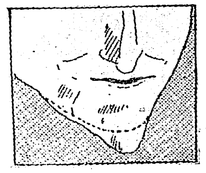

থুঁৎনির রূপান্তর

আঁখিপল্লবকে দীর্ঘ অথবা ঘন যেমন ইচ্ছা করা যেতে পারে। কস্‌মেটিক্ একটা টিনের বাটিতে রেখে স্পিরিট ল্যাম্পে গরম ক'রে গুলে নিতে হবে। তার-পর একটা কাগজের ফুঁপি কিম্বা দেশলাইয়ের কাঠি



১ম—সুন্দরের ভ্রূ



২য়—শয়তানের ভ্রূ

দিয়ে সেই পাতলা কস্‌মেটিক্ তুলে চোখের পল্লবে লাগাতে হবে। প্রতি পল্লবটির মুখ যদি শিশির কণাযুক্ত বা ক্ষুদে পুঁথি পরাণোর মতো দেখতে হবে— এরকম করবার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে প্রতি পল্লবের মুখে সেই গলিত কস্‌মেটিক্ ফুঁপি ক'রে তুলে বার বার লাগাতে হবে, যতক্ষণ না তার মুখে ছোট ছোট কস্‌মেটিকের দানা বাঁধে। দুটি তিনটি পল্লব কেশ একত্র ক'রে নিয়েও তার মুখে একটি ক'রে শিশির

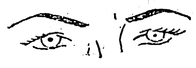

১ম—রাগী লোকের ভ্রূ

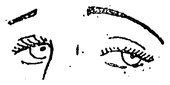

২য়—উদ্ধত অহঙ্কারীর ভ্রূ

কণা বা মুক্তাবিন্দু লাগানোর মত কস্‌মেটিক্ দেওয়া চলে। প্রসাধনের দোকানে কৃত্রিম আঁখিপল্লবও অনেক রকমের কিনতে পাওয়া যায়। এইগুলি ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। নীচের পাতা এবং ওপর পাতার প্রয়োজন মত কৃত্রিম আঁখিপল্লব কিনে এনে তাকে চোখের মাপে কেটে নিয়ে পল্লবের মুখে তুলি ক'রে গঁদ লাগিয়ে তার উপর এই কৃত্রিম আঁখিপল্লব এঁটে দিলে মানুষের চোখ ত' কোন্ ছার, ক্যামেরার লেন্‌সেও সে ছদ্ম-রূপ ধরা পড়ে না!

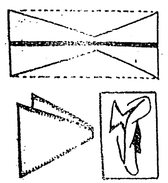

তোবড়ানো কাণের সরঞ্জাম

১০। মুখের সঙ্গে হাতপায়ের মিল রাখবার জন্য ঘাড় ও গলা এবং আঙুলের ডগা থেকে আরম্ভ ক'রে কাঁধ পর্য্যন্ত হাতে এবং হাঁটু পর্য্যন্ত পায়ে ঠিক মুখের অনুরূপ রং জলে পাতলা ক'রে গুলে নিয়ে মাখা উচিত। সে রং সাবান জল দিয়ে ধুলেই উঠে যায়। মুখের তেলা

ফোগ্‌লা দাঁত

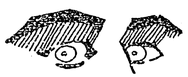

৩য়—ডাকাতের ভ্রূ

রংও ভেসে লি লাগালেই উঠে যায়। বেশ করে মুখে ভেন লিন্ বা ক্রীম ঘসে ঘসে লাগিয়ে তেলা-রংটা আল্‌গা ক'রে তোয়ালে ঝাড়ন দিয়ে মুখটা মুছে ফেললেই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে তারপর একটু গরম জলে সাবান গুলে মুখটি আগে ধু নিয়ে তারপর ঠাণ্ডা জলে মুখটি ডোবালেই বেশ সুস্থ আরাম বোধ হবে। রূপসজ্জা করবার সময় যেমন ধৈর্য্য

সঙ্গে যত্ন নেওয়া উচিত, তোলবার সময়ও সেই রকম ধৈর্য্য ও যত্ন থাকা চাই।

যত্নবান হ'তে হবে। ইংরাজীতে যাকে বলে 'character' part, এবং 'Type' part,—অর্থাৎ বিশেষ একটি মানুষের

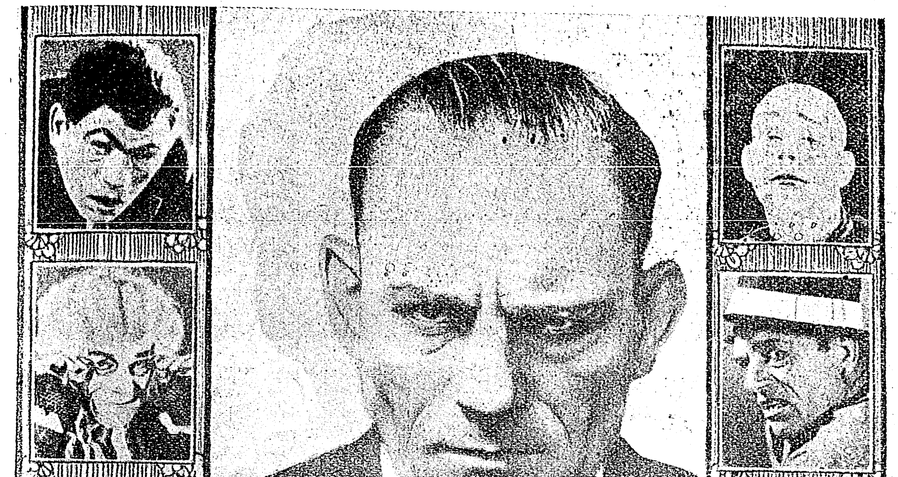

লনচ্যানী
(স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও
বিভিন্ন রূপান্তর)

বিশেষ কোনো নির্দ্দিষ্ট চরিত্র অভিনয় করবার সময় ভূমিকা—যার চরিত্রের এমন কতকগুলি গুণ ও দোষ রূপসজ্জার দিকে খুব সতর্ক মনোযোগ দিতে ও বিধিমত আছে যা ঠিক সামান্য ও সাধারণ নয়,—যেমন 'ঔরঙ্গজেব'

নাদিরশা' কিম্বা 'বুদ্ধদেব' কি 'শ্রীগৌরাঙ্গ' অথবা 'কৃষ্ণকান্ত' কি 'যোগেশ'—এদের 'character' part বলা চলে। Type বলে তাদের যাদের প্রকৃতি ও স্বভাব অথবা জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের একটা কোনো দাগী বা ছাপ্‌মারা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিয়েছে! যেমন গ্যাঁড়াতলার গুণ্ডা, বা বাগ্‌দী ডাকাতের সর্দ্দার, গ্রাম্য চাষা, অথবা কয়লাখনির মজুর—বখাটে ছেলে, উচ্ছৃঙ্খল ও



শ্রীমতী ফাজেন্দা
(দেখতে সুন্দরী কিন্তু ছবিতে
নামেন কুরূপা সেজে)

অত্যাচারী জমীদার, পুলিশের দারোগা, জিপ্‌সি, বেদে, সাপুড়ে ইত্যাদি। এই সব ভূমিকা অভিনয় করতে হ'লে কি 'রূপসজ্জায়'—কি অভিনয়ে কোথাও এতটুকু ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

'Character part' অর্থাৎ কোনো 'বিশেষ চরিত্রের' ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হ'লে অভিনেতার পক্ষে সেই চরিত্রটির সকল দিকের প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান ধারণা করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সে সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি আলোচনা করা, চিত্রাদি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখা, এক কথায় উক্ত চরিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। Type অর্থাৎ কোনো বিশেষ প্রকৃতির লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হ'লেও অভিনেতাকে তাদের সম্বন্ধে সব কিছু জানতে হবে। তাদের জীবনের রীতি-নীতি, তাদের সমাজের আচার ব্যবহার, তাদের কিরূপ মনস্তত্ত্ব এ সম্বন্ধে অভিনেতাকে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ হ'তে হবে। পুলিশের দারোগার সঙ্গে যদি তার পরিচয় না থাকে, খনির মজুরদের যদি সে কখনো না দেখে থাকে তাহ'লে তার সর্ব্বাগ্রে উচিত থানায় গিয়ে বা খনিতে নেমে এদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা, এদের 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। এদের চেহারা ও ধরণ-ধারণ বিশেষ ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ক'রে হৃদয়ঙ্গম করা। এদের সঙ্গে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে অভিনেতার একটা একাত্মবোধ জন্মায় ততদিন পর্য্যন্ত সে এ ধরণের ভূমিকা অভিনয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পারে না। কারণ, এই Type part অভিনয়ে নিখুঁত 'রূপসজ্জা'ও যেমন প্রয়োজন, নিখুঁত অভিনয়ও ততোধিক প্রয়োজন। এখানে সাজের সঙ্গে অভিনয়ের সামঞ্জস্য না থাকলে অভিনেতাকে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়।

রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়—নৈমিক, প্রহরী, দূত, পরিচারিকা, ভৃত্য প্রভৃতি ছোটখাটো অপ্রধান ভূমিকার অভিনেতারা 'রূপসজ্জা' সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন। চলচ্চিত্রে কিন্তু তাঁদের এ অবহেলা বা আলস্য করা একেবারেই চলবেনা। ভূমিকা যতই ক্ষুদ্র হোক এবং ক্যামেরার সামনে থেকে যত দূরেই অভিনয় ক'রতে হোক্ 'রূপসজ্জা' সম্বন্ধে প্রত্যেক চলচ্চিত্রের অভিনেতাকে অবহিত হ'তে হবে। 'রূপসজ্জা'র খুঁটি-নাটি অনেক বটে, কিন্তু ছবিতে সেই সব খুঁটি-নাটি বা তুচ্ছ detailএরও অনেক দাম। সুতরাং ওগুলো বাদ দিতে গেলেই ছবির ক্ষতি করা হবে।

রূপসজ্জায় রংয়ের বর্ণ-গাঢ়তার তারতম্য ঘটিয়ে মুখের উপর আলো ছায়ার বৈষম্য সৃষ্টির দ্বারা ইচ্ছানুরূপ রূপান্তর গ্রহণ করা যায়। রং মাখা মুখের যে যে অংশ উজ্জ্বল রাখা দরকার সেই সেই অংশ বাদ রেখে মুখের অবশিষ্ট

অংশে মুখেরই রংয়ের অনুকুল অথচ অপেক্ষাকৃত গাঢ় রংয়ের পোঁচ সুকৌশলে টেনে দিলেই মুখের উপর আলোছায়ার সৃষ্টি করা যায়। একে বলে high-light make-up. অনেক সময় মুখের অনেক ত্রুটী—যেমন খাঁদা নাক বা বড্ড বেশী বড়ো নাক, লম্বাটে থুঁত্‌নি, প্রকাণ্ড মুখের ফাঁদ, ছোট্ট চোখ, এ সমস্তই শুধরে নেওয়া যায় যদি কেউ রূপসজ্জায় মুখের উপর নিপুণভাবে আলো-ছায়ার কৌশল প্রয়োগ ক'রতে পারে।

গাল ভুব্‌ড়ে বসে গেছে, চোখের কোল ঢুকে গেছে, দুই চোয়ালের গোড়া রগের কাছে খাল হ'য়ে গেছে, এই ধরণের রূপ-সজ্জায় একটু কালো বা পাট্‌কিলে রং তোব্‌ড়ানো জায়গায় লাগিয়ে, আশেপাশে



জ্যাক্ ডাফী
শুধু দাড়ি ও চোখের 'মেক্-আপ্' এই যুবকের কি রূপান্তর ঘটায় আধখানা মুখে হাত চাপা দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে

যদি সাদা বা হল্‌দে রংয়ের পোঁচ দিয়ে মুখের রংয়ের সঙ্গে শেষটা সব মিলিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। একে বলে low-light make-up। কালচে রং



বেন্ টার্পিন
(স্বাভাবিক মূর্ত্তিতেই এর চোখ টেরা কেবল
একটি গোঁফ পরলেই রূপান্তর!)

বলিছি বলে কেউ যেন তাব'লে ভুষো বা খাঁটি কালো রং ব্যবহার না করেন। গ্রে, মেরুণ, বা গাঢ় ব্রাউন এই রকমের রং ব্যবহার করাই বিধেয়।

'নোজ্-পেষ্ট্' বলে এক রকম নরম প্ল্যাষ্টারের মতো পদার্থ পাওয়া যায়; এই জিনিসটির সাহায্যে নাকের চেহারা বদ্‌লে ফেলা যায়। খাঁদা নাককে উঁচু করা, ছোট নাককে বড়ো করা, সরু নাককে মোটা করা এই 'নোজ-পেষ্ট্' লাগিয়ে অনায়াসে ক'রে নেওয়া চলে। মোটা নাক যদি সরু করতে হয় তাহলে নাকের মোটা অংশটুকু সুকৌশলে কাল্‌চে রংয়ের পোঁচ দিয়ে চাপা দিলেই নাক সরু দেখাবে। অবশ্য, তার আগে মুখের রংয়ের চেয়ে নাকের উপরের

রং একটু হাল্‌কা করে মাখা চাই। অর্থাৎ high-light make-up দরকার। নাক যদি একটু উপর দিকে ঠেলে উঁচু ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে নাকের নীচে দিকে নাসা-রন্ধ্রের মাঝখানে তেকোনা ক'রে কালচে রং টেনে দিলেই হবে।

চোখ হ'লো মানুষের মনের মুকুর! ভাবপ্রকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন। চোখ যার ভালো, চলচ্চিত্র অভিনয়ে



চেষ্টার্ কঙ্ক্‌লীন্
(স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও রূপান্তর)



তার সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা সব-চেয়ে বেশী। চোখের দিকে চেয়ে আমরা বুঝতে পারি সে বিষণ্ণ কি উৎফুল্ল? ক্রুদ্ধ না ভয়ভীত,? ঘৃণা, লজ্জা, লালসা, লোভ, আশা, আগ্রহ, উৎসাহ, উত্তেজনা, আনন্দ, বিস্ময়—সব কিছুই পরিস্ফুট হ'য়ে দেখা দেয় মানুষের চোখের ভিতর! সুতরাং চিত্রাভিনেতাদের রূপসজ্জায় চোখের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। চোখের রং, চোখের গড়ন, চোখের অবস্থান, চোখের পল্লব ও ভ্রূ'যুগল এবং চোখের কোল হিসাব মতো চান্‌কে নিতে পারলে—চেহারা একেবারে ব'দ্‌লে যায়। Type part বা বিশেষ প্রকৃতির কোনো লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রবার সময় রূপকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে চোখই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। চোখ দু'টি যদি নাকের বড্ড কাছাকাছি হয়, তাহ'লে সে চোখ সন্দেহজনক চরিত্রের লোককে চট্ করে চিনিয়ে দেয়। চোখ দুটি যদি নাকের কাছ থেকে আবার বড্ড দূরে অবস্থিত হয় তাহ'লে সে চোখ আমার বন্ধু নয় এমন লোককে ধরিয়ে দেয় একেবারে চকিতের মধ্যে! চোখ যার খোলের ভিতর ঢুকে গেছে বা চোখের কোল যার বড্ড ব'সে গেছে, সে মানুষ যে সৎ ও বিশ্বাসী নয় এটা বুঝতে কারুর বিলম্ব হয় না। হিংস্র, ক্রুদ্ধ, রুগ্ন, ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, কামুক, উচ্ছৃঙ্খল, শয়তান প্রভৃতি Type part এর রূপসজ্জায় এই রকম খোলের ভিতর ঢোকা বা ব'সে যাওয়া চোখ খুব কাজে আসে। চোখ যার ছোট সে তা' অনায়াসে বড়ো করে নিতে পারে, কেবলমাত্র তার ছোট চোখের কিনারা ঘেঁসে যদি সে নিপুণভাবে এক-জোড়া বড়ো চোখের আদ্‌রা এঁকে নেয়!

কেবলমাত্র ঠোঁটের সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু ভাব প্রকাশ ক'রতে পারে। দুঃখ, বেদনা, আঘাত, অভিমান, আনন্দ, ঘৃণা, প্রসন্নতা, প্রীতি, চিন্তা, ক্রোধ এ সমস্ত দু'টি পাতলা ঠোঁটের রকমারি ভঙ্গীতে প্রকাশ করা যায়। ঠোঁটের সঙ্গে যদি চোখ যোগ দেয়—বাস্! তাহ'লে কোনো অভিনেতাকেই মুখে আর কিছু ব'লে বোঝাতে হয় না! সে যা ব'লতে চায় তা' বলবার অনেক আগেই তার চোখমুখের ভঙ্গী সে কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। মেয়েরা অতি সহজেই তাঁদের অধরোষ্ঠকে মদনের ফুলধনু করে তোলেন কেবলমাত্র রুজ্ ও লিপ্‌ষ্টিক্ (ঠোঁটে মাখবার বাতি) ব্যবহার করে। যাঁদের ঠোঁট পুরু ও মোটা তাঁরা রংয়ের সাহায্যে সে ত্রুটি সংশোধন করে নেন। ঠোঁটের খানিকটা অংশও তাঁরা মুখের রং দিয়ে ঢেকে বাকীটুকুতে পরিপাটি করে রুজ দিয়ে সুন্দর ঠোঁট এঁকে

নেন। আকর্ণ-বিশ্রান্ত অধরকে তাঁরা সুকৌশলে ঢেকে ছোট করে নেন, আবার ছোট্ট ঠোঁট দু'খানিকে তুলি ও রংয়ের টানে টেনে ইচ্ছামত বাড়িয়ে নিতে পারেন। পুরুষ-দের বড়ো একটা রুজ ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয় না। যদি কেউ ব্যবহার করেন তা'হলে তাঁদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন মেয়েদের ঠোঁটের মত তাঁদের অধরোষ্ঠ মদনের ফুলধনু না হ'য়ে ওঠে। যাঁদের উপরের ঠোঁট নীচের চেয়ে বড়ো বা নীচের ঠোঁট সামনের দিকে বেশী ঝুলে পড়া হয়, তাঁদের মুখে রং মাখবার সময় বড় ঠোঁটের উপর একটু ঘন বা ঘোর রং মাখা উচিত এবং ছোট ঠোঁটে হাল্কা বা পাতলা রং লাগানো দরকার তাহলে আর এই ছোট-বড়োর অসামঞ্জস্যটুকু থাকেনা। যদি বেশ ফুর্ত্তিবাজ বা সদা-প্রফুল্ল ও সুরসিক লোকের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হয়, তাহ'লে অধর দেশের উভয় প্রান্তরেখা একটু বেঁকিয়ে ঈষৎ উপর দিকে তুলে দিলেই উক্ত চরিত্রের অনু-কূল অতি চমৎকার একটা আকৃতিগত রূপান্তর ঘটে, আবার ওই অধরপ্রান্তই যদি নীচের দিকে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে মুখ দেখলেই মনে হবে এ লোকটি জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত বেদনাজর্জ্জর বা নিতান্ত দুর্গত এক অভাগা!



স্নাব্ পোলার্ড
(স্বাভাবিক মূর্ত্তি ও রূপান্তর)



থুঁৎনী দু'তিন রকমের বেশী বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। হয় উপরদিকে ঠেলে ওঠা, নয়ত' ভিতরদিকে চেপে বসা, কিম্বা মধ্যে একটি রেখা প'ড়ে দ্বিধাবিভক্ত। কিম্বা নীচের দিকে ঝুলে পড়া লম্বাটে থুঁৎনি। উপর দিকে ঠেলে ওঠা থুঁৎনি হয় ছুঁচ্‌লো, নয় চৌকো বা গোল-গাল গড়নের দেখা যায়। প্রয়োজনমত 'নোজ পেষ্টের' সাহায্যে ছুঁচ্‌লো থুঁৎনিকে চৌকো বা গোল-গাল করে নেওয়া চলে, আবার চৌকো বা গোলগাল থুঁৎনিকেও ছুঁচ্‌লো ক'রে তোলা যায়। রং মাখবার সময় রং লাগাবার একটু মার-প্যাঁচ করতে পারলেও অভিনেতা তাঁর অভীষ্ট ফল লাভ ক'রতে পারবেন। ছুঁচ্‌লো থুঁৎনির ছুঁচোলো ভাগটুকু কাল্‌চে রংয়ে ঢেকে থুঁৎনিকে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যেতে পারে। আবার যাদের থুঁৎনি নেহাৎ ছোট, তারা যদি মুখের চেয়ে থুঁৎনির উপর রংটা আরও বেশী হাল্‌কা ক'রে লাগান তাহ'লেই সুফল পাবেন।

সাধারণতঃ বয়স বেশী দেখাবার জন্য অভিনেতাদের চোখেমুখে 'বলি-রেখা' আঁকতে দেখা যায়। 'বলি-রেখা' আঁকবার সহজ উপায় হ'চ্ছে মুখে রং মাখা হবার পরই মুখখানি বিকৃত ও সঙ্কুচিত করলেই বলিরেখার অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। সেই সেই অংশে পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিয়ে পরে যদি গাঢ় রক্তবর্ণের কিম্বা পাট্-কিলে রংয়ের আঁচড় টেনে দেওয়া হয়, তাহ'লেই মুখ-মণ্ডলে 'বলিরেখা' বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

গোঁফ অনেক সময় অনেক মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্রের আভাস দেয়। যেমন—সৌখীনবাবুর গোঁফ প্রায় কার্ত্তিক ঠাকুরের মতো! অর্থাৎ দু'ধার বেশ তা' দিয়ে ঘুরিয়ে পাক দিয়ে রাখা। পরচুলের তৈরি গোঁফ টিপকল সংযোগে নাকের ডগায় না এঁটে বাজারে একরকম 'ক্রেপ' চুল পাওয়া যায় তাই এনে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে কেটে 'স্পিরিট-গাম্' দিয়ে ঠোঁটের উপর এঁটে দিলেই সে গোঁফ আর কৃত্রিম ব'লে মনে হবেনা। দাড়ির সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যবস্থাই করা উচিত। 'নূর', 'ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, চাঁপ দাড়ি, গালপাট্টা দাড়ি, ঝোলা দাড়ি, লম্বাদাড়ি, ছাগলদাড়ি,

থোঁচা দাড়ি (কামানার অভাবে) মোগলাই দাড়ি, কাব্‌লি দাড়ি, তপস্বী দাড়ী প্রভৃতি যতরকম দাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, সব রকমই ঐ 'ক্রেপ' চুলের সাহায্যে 'স্পিরিট্ গাম্' দিয়ে এঁটে তৈরি করে নেওয়া যায়। দু'চারদিন না কামালে যেরকম অল্প অল্প দাড়ি হয় সেটা অনেক সময় দাড়িতে গ্রে-ব্লু বা রেড-ব্রাউন্ রংয়ের পোঁচ দিয়ে নিলেই

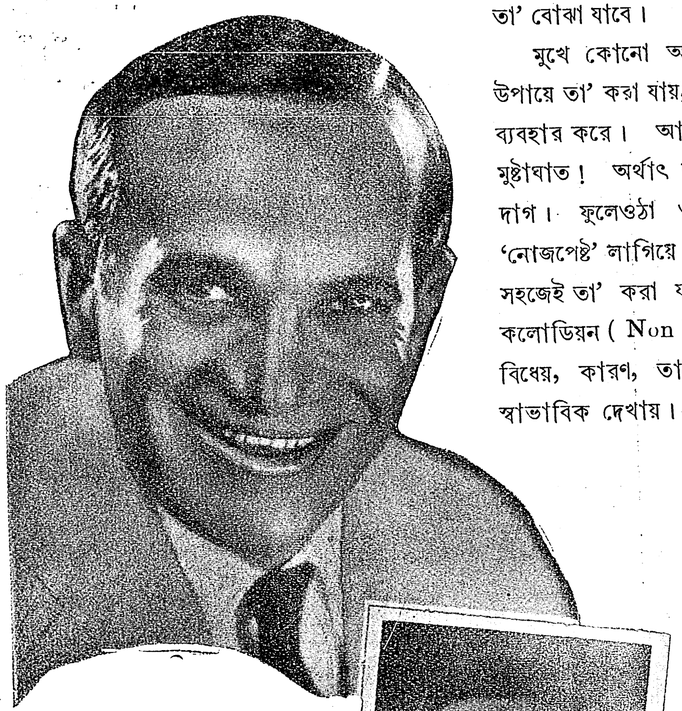

এ্যাল জন্‌সন্
(স্বাভাবিক মূর্ত্তি
ও রূপান্তর)

হ'য়ে যায়। চুল ব্যবহার করবার দরকার হয়না। ফুটো ফুটো রবারের স্পঞ্জে পূর্ব্বোক্ত যে কোনোরকম একটা রং মাখিয়ে নিয়ে দাড়িতে ছাপ নিলেই দু'চারদিন দাড়ী কামানো হয়নি এই রকম দেখতে হয়। গোঁফ তৈরি ক'রে নেবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত অভিনেয় চরিত্রটির দিকে। কারণ, পূর্ব্বেই ব'লেছি যে গোঁফ অনেক সময় মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতির পরিচয় দেয়। গুণ্ডা পালোয়ানের গোঁফ, লোচ্চা-বদ্‌মায়েসের গোঁফ, সাধু সচ্চরিত্রের গোঁফ, ইত্যাদির এমন একটা বিশেষ রূপ আছে যা দেখবামাত্রই মানুষটির ভিতরকার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভ্রূ যেমন মুখের সৌন্দর্য্যকে বাড়ায়, তেমনি ভ্রূর গঠন মানুষের প্রকৃতিরও পরিচয় দেয়। রাগী মানুষের ভ্রূ অহঙ্কারী মানুষের ভ্রূ, দস্যুর ভ্রূ, সয়তানের ভ্রূ, সুন্দরের ভ্রূ, সবেরই একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। ছবিগুলি দেখলেই তা' বোঝা যাবে।

মুখে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখাতে হ'লে দুরকম উপায়ে তা' করা যায়, 'নোজপেষ্ট' লাগিয়ে বা 'কলোডিয়ন্' ব্যবহার করে। আঘাতও দুরকমের হয়, অস্ত্রকৃত, কিম্বা মুষ্টাঘাত! অর্থাৎ কালশিরা-পড়া ফুলে ওঠা কিম্বা কাটা দাগ। ফুলেওঠা ও কালশিরার চিহ্ন ক'রতে হ'লে 'নোজপেষ্ট' লাগিয়ে তার উপর গ্রে-ব্লু রংয়ের পোঁচ দিলে সহজেই তা' করা যায়। কাটাদাগ করতে হ'লে কঠিন কলোডিয়ন (Non Flexible collodion) ব্যবহার করাই বিধেয়, কারণ, তাতে উক্ত ক্ষতচিহ্ন একবারে অবিকল স্বাভাবিক দেখায়। ক্ষতচিহ্ন গভীর দেখাবার প্রয়োজন হ'লে তিনচারবার কলোডিয়ন লাগাতে হবে। একবার লাগাবার পর সেটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তবে তার উপর আর একবার লাগাতে হয়। এমনি ক'রে তিন চারবার বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনমত গভীর দেখাতে না হয়, ততবার তুলি দিয়ে মোটা কলোডিয়নের পোঁচ লাগালেই ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!

কাণ কারুর কারুর কাটা জোড়া-ড়ানো বা জোড়া দেখতে পাওয়া যায়। জোড়াকাণ কাটা দেখাতে হ'লে জোড়ের মুখে কালচে রংয়ের পোঁচ দিতে হয়। কাটা কাণ জোড়া ক'রতে হ'লে 'নোজপেষ্ট' দিয়ে কাটা অংশ জুড়ে নিলেই চলে। কিন্তু তোবড়ানো কাণ দেখাতে হ'লে একটু খাটতে হবে। এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ইঞ্চি চওড়া একখানি পিস্‌বোর্ড ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে কেটে নিতে হবে। মাঝখানে একটি মাথার

কাঁটা লম্বা দিকে বসিয়ে আটা লাগানো ফিতে (adhesive tape) দিয়ে আট্‌কাতে হবে। ফিতের দুমুখ একটু একটু বেরিয়ে থাকা দরকার। এইবার পিসবোর্ডখানি ছবিতে যেমন দেখানো হ'য়েছে সেইভাবে মাঝামাঝি ভাঁজ করে মুড়ে নিতে হবে। তার পর সেই পিস্‌বোর্ডের অর্দ্ধেক মাথার সঙ্গে অর্দ্ধেক কাণের সঙ্গে এমনভাবে এঁটে নিতে হবে যাতে কানটি কোণাকোণি তুবড়ে যায়। তার পর তার উপর 'নোজ-পেষ্ট' দিয়ে তোবড়ানো কানটির চেহারা সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।

খারাপ দাঁত অনেক সময় মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। দাঁত যদি অসমান হয়, ফাঁক্ ফাঁক্ হয়, তা'হলে 'গাটাপার্চা' দিয়ে সে দোষক্রটী সেরে নেওয়া চলে। দাঁত যদি দাগী ও কালো হয় তাহ'লে সাদা 'টুথ-এনামেলের' সাহায্যে তাকে মুক্তোর মত চক্‌চকে করে নেওয়া যায়। যদি ফোগ্‌লা দাঁত ক'রতে হয়, তাহ'লে কালো টুথ-এনামেলের সাহায্যে যে কোনো দাঁত ঢেকে ফেললেই দাঁত পড়ে গেছে বলে মনে হবে।

রূপসজ্জার জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলি প্রত্যেক নট নটীরই হাতের কাছে রাখা দরকার। গ্রীজপেণ্ট বা তেলারং, লাইনিংয়ের রং বা মুখের জমীর রং, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক্, ফিঁকে রুজ, কোল্ড-ক্রীম্, সাদারং, ভূষো, লোজ-পেষ্ট, পাতলা রং, কালো মুখোসের ও সাদা মুখোসের রং, টুথ এনামেল, সাদা ও কালো, স্পিরিটগাম্। ক্রেপচুল, কলোডিয়ন, কাঁচি, ছুরি, তুলি, পাফ, প্যাড, চিরুণী, ব্রাস্, তোয়ালে, সাবান, তেল, গরমজল, তিলকমাটি, চন্দন, সিঁদুর, আলতা, কালি, সুরমা, ডায়মেটেগ্রাফ পেন্সিল, কাগজের ফুপি, চকখড়ি, কাঁটা, সুতো, উল, ইত্যাদি।

শনি-কবচ

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস এম-এ

এক

প্রিয়দর্শন চট্টোপাধ্যায় একজন নব্য যুবক; ইতিহাসে এম্-এ পাশ করিয়া কলিকাতার কোনও একটী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। কলুটোলা অঞ্চলে একটী ছোট গলির মধ্যে একখানি ছোট দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া প্রিয়দর্শন বাবু কয়েক বৎসর হইল কলিকাতায় বাস করিতেছেন। সংসারে একমাত্র বিধবা মাতা ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। বিবাহে অনিচ্ছা না থাকিলেও মনোমত পাত্রীর অভাবে বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই। সকালে অধ্যয়ন, দ্বিপ্রহরে অধ্যাপনা এবং সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে তাস ও দাবার মজলিস বসাইয়া প্রিয়দর্শন বাবুর দিনগুলি একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। তাঁহারই একতলার একটী কক্ষে পল্লীর যুবকদিগের তাস ও দাবার মজলিস বসিত,—খেলার আনন্দে অনেক সময়ে রজনীর দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইয়া যাইত; এবং উষার বাতাস গায়ে লাগিলে তবে খেলার বৈঠকের শেষ হইত।

সেদিন প্রিয়দর্শন বাবুর বৈঠকখানায় খেলার মজলিস বেশ জমিয়া আসিয়াছে. এমন সময়ে উকীল শচীনবাবু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পথে কাহাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "আসুন জ্যোতিষী মশায়, আসুন, আসুন।" শচীনবাবুর আহ্বানে যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি একজন সাদাসিধা পোষাক-পরা যুবক; লাল রঙ্গের খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা। শচীনবাবু তাঁহাকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া বলিলেন, "এই ফেলারাম ভট্টাচার্য্য মশায় মস্ত বড় জ্যোতিষী, ছদ্মবেশে শনি এসে এঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন, এঁর শনি-কবচ অব্যর্থ।

ওপাড়ার শৈলেন গত বৎসর আই-এস্‌সি দেবার সময়ে এঁর শনি-কবচ ধারণ করেছিল। আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না, শৈলেন ফিসিক্সের একটা পেপার না দিয়ে সেই পেপারেও পাশের নম্বর পেয়ে গেল। একেবারে অব্যর্থ কবচ। কি বলেন ফেলারাম বাবু?"

"তা শনির কৃপায় কতকটা তাই বটে।" এই বলিয়া ফেলারাম বাবু গম্ভীর ভাবে বসিয়া নস্য টানিতে লাগিলেন।

অতঃপর শচীনবাবু ফেলারাম ভট্টাচার্য্যকে নিকটে টানিয়া আনিয়া নিজের হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "ফেলারাম বাবু, আমাদের হাতগুলো দেখে দিন না। এই আমারটা থেকে আরম্ভ করুন।" এই হাত দেখার প্রসঙ্গে সেদিনকার মত তাসের মজলিস বন্ধ হইল। সকলেই নিজের নিজের হাত দেখাইবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িল, ভবিষ্যতের গর্ভে কাহার কত বড় ভাগ্যের ইতিহাস নিহিত আছে, ইহা জানিবার এমন সুযোগ কেহই ছাড়িতে চাহিল না। ক্রমে ক্রমে সকলের হাত দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিয়া ফেলারাম বাবু প্রিয়দর্শন বাবুর হাতটী নিয়া বসিলেন। তাঁহার হাতটী দেখিতে আরম্ভ করিয়াই জ্যোতিষী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আপনার একখানি হাত বটে! উঃ, ভাগ্যরেখা কি দেখুন, একেবারে মণিবন্ধ থেকে মধ্যমার শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে। আপনার ভাগ্য মারে কে মশায়। তবে, ইদানীং আপনার শনির অন্তর্দশা চলছে, এতেই যা কিছু মুস্কিল। আপনার কি রাশি বলুন ত? মেষ রাশি? হ্যাঁ, তা হলেই ত আপনার উপর শনির প্রকোপ রয়েছে। দেখি, আপনার হাতটা ভাল করে। এই মাটী করেছে, এটা আবার কি? আপনার শুক্রস্থানে যে একটা চতুষ্কোণ চিহ্ন রয়েছে। এর মানে কি জানেন? কারাবাস। আমাদের জ্যোতিষের বচনেই আছে,—

চতুষ্কোণ চিহ্ন এক শুক্রস্থান 'পরে,
পিতৃরেখা সনে মিশে দেখ যার করে,
ভাবিতে তাহার কথা মনে দুঃখ হয়,
কারাবাস হবে তার, ভুল কভু নয়।"

কথাটা শুনিয়া প্রিয়দর্শন বাবুর প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। স্বভাবতঃ তিনি একটু ভীরু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু এতগুলি সঙ্গীর সম্মুখে মনের দৌর্ব্বল্য পাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় মুখে সাহস দেখাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কি বলছেন ফেলারাম বাবু, আমি ওসব বিশ্বাসই করি না, সব বাজে কথা!"

ফেলারাম বাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "তা, আপনি মন খারাপ করবেন না, আমি কবচ দিয়ে আপনার গ্রহের প্রকোপ কাটিয়ে দেবো। দেখি হাতখানা আর একবার।" এই বলিয়া প্রিয়দর্শন বাবুর হাতটা টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ মনোযোগের সহিত দেখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আর একটা কথা আপনাকে বলব খুব গোপনে। এই যে আপনার কনিষ্ঠা অঙ্গুলির শেষ পর্ব্বে একটা ক্রুশচিহ্ন রয়েছে। এর মানে কি জানেন? খুব গোপনে বলছি, এর মানে 'অবিবাহ'। আমাদের জ্যোতিষ বচনে আছে—

কনিষ্ঠার শেষ পর্ব্বে ক্রুশ যার রয়,
বড়ই দুঃখের কথা, বিবাহ না হয়।"

ফেলারাম বাবুর এই কথায় মজলিসের সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রিয়দর্শন বাবু সেই হাসিতে মন খুলিয়া যোগ দিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল, তবে কি তাঁহার এতদিনের রঙ্গীন কল্পনা শূন্যেই মিলাইয়া যাইবে? তিনি জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যান, কি যে বলেন আপনি জ্যোতিষী মশায়। একেবারে পাগল!" যতীন ডাক্তার হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এর কোনও কবচ নেই ফেলাবাবু?" "নিশ্চয়ই। আমাদের জ্যোতিষে নেই কি।" এই বলিয়া ফেলারাম বাবু সদর্পে গুম্ফমর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়দর্শন বাবুর দিকে তাকাইয়া যতীন ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত আর ভাবনা নেই, একটা শনি-কবচ নিয়ে ফেলো, প্রিয়দর্শনদা'।" তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়দর্শন বাবু বলিলেন, "রাজে কথা রাখ যতীন, কি পাগলের পাল্লায় যে পড়া গিয়েছে। যাক্, অনেক রাত হয়েছে, আজকের মত সভা ভঙ্গ হ'ক।" সকলেই উঠিয়া পড়িলেন, সেদিনকার মত বৈঠক শেষ হইল।

দুই

কয়েক দিন পরে শারদীয়া পূজার সময় আসিল। প্রিয়দর্শন বাবুর পল্লীর যুবকেরা বারোয়ারী দুর্গাপূজার

উদ্যোগ করিল এবং সেই উপলক্ষ্যে তিনি কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ভালোয় ভালোয় দুর্গা-পূজা শেষ হইল। প্রতিমা নিরঞ্জনের দিনে বিশেষ কার্য্যবশতঃ প্রিয়দর্শন বাবু প্রতিমার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না,—কয়েকটী যুবককে প্রতিমার ভার দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিতেই আপনার নামের আহ্বান শুনিয়া প্রিয়দর্শন বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন দীর্ঘগুম্ফধারী বিশালাবয়ব পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। প্রিয়দর্শন বাবুর প্রাণটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহাকে দেখিয়াই পুলিশ কর্ম্মচারী প্রশ্ন করিল, "আপনিই কি প্রিয়দর্শনবাবু, এ অঞ্চলের বারোয়ারী পূজার সেক্রেটারী?" প্রিয়দর্শন বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই সেক্রেটারী। তা হয়েছে কি?" পুলিশকর্ম্মচারী উত্তর করিল, "সেটাই জানতে এসেছিলাম। আপনার বারোয়ারী দল প্রতিমা নিয়ে যাবার সময়ে জেকেরিয়া ষ্ট্রীটের উপর মস্‌জিদের কাছে পুলিশের নিষেধ সত্ত্বেও বাজনা বাজিয়েছিল, তাই রিপোর্ট হয়েছে। ডেপুটী কমিশনার হয় ত আপনাকে তলব করবেন।" উত্তরে প্রিয়দর্শন বাবু একটী ছোট "আচ্ছা" বলিয়া নীরব হইলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীটী সদর্পে চলিয়া গেল।

প্রিয়দর্শন বাবুর প্রাণে আতঙ্কের ছায়া পড়িল। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে জাগিতে তিনি আরও শিহরিয়া উঠিলেন। মনে হইল তিনি জ্যোতিষীর কথায় অবিশ্বাস করিয়া ভাল করেন নাই। পরদিন সকালে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া জোড়াবাগান কোর্টে হাজির হইবার জন্য ডেপুটি কমিশনারের নোটিশ দিয়া গেল।

সপ্তমীর উৎসর্গীকৃত জন্তুবিশেষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে প্রিয়দর্শন বাবু ডেপুটি কমিশনারের কোর্টে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পুলিশকর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল। যাইতেই ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, "আপনাদের বারোয়ারীর দল প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন গোলমাল করিয়াছিল জানেন।" প্রিয়দর্শন বাবু ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমি জানি না, হুজুর। আমি প্রতিমার সঙ্গে থাকিতে পারি নাই।" "তাহার জন্য আপনার সেক্রেটারীর দায়িত্ব যাইতে পারে না।" হুজুর, উহাদের অপরাধ হইলে আমি ক্ষমা চাহিতেছি। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর আমি কখনও বারোয়ারীর সম্পাদক হইব না।" ডেপুটি কমিশনার প্রিয়দর্শন বাবুর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লিখিয়া দিন।" প্রিয়দর্শন বাবু একখানি কাগজে উক্ত প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন। ডেপুটি কমিশনার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এখন আপনি যাইতে পারেন।"

ধীর-মন্থর গতিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া প্রিয়দর্শন বাবু শয্যা গ্রহণ করিলেন। শয্যায় শুইয়া শুইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন এ-যাত্রা রক্ষা পাওয়া যাইবে ত, না জ্যোতিষীর বাক্য ফলিয়া যাইবে? পল্লীর উকীল শচীন বাবু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে ইহাতে বিশেষ কিছু ভয় নাই, ইহার শাস্তি বড় জোর অর্থদণ্ড, কারাবাসের কথা আসিতেই পারে না। তথাপি অধ্যাপক প্রিয়দর্শন বাবু সেই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল যে তিনি জ্যোতিষীর কথা অবহেলা করিয়া ভাল করেন নাই।

তিন

সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনাকে লুক্কায়িত করিয়া প্রিয়দর্শন বাবু জ্যোতিষী ফেলারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে ডাকিয়া প্রিয়দর্শন বাবু বলিলেন, "দেখুন ফেলারাম বাবু, আপনার শনি-কবচ ধারণ করব বলেই স্থির করলাম।" ফেলারাম বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "তা ভালই ত, আমার শনিকবচে আপনার শনির প্রকোপ দূর হবে।" অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "দেখুন প্রিয়দর্শন বাবু, আপনি বিদ্বান্, তাই আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সবই গ্রহগণের প্রভাবে। ঈশ্বর নিজের হাতে কিছু করেন না, তিনি গ্রহদিগকে এমনিভাবে নিয়মিত করে রেখেছেন যে তাদের ক্রিয়াবশেই জগতের সমস্ত ঘটনা ঘটছে। শুধু মানুষ বলে নয়, পৃথিবীর সকল পদার্থ ঈশ্বরের নিয়মে উৎপন্ন হচ্ছে, আর গ্রহের প্রভাবে পরিচালিত হয়ে হ্রাসবৃদ্ধি পাচ্ছে।" তার পর তিনি অনেকটা উত্তেজনার সহিত এই বলিয়া শেষ করিলেন "আসিতেছে—আবার তাগা-মাদুলী-কবচ মানিবার দিন

আসিতেছে। য়ুরোপের জ্যোতিষীরাও এই গ্রহৌষধি মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রদিগকেও চসমা চোখে দিয়া গ্রহৌষধি শিক্ষার জন্য কলেজ এটেণ্ড করিতে দেখা যাইবে।" অবশেষে ফেলারাম বাবু প্রিয়দর্শন বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আগামী কালীপূজার রাত্রে আপনাকে কবচ ধারণ করতে হবে। অমাবস্যার অন্ধকারে আপনি আমার বাড়ী আসবেন, বুঝলেন।" প্রিয়দর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব অমঙ্গল দূর হবার জন্যেই ত কবচ দেবেন? ঐ যে শেষে যেটা বলেছিলেন। মনে আছে?" এই বলিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে প্রিয়দর্শন বাবু জ্যোতিষী মহাশয়ের দিকে তাকাইলেন। ফেলারাম বাবু সহাস্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। ঐ 'অবিবাহে'র কথা বলছেন ত? তার জন্যও যে শনি-কবচ।"

কালীপূজার দিন অমাবস্যার রাত্রিতে প্রিয়দর্শন বাবু ফেলারাম বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া নগ্নপদে নগ্নদেহে চলিলেন জ্যোতিষীর হাত ধরিয়া পল্লীর নিকটস্থ শ্মশানের মধ্য দিয়া বনচাঁড়াল গাছের অন্বেষণে। এই গাছের পাতা দিয়া কবচ প্রস্তুত করিয়া সেই রাত্রেই ধারণ করিতে হইবে। প্রিয়দর্শনের নগ্ন পদে কাঁটা বিঁধিতে লাগিল, নগ্ন গাত্রে বনের পোকা কামড়াইতে লাগিল এবং অন্ধকারের ভয়াবহ মূর্ত্তিতে গাটা ছমছম করিতে লাগিল। এক এক সময়ে তাঁহার ভয় হইতে লাগিল হয়ত জ্যোতিষীর কোনও দুষ্ট মতলব আছে, হয় ত বা তাঁহাকে কোনওরূপ তুকতাক করিয়া শ্মশানঘাটে রাখিয়া যাইবে। এই প্রকারের দুই একটা গল্প তিনি শৈশবে শুনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। ক্রমে সেই ঈপ্সিত গাছের পাতা মিলিল, উভয়ে জ্যোতিষীর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর জ্যোতিষী মহাশয় "হুং হুং হ্রীং হ্রীং ঐং ঐং ক্লীং লং হুং ফট" এইরূপ কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রিয়দর্শন বাবুর বাম বাহুর ঊর্দ্ধভাগে শনি-কবচ পরাইয়া দিয়া উপদেশচ্ছলে বলিলেন, "দেখুন, এতে সব রকম অমঙ্গল আপনার দূর হবে। ঐ যে অবিবাহ সম্বন্ধে বলেছিলাম, সে ফাঁড়াও কাট্‌বে, তবে ও-বিষয়ে একটু চট্‌পটে হবেন, অর্থাৎ মনের মত পাত্রী হ'লে একটু pushing হবেন, লজ্জা করলে ফল হবে না।" অধিক রাত্রে প্রিয়দর্শন বাবু গৃহে ফিরিয়া সে রাত্রি উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিলেন।

চার

প্রিয়দর্শন বাবু বাঁচিলেন। পুলিসের নিকট হইতে আর কোনও ডাক আসে নাই। এখন দ্বিতীয় ফাঁড়াটী কাটিলেই পূর্ণমাত্রায় নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সে সুযোগও শীঘ্রই দেখা দিল।

প্রিয়দর্শনবাবুর মামাত ভাই সুদর্শন বাবু নাগপুরের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। অনেক বৎসর পরে ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় বেড়াইতে আসিলেন। কয়েক মাস কলিকাতায় থাকিবেন বলিয়া শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি বাটী ভাড়া করিলেন। দাদার নিকট হইতে চিঠি পাইয়া একদিন কলেজের পরে প্রিয়দর্শন বাবু দাদা ও বৌদিদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে শ্যামবাজারে উপস্থিত হইলেন।

সুদর্শন বাবু বাটী ছিলেন না, তাঁহার পত্নী সুমতি দেবী প্রিয়দর্শন বাবুকে সযত্নে বসাইয়া সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেক বৎসরের পরে সাক্ষাৎ, সুতরাং ইহাতে যথেষ্ট নূতনত্ব ছিল। সুমতি দেবী দেবরকে শয়নকক্ষে বসাইয়া রাখিয়া তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। প্রিয়দর্শন বাবু কিয়ৎক্ষণ নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিয়া ঘরের আসবাবপত্র দেখিতে লাগিলেন। যে চেয়ারখানিতে তিনি বসিয়া ছিলেন, তাহারই পার্শ্বে একটা টেবিল, টেবিলের উপর একখানি মণিপুরী চাদর পাতা। সেই টেবিলের উপর মাথার কাঁটা, ফিতা, রিবন হ তে আরম্ভ করিয়া খাতা পেন্সিল বই স্তূপীকৃত রহিয়াছে। একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া প্রিয়দর্শন বাবু দেখিলেন সেখানি Gardinerএর History of England; নিজে ইতিহাসের অধ্যাপক, সুতরাং পরিচিত পুস্তকখানি দেখিয়া তিনি দুই একখানি পাতা খুলিতেই মেয়েলি হাতের লেখা যে নামটী দেখিলেন, তাহার পরিচয় তিনি পূর্ব্বে পান নাই। এ বাড়ীতে সুরুচি দেবী নামে কে যে থাকিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনায় আনিতে পারিলেন না, কারণ তিনি যতদূর জানেন তাহাতে সুদর্শন বাবুর স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র ভিন্ন সংসারে আর

কেহ নাই। তিনি পুস্তকখানি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সুমতি দেবী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি টেবিলের এক পার্শ্বে দেবরের আহার্য্য রাখিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ও সব বই আমার ছোট বোন সুরুচির, তাকে আপনি কখনও দেখেন নি ঠাকুরপো। আমরা নাগপুরে যাবার কিছুকাল পরেই আমার মা মারা গেলেন, সেই থেকে ও আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করছে। নাগপুর কলেজে আই-এ পড়ছে, পড়াশুনায় মন্দ নয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করে দিচ্ছি, দেখুন না কেমন লেখাপড়া শিখেছে।"

দিদির আহ্বানে সুরুচি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নতমস্তকে দাঁড়াইলেন। প্রিয়দর্শন বাবুও কখনও অনাত্মীয়া কোনও অপরিচিতা রমণীর সহিত আলাপ করেন নাই, সুতরাং তিনিও কি বলিয়া আলাপ আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সুমতি দেবী ভগিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, এই আমার ছোট বোন সুরুচি, নাগপুর কলেজে আই-এ পড়ছে।" পরে সুরুচিকে বলিলেন, "ইনি আমার দেবর প্রিয়দর্শনবাবু, কলিকাতার একটী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। পড়াশুনা সম্বন্ধে একটু আলোচনা কর না।"

ততক্ষণে সুরুচির লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কারণ এতকাল নাগপুরে থাকিতে থাকিতে লজ্জা বা পর্দ্দার আবরু তাহাকে তত স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রিয়দর্শনবাবু দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী; সহজে তাঁহার বাক্য স্ফুরণ হইল না। সুরুচিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিল, "আপনাদের এখানেও কি এই সব ইতিহাসের বই পড়ান হয়?" প্রিয়দর্শনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "হ্যাঁ, একই বই।"

"আপনারা কি সব বইটা পড়ান? না, notes দেন, আর মাঝে মাঝে summary বুঝিয়ে দেন?"

"না, বইটা সবই পড়ান হয়, তবে not s না দিলে সাধারণ ছেলের অসুবিধা হয়।"

"আমাদের ওখানে ইতিহাসটা ভাল পড়ান হয় না।" এই কথা শুনিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "তাহ'লে ইতিহাসটা ক'দিন ঠাকুরপোর কাছে পড়ে নেনা। কি বলেন ঠাকুরপো?"

প্রিয়দর্শনবাবু বলিলেন, "খুব সন্তোষের সঙ্গেই আপনার আদেশ পালন করব।"

সুরুচি ও প্রিয়দর্শনবাবুর মধ্যে ইতিহাসের আলোচনা চলিল। এমন সময়ে সুমতি দেবী সুদর্শনবাবুর গৃহে প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া সুরুচিকে সেখানে থাকিতে বলিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন। সুদর্শনবাবু প্রবেশ করিলে দাদাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া প্রিয়দর্শনবাবু বৌদিদির নিকট প্রত্যহ একবার আসিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেদিনের মত বিদায় লইলেন।

প্রিয়দর্শনবাবুর জীবনে ইহা এক নূতন অভিজ্ঞতা। এইরূপ শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার সহিত আলাপ পরিচয়ে যে আনন্দ তাহা তাঁহাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে দাদা ও বৌদিদিকে দেখিতে যাওয়া প্রিয়দর্শনবাবুর একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া গেল। তাঁহার বৈঠকখানার মজলিসে আর তাঁহার দর্শন মিলে না। সঙ্গীরা রাগ করিয়া বৈঠক ছাড়িল এবং প্রিয়দর্শনবাবুর মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে বৈঠকের মজলিস তাঁহাকে যে আনন্দ দিত তাহার সহস্রগুণ আনন্দ প্রিয়দর্শনবাবু পাইতেছেন আজকাল শ্যামবাজারের একটী গৃহে একজন সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার সহিত আলাপনে।

সুরুচির সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাব তাঁহাকে আরও মুগ্ধ করিত। তিনি দেখিতেন সুরুচি বাড়িয়া উঠিয়াছে যেন প্রকৃতির উদ্যানজাতা বল্লরীর মত, সেখানে সামাজিক আচার-পদ্ধতির কৃত্রিম বন্ধন নাই। সুরুচির সরস সদাহাস্যময় আলাপে প্রিয়দর্শনবাবু অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তথাপি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত জ্যোতিষীর দ্বিতীয় গণনা স্মরণ করিয়া। তিনি তখন মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেন, ভয় কি, শনি-কবচ তাঁহাকে উদ্ধার করিবে।

কিছুকাল পরে একদিন কথায় কথায় সুরুচি বলিল, "দেখুন, আপনার পড়ান'র ধরণ আমার বড় ভাল লাগে, এমন চমৎকার আপনার বলবার ভঙ্গী।" সেদিন বাস্তবিকই প্রিয়দর্শনবাবুর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তিনি স্থান কালের জ্ঞান হারাইয়া সুরুচির হস্ত ধরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে

বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বলছ তুমি?" এতক্ষণ যে সুরুচিকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাও ভুলিয়া গেলেন। সেদিন আর পড়াশুনা জমিল না। সুরুচি কাজ আছে বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রিয়দর্শনবাবুও বৌদিদির নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

গৃহে ফিরিয়া প্রিয়দর্শনবাবু ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। কেন তাঁহার এই উদ্দাম বাসনা। সুরুচির মত পত্নীলাভ কি তাঁহার ভাগ্যে সম্ভব হইতে পারে! হ্যাঁ, চিরাকাঙ্ক্ষিত রত্ন বটে! তবে জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে মনোমত পাত্রী দেখিলে উদ্যোগী হইতে হইবে। বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না, এইরূপ হইলে তাঁহার জীবনে জ্যোতিষীর শেষ গণনাই ফলিয়া যাইবে। প্রিয়দর্শনবাবু স্থির করিলেন যে তিনি আজই প্রস্তাব করিবেন। কাহার কাছে করিবেন প্রথমে সেইটাই সমস্যার বিষয় দাঁড়াইল। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুরুচিকেই চিঠি লেখা বাঞ্ছনীয় স্থির করিয়া তখনি একখানি পত্র লিখিয়া ফেলিলেন। তিনি লিখিলেন—

সুরুচি দেবী,

তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া 'তুমি' সম্বোধন করিতেছি বলিয়া মনে কিছু করিয়ো না। কারণ তোমার সঙ্গে আমার অল্পদিনের পরিচয় হইলেও, আমায় কে যেন অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বলিয়া দিতেছে তুমি আমার চির-পরিচিতা পরমাত্মীয়া। যেন কোন্ এক অচ্ছেদ্য সূত্রে তুমি আমার সহিত বাঁধা আছ বর্ত্তমানে, বাঁধা ছিলে অতীতে এবং সেই সূত্রে বাঁধা থাকিবে ভবিষ্যতেও। তোমার মত রত্ন লাভ করিতে কামনা করা আমার বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার প্রয়াস বুঝি, কিন্তু তথাপি কি আকর্ষণে আমাকে তোমার দিকে টানিতেছে বলিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি—বড়ই ভালবাসিয়াছি। যদি ইহাতে অপরাধ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করিয়ো। আর, আর—যদি অপরাধ মনে না কর, তবে দয়া করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে কি? জানি না আমার ভাগ্যে ভগবান্ কি লিখিয়াছেন। আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

ইতি—তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী

প্রিয়দর্শন চট্টোপাধ্যায়

চিঠিখানি লিখিয়া তখনি খামে পুরিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করিতে করিতে প্রিয়দর্শনবাবু নিদ্রামগ্ন হইলেন।

পাঁচ

দুই দিন পরে শ্যামবাজারের বাড়ীতে যাইতেই প্রিয়দর্শনবাবুর প্রথম সাক্ষাৎ হইল তাঁহার বৌদিদি সুমতি দেবীর সহিত। তাঁহাকে দেখিয়াই সুমতি দেবী খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখুন ঠাকুরপো, আপনাদের পুরুষ জাতকে বিশ্বাস নেই। আমি সরল মনে আপনার সঙ্গে আমার বোনের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, আর আপনি তাকে রসগোল্লার মত টপ্ করে গিলে ফেলতে চাইলেন। আশ্চর্য্য! আর আমি তাকে আপনার সামনে আনছি না। কি জানি যদি গিলেই ফেলেন। আপনার চিঠি আমি সমস্তটাই পড়েছি, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে ঠাকুরপো। কিছু মধ্যমনারায়ণ তেলের ব্যবস্থা করুন, প্রেম রোগ সেরে যাবে।" প্রিয়দর্শনবাবুর মনটা একেবারে দমিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার পদতলস্থ ভূমিখণ্ড ক্রমেই ধসিয়া যাইতেছে। কোনও প্রকারে দুই চারিটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। মাকে ক্ষুধা নাই বলিয়া একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

পরদিন তিনি দেখিলেন তাঁহার দাদা আসিয়া মাতার সহিত অনেকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনটা আরও ভারাক্রান্ত হইল। একদিন তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এইবার একটি বউ ঘরে আনি, আর ত একা থাকতে ভাল লাগে না।" প্রিয়দর্শনবাবু অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "না মা, বিয়েতে আমার মন নেই।" তাঁহার মাতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে আর কি করি বল্, সুন্দরী পাত্রী হাতে ছিল তোর দাদার ছোট শালী সুরুচি। মেয়েটীকে আমার বড় ভাল লেগেছে, তুই মত দিলে আমি সুখী হব।" প্রিয়দর্শনবাবুর মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তিনি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "তোমার কবে অবাধ্য হয়েছি মা,

তোমার মতেই ত আমার মত।" হাসিমুখে মা নীচে নামিয়া গেলেন।

এক মাস পরে মহাসমারোহে প্রিয়দর্শনবাবুর সুরুচি-রত্ন লাভ হইল। পাকস্পর্শ উপলক্ষ্যে পল্লীর অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৈঠকখানার মজলিসের সকলেই ছিল। এমন কি জ্যোতিষী ফেলারামবাবুও ছিলেন। সমবেত সভার মধ্যে উকীল শচীনবাবু জ্যোতিষী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ফেলাবাবু, আপনার শনিকবচ অব্যর্থ, দেখুন, আর যে সব অবিবাহিত ছোকরা এখানে জুটেছে, তাদের বিয়েতে ফাঁড়া থাকলে ধরে ধরে একটা করে শনিকবচ পরিয়ে দিন না। একেবারে রত্নলাভ হবে। কি বল প্রিয়দর্শনদা।" চারিদিকে একটা হাসির ফোয়ারা ছুটিল, এবার কিন্তু সেই সঙ্গে প্রিয়দর্শনবাবুও যোগ দিয়াছিলেন।

নৃত্য

(স্বাস্থ্যের দিক হইতে)

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্

"অন্ধের হস্তী পরিচয়" ন্যায়

স্বদেশ-প্রাণ, মহানুভব গুরুসদয় দত্ত I. C. S. মহাশয়, বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি তথায় স্বকীয় কর্ম্ম করিয়া, দুইটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পাইয়া, নিজে যত আনন্দিত হইয়াছেন, দেশের, তথা বাঙ্গালী জাতির, তত উপকার সাধন করিতে পারিয়াছেন। মহাপ্রাণ দত্ত মহাশয়ের স্বর্গগতা পত্নীর নামে যে "সরোজ-নলিনী শিল্পাশ্রম" কলিকাতার ৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আশ্রমের পত্রিকা "বঙ্গ-লক্ষ্মীতে", "রায়-বেঁশে" বা "রাই-বেঁশে" সম্বন্ধে বিস্তর চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পর্কে গুরুসদয় বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও দেখিয়াছি; এবং রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "অমৃত-বাজার পত্রিকায়" (১লা আশ্বিন, ১৩৩৮ তারিখে) তৎসম্পর্কে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহাও দেখিলাম।

বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর্ বটম্‌লী সাহেব, ঐ নৃত্যের মধ্যে, ছাত্রদের কল্পনা-প্রসারের পথ দেখিলেন; এবং বাঙ্গালার ছাত্র-স্বাস্থ্য-বিষয়ক-পরিচালক কুকান্ সাহেব, উহার মধ্যে ড্রিলের চেয়ে ভাল জিনিষ দেখিতে পাইলেন; দত্তজ মহাশয় ইহার মধ্যে একটি কলা আবিষ্কার করিলেন এবং দেশের বহু শত বৎসরের একটি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাইলেন। বটম্‌লী সাহেব, ভার-প্রবণ বাঙ্গালী-ছাত্রদের ভাব প্রকাশের একটা ক্ষেত্র আবিষ্কার করিলেন; কুকান্ সাহেব ইহাকে উৎকৃষ্টতরও দেশী ড্রিল মনে করিলেন। ইহার মধ্যে আরো কি আছে, তাহাই সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে, কাঠ-বিড়ালের সাগর-বন্ধনের ন্যায়, আমি নিম্নে কয়েক পংক্তি লিখিলাম;—আশা করি, অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠকরা তাহা একটু মনোযোগ সহকারে পড়িবেন।

আমাদের পাশ্চা -সুলভ মনোবৃত্তি

আমি এ প্রসঙ্গে, "ব্যায়ামের" দিকটা দেখিয়া লইব। সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে ব্যায়ামের মস্ত সুফল এই যে, খেলোয়াড়গণ খেলাকে দেবতার স্থানে বসাইয়া, মনপ্রাণ ঢালিয়া, তাহার সেবায় মাতিয়া যায়; হারিলে, সাংখ্যের পুরুষ সাজে; জিতিলে, মুনির মত স্থৈর্য্য দেখায়; কখনো কাপুরুষোচিত বা হীনচেতার ভাব দেখায় না;—এক কথায়, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগিতা, সাহস, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য

শিখিয়া, মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হয়। এ কারণে ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র গঠনে, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে খেলাধূলা অতীব আবশ্যক। এই জন্য, কি অসভ্য কি সভ্য,—সকল অবস্থার মানুষই অল্প-বিস্তর সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে (in a team spirit) ব্যায়াম করিতে ভালবাসে। অসভ্যদের মধ্যে, নাচ ও কৃত্রিম-রণক্রীড়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত; সভ্য সমাজে, নানারূপ "কসরৎ" ও খেলা-ধূলা প্রচলিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই, আদিম-অবস্থাপন্ন-মানবের নৃত্য বা রণকৌশল দেখেন নাই; কিন্তু, পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সম্মত খেলা-ধূলার কথা সকলেই অল্প-বিস্তর জানেন বলিয়া, প্রথমে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রণালীর কথাই উল্লেখ করিব।

আমরা—অর্থাৎ, যাঁহারা এরূপ মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠের মত "সভ্য" ও "শিক্ষিত"—প্রতীচ্য জাতি হইলেও, শিক্ষায়, ক্রীড়ায় ও চিন্তাধারায়, এক রকম পাশ্চাত্য হইয়াই গিয়াছি—যেহেতু, পাশ্চাত্য সব কিছুই আমাদের "হাঁড়ির ভিতরে" ঢুকিয়াছে। এই জন্য, "ব্যায়াম" বুঝাইতে, কপাটি, ডাণ্ডা-গুলি, ডন-বৈঠকের কথা না বলিয়া, ডাম্বেল ভাঁজা, হকি, ফুটবল, টেনিস্, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলা, ও জিম্‌ন্যাষ্টিক করার কথা ছাড়া, আর কিছুর কথা বলা চলে না।

এ দেশে ব্যায়াম-চর্চ্চার দুর্দ্দশা

যদিও আমাদের স্কুলের ছেলেরা আপনা-আপনিই দৌড়াদৌড়ি করে—তবুও, এ কথা বলা চলে না যে, এ দেশে, এখনো, কোনও বালক বা বালিকাদের বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীতে, কোনও রূপ বাঁধা-ধরা, ক্রমিক-উন্নতির হারে, ব্যায়াম বা খেলার প্রবর্ত্তন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে, যত বা অভিভাবকরা, তত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও সমান-ভাবে উদাসীন। সত্য বটে, ছেলেরা ও অভিভাবকরা প্রতি-বৎসরে, বিনা ওজরে, "স্পোর্টস্ ফি" নামক টেক্স আদায় দেন; এবং বিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারাও বেমালুম তাহা আদায় করিয়াই, কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখান; এবং আরো সত্য বটে যে, এই গৌরী-সেনের দেশে, খুব মোটা বেতনে, একজন শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব "স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাইবার নির্দ্দেশক" রূপে (Director of Physical Education) এখানে আসিয়া, রাইটার্স বিল্ডিংএর ত্রিতলে, খাসা পাখার হাওয়া খাইয়া, আমাদিগকে পরম অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত করিতেছেন; তবু, এটা সত্য কথা যে, এ যাবৎ কোনও বিদ্যালয়ে, কি উপরের শ্রেণীতে, কি নিম্ন-শ্রেণীতে, সকল ছাত্রের জন্য, কোথাও রীতিমত, ব্যায়াম-চর্চ্চার এতটুকু চেষ্টা হয় নাই।

কাযেই, দেখা যায় যে, সহরে ও পল্লীগ্রামে, স্কুল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কেন, অপর যুবকরাও খেলা-ধূলা বা ব্যায়াম কিছু কিছু করে। কিন্তু, তাহারা কয় জন? তাহারা মুষ্টিমেয়। কারণ, এই কার্য্যে কিছু ব্যয় আছে—সে ব্যয় সঙ্কুলান করিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না; এবং এই কার্য্যে, অভিভাবকের ও সমাজের সহানুভূতি থাকে না;—যাহারা খেলাধূলা বা জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্ করে, তাহারা "বয়াটে" নামে অভিহিত হয়। এখন, অভিভাবকরা নিজেরাও "সভ্য" সাজেন, এবং শৈশব হইতে, ছেলেদিগকে "সভ্য ও শিষ্ট" সাজাইয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হন। এই জন্য, ছেলে একটু দৌড়াইলে, ভয়ে শিহরিয়া, নিষেধ করেন —"দৌড়াইও না, পড়িয়া যাইবে!"

কাযেই, যদি দেশের শতকরা মাত্র দুই কি পাঁচটি ছেলে ব্যায়াম করে—তাও বিজাতীয় আওতায়,—তাহা হইলে কি হইল? কিন্তু যে কয়টিই করে, তাহারাই বা কতদিন ধরিয়া তাহা করিতে পায়? চমৎকারা অন্নচিন্তার চমৎকারা পড়িয়া, অচিরেই তাহারা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

এই কয়েকটি কথা হইতে আমরা বুঝিলাম,—প্রথমতঃ, এ দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শারীরিক চর্চ্চার ধাপ্পাবাজী থাকিলেও, ব্যাপকভাবে, কিছুই আসল কায হয় না। অথচ, দেহ সুস্থ না হইলে, মন সুস্থ হইবে কি করিয়া?

দ্বিতীয়তঃ, কি বিদ্যালয়ে, কি পল্লীগ্রামে,—মুষ্টিমেয় উৎসাহী যুবক কয়েক বৎসর মাত্র আপনারই চাড়ে ব্যায়াম করে এবং উপকৃতও হয়। সে দিকে কাহারো দৃষ্টি আছে কি?

তৃতীয়তঃ, কেহই পাশ্চাত্য মতে বেশী দিন ব্যায়াম করিতে চাহে না। তাহার কারণ এই মনে হয় যে, ইহা নিতান্ত প্রাণহীন, এক-দেশী এবং একঘেয়ে। এই মতে, দেহের কতকগুলি পেশী যেন বাঁধা-রাস্তায় চলিয়া চলিয়া, ক্রমে আড়ষ্ট হইয়া আসে। নিয়মিতভাবে যেমন-তেমন অঙ্গচালনা

করিলেও, সারা দেহের কিছু-না-কিছু উপকার হয়ই,—এ বিষয়ে মতভেদ নাই; কিন্তু, পাশ্চাত্য সকল প্রকারের ব্যায়াম-চর্চ্চাই একঘেয়ে ও সুধু কতকগুলি মাংসপেশীকে বাড়ায়। এই জন্য, আজকাল জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌স্, ও এমন কি ষ্ট্যাণ্ডো প্রভৃতির পথে কসরৎ কেহ কেহ প্রথমাবস্থায় করিলেও, শেষ পর্য্যন্ত তাহা রাখিতে চাহেন না, ও পারেন না। এখন ঐ পথ বর্জ্জন করিয়া খেলার দিকে সকলেরই বেশী ঝোঁক বাড়িয়াছে। যেহেতু, সঙ্ঘবদ্ধ খেলায় জয়-পরাজয়ের উত্তেজনা আছে—খেলাটা কৃত্রিম হইলেও প্রাণবন্ত যুদ্ধ।

চতুর্থতঃ, কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে, বালিকাদিগের দেহ-চর্চ্চার কোনও চেষ্টা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চমতঃ, এ দেশে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, সাধারণদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এমন কি ধনীদের মধ্যেও, ঘরে ঘরে, কুস্তি, লাঠি খেলা প্রভৃতি ব্যায়াম চর্চ্চার খুবই প্রসার ছিল; এবং দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, এই বাঙ্গালী জাতিই যুদ্ধের সৈন্যদলভুক্ত হইয়া, কত রণকৌশল ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল। আর আজ?—ছেলেরা দৌড়াইলে, আমরা শিহরিয়া উঠি;—আর, যদি কেহ শরীর চর্চ্চায় একটু মনোযোগী হয়, তবেই তাহাকে বয়াটের দলে ফেলি! এই সর্ব্বনেশে মনোবৃত্তিই আমাদিগকে আরো উৎসন্নের পথে লইয়া যাইতেছে।

চাই জাতীয়-শিক্ষা

এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমাদিগের কর্ত্তব্য অনেক।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক অভিভাবককে—বিশেষ করিয়া জননীদিগকে—ছেলে-মানুষ করার কথা বেশ করিয়া শুনিতে ও শিখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, "ছেলে" বলিলে, তৎসঙ্গে ও বিশেষ এবং বেশী করিয়া, "মেয়েদিগের" কথাও ধরিয়া লইতে হইবে। যথার্থরূপে ছেলে-মানুষ করা বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা পর্ব্বত-প্রমাণ!

দ্বিতীয়তঃ, খেলার ভিতর দিয়াই, মানব শিশুর ভাবী-জীবনের গতি ও প্রকৃতি এবং চরিত্র গড়িয়া উঠে—এ কথাটা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে; এবং সেই সঙ্গে, মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের ভাষায়, "ছেলে খেলা" কথাটিকে আমরা কত মারাত্মক ধারণাসূচক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছি!

তৃতীয়তঃ, দেহ ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিলে, তবে তাহার চূড়ার (মস্তিষ্কের) উৎকর্ষ সার্থক হয়; অতএব, যে শিক্ষায়, বা যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ছেলেদের মানসিক-উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে, দৈহিক-স্বাস্থ্যের বিকাশ একতালে না হয়, সে শিক্ষা ও সে প্রতিষ্ঠানের মূলোচ্ছেদ না করিলে, ভাবী বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করাই হইবে ও হইতেছে। এতদ্বিষয়ে সকল অভিভাবককে জাগরূক হইতে হইবে। কোথায়, কোন্ ডাইরেক্টর খোসখেয়ালের বশে, যা'-তা' হুকুম নামা বাহির করিবেন; বা টেক্সট্-বুক্-কমিটি যা'-তা' বই আমাদের ঘাড়ে চাপাইবেন; অথবা ইউনিভার্সিটি যত-ইচ্ছা পরীক্ষার বাঁধন-কষণ করিবেন;—এ সকলের যুগ বহুকাল পূর্ব্বেই যাওয়া উচিত ছিল;—এখনো যায় নাই, কারণ, আমরা এ সব বিষয়ে ভাবিও না—চেষ্টা করা ত দূরের কথা।

চতুর্থতঃ, অন্ধ-পরানুকরণে কোনও জাতি কখনো "মানুষ" হইয়া উঠিতে পারে না;—বিশেষতঃ, খেলা-ধূলা বিষয়ে। ধার করিয়া হাসিলে, সে হাসি ভ্যাংচানতে দাঁড়ায়! খেলা-ধূলার ভিতর দিয়াই যখন আমাদের ভাবী চরিত্র ও মানসিক গতি নির্ণীত হয়, তখন সেই খেলাটা সম্পূর্ণভাবে "জাতীয়" আদর্শে না হইলে, আমরা কখনোই এ দেশের মানুষ হইব না। এই জন্য, যাহাতে শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত, খেলা, ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয়ভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য দেশের লোকরা একযোটে তাহা না চাহিলে, কখনই আমরা তাহা পাইব না। আমি পাশ্চাত্য কোনও খেলার বিরোধী নই। তবে, আগে দেশী, পরে পাশ্চাত্যের খেলা—এইটাই আমি চাহি। যে উদার হিন্দু অনার্য্য, শক, হুন্, তাতার প্রভৃতিকে আপনার জন করিয়া লইতে জানে, আবশ্যক হইলে, কেমন করিয়া পাশ্চাত্য খেলা'কে প্রতীচ্য খেলার অঙ্গীভূত করিতে হয়, তাহা আর তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ কর

আমি চিরকালই বলিয়াছি এবং এ স্থলেও বলি যে, এ দেশে, শিশুপালন করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়; যেহেতু, তাঁহার

আদর্শ-জীবনে, এ দেশের ভাব ও রীতি অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এক-রকম রাজার "ছেলে" হইলেও, সর্ব্বদাই নগ্নগাত্রে, উন্মুক্ত মাঠে ও ঘাটে, বাঁশী বাজাইয়া, নৃত্য করিতেন। ইহার মধ্যে, খুব বেশী ছন্দানুবর্ত্তিতা ছিল; এবং শিশু-জীবন গঠনে ছন্দানুবর্ত্তিতা, যে কত বড় সহায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন বিশিষ্ট প্রথায় ব্যায়াম-চর্চ্চা না করিলেও, নৃত্য করিয়া, ও উন্মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যকিরণ সেবনের ফলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ বলরামাপেক্ষা কম বলশালী ছিলেন না; অথচ, তাঁহার দেহ কত কমনীয় ছিল! শ্রীকৃষ্ণ পরম যোগীপুরুষও ছিলেন। হঠযোগ-প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেহ অতীব বলশালী হয়। যোগ বুঝি না;—কাযেই, যেটা বুঝি না, সেইটার উপরে ভর করিয়া কোনও কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু শরীর গঠনে নৃত্য যে কতটা সহায়তা করে, তাহা জনসাধারণ জানেনও না, এবং হয় ত বিশ্বাসও করিবেন না। এর জন্য, নৃত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিতেছি।

পাশ্চাত্য ব্যায়াম ত্যাগের কুফল

এ দেশের যে যে যুবকরা ১৪।১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়ার সঙ্গে কিছু কিছু ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, তাঁহারা ২৫ বৎসর বয়সে লেখা-পড়া সাঙ্গ করিয়া, কাযকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। কাযে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি কদভ্যাস জুটিয়া থাকে; যথা—

(১) নিয়মিতভাবে, প্রত্যহ মুক্ত বায়ু সেবন করা আর ঘটিয়া উঠে না।

(২) প্রত্যহ, নিয়ম করিয়া, খেলাধূলা ক্রমশঃই থাকে না বলিয়া, নিত্য যে প্রচুর ঘর্ম্মত্যাগ ঘটিত, তাহার অবকাশ কমিয়া আসে; বরং তৎস্থানে অনেকক্ষণ নানারকম জামা-জোড়ায় আবদ্ধ থাকায়, দেহে রক্ত চলাচলের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও সৃষ্ট হয়।

(৩) বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, আমাদের দম কমে;—অর্থাৎ, ফুস্‌ফুসের ও হৃৎপিণ্ডের জোর কমে।

(৪) প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে পায় না বলিয়া, কিড্‌নী নামক মূত্র সৃষ্টিকারী যন্ত্রের উপরে অযথা চাপ পড়ে; কাযেই, ক্রমশঃ ব্লাড-প্রেশার বা রক্তচাপ বাড়ে।

(৫) ক্রমশঃ এইগুলির দরুণ, "ভুঁড়ি" জন্মায়; অর্থাৎ, একদিকে যেমন উদরের প্রাচীর শিথিল হয়, অন্য দিকে, সেই সঙ্গে, মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক বক্রতা নষ্ট হয়। তাহার ফলে, উদর ও বক্ষো-গহ্বরের যাবতীয় যন্ত্র বিকল হইতে থাকে। যে ব্যক্তির দেহ সুস্থ, তাঁহার পেটের মাংসপেশী দৃঢ় থাকে বলিয়া, সমস্ত দেহ-যন্ত্র যথা-স্থানে থাকিয়া, সুস্থ-ভাবে কায করিতে পারে। মাংসপেশী দৃঢ় থাকিলে, "ভুঁড়ি" জন্মায় না। এজন্য, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু আসিয়া উপস্থিত হয়;—অর্থাৎ, যেখানে দৈনিক ও ঠিক সময়ে, নিয়ম করিয়া, দেহ মল অন্ততঃ দুইবার নিষ্কাশিত হইত, তথায় দৈনিক একবারও তাহা হয় কি না সন্দেহ; এবং দেহ-মল যথাযথ ভাবে নিষ্কাশিত না হওয়ায়, অকাল-জরা উপস্থিত হয়।

(৬) এই সঙ্গে, আহারের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা অধিকাংশই বেশী খাই,—কেহ লোভ বশতঃ, কেহ ভ্রমাত্মক ধারণা বশতঃ। সে ভ্রমাত্মক ধারণাটি এই যে, খুব তৃপ্তি করিয়া "ভুরি"-ভোজন করাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। দেহের আবশ্যকের অতিরিক্ত ভোজন করিলেই—তা' সে যত "তৃপ্তি" করিয়াই হউক—দেহকে সেই অতিরিক্ত আবর্জ্জনা বাহির করিবার জন্য অতিরিক্ত শ্রম করিতে হয়। অর্থাৎ, পরিপাক যন্ত্রগুলিতে অধিকক্ষণ ধরিয়া রক্তাধিক্য ঘটে,—যাহার ফলে, দেহের অপর অংশে রক্তের ন্যায্য পরিমাণের ন্যূনতা ঘটে, দেহের অযথা ক্ষয় হয়, এবং বাড়্‌তি খাদ্য হইতে যে বাড়্‌তি-আবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়, তাহা নিষ্কাশিত করিতে সকল সময়ে দেহ সমর্থ নাও হইতে পারে;—কাযেই, আপনার অবিবেকিতার জন্য, দেহে ক্রমশঃ ময়লা জমে, তাহার ফলে, অকাল-জরা বা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই জরা আসিবার পূর্ব্বে, দেহে মেদ-সঞ্চার হইয়া, আমাদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দেয়। আমরা কি সে সতর্কতার বাণী শুনি? পালিত কুকুর-বিড়াল বা অশ্ব স্থূলকায় (stout বা obese) হইলে, সে অবস্থাটাকে দোষাবহ মনে করি; কিন্তু স্বয়ং স্থূলকায় হইলে, মনে মনে খুসী হই, এবং সেটা বংশানুক্রমিক অবশ্যম্ভাবী অবস্থা, এই মনে করিয়া, তৃপ্ত থাকি! কিন্তু এটা খুব ধ্রুব সত্য যে, দেহে মেদ-বাহুল্য হওয়া, স্বাস্থ্যের চিহ্ন নহে—ব্যারামের লক্ষণ। আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবন-বীমা কোম্পানীরাও, বাধ্য হইয়া, ধরিয়া লয়েন

যে, ২৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে, সাত-আট সের দৈহিক ওজন বৃদ্ধি কার্য্যতঃ অন্যায় হইলেও লোক চক্ষুতে অন্যায় নহে! অথচ, ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার পৃষ্ঠে এই "সামান্য" ৭।৮ সের ভার চাপানর ফলে, অনেক সময়ে, সে ঘোড়া বাজি জিতিতে পারে না! এই প্রসঙ্গে আরো স্মরণ করাইয়া দিই যে, বিবৃদ্ধ মেদ সুধু চর্ম্মের নিম্নেই আপনার স্থান করিয়া লয় না—হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র প্রভৃতির ভিতরে বা আশে-পাশে জমিয়া, উক্ত যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক কার্য্যের যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করিয়া নিত্যই ক্রমে আয়ুঃক্ষয় করে। কাযেই উদরের আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে, ভুড়িবৃদ্ধি, মাংসপেশীর শৈথিল্য, কাযেই হৃৎ-পিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ, বাত, ব্লাড্ প্রেশার বৃদ্ধি, সন্ন্যাস রোগ, যকৃতের দোষ, বহুমূত্র—প্রভৃতি দেখা দেয়।

জীবনটাকে সত্যিকার ভোগ করিবার পন্থা

কাযেই, সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দমনে জীবনটাকে সত্যকার "ভোগ" করিতে হইলে, দুইটি প্রধান কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে:—(১) খুব বুঝিয়া, আবশ্যক মত ভোজন করা; এবং যাহা করিলে দৈনিক তিনবার মলত্যাগ হয়, তাহা করা চাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রবাদ বচন আছে,—"নিজ অবস্থা "অতিক্রম" করিয়া, ঘর-বাড়ী করিবে; অবস্থা "অনুযায়ী", বেশ-ভূষা করিবে; কিন্তু খাইবে, অবস্থার চেয়ে "ঢের কম" করিয়া।" এটি অতীব জ্ঞান-গর্ভ কথা। (২) নিয়মিত ভাবে, এক সঙ্গে সমগ্র দেহের ব্যায়াম করা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাত্র মুষ্টিমেয় লোক স্বল্প কালের জন্য, ব্যায়াম বা খেলা করে,—এবং তাহারাও, বেশীর ভাগ হাতের ও পায়ের কতকগুলি মাংসপেশী লইয়াই ব্যস্ত থাকে;—কাযেই, সে ব্যায়ামের ফল যেমন একদেশীয়, তেমনি একঘেয়ে, কাযেই অল্পদিন স্থায়ী হয়। এই জন্য, মধ্যবয়সে, ব্যায়াম বা খেলা ছাড়িতে-না-ছাড়িতেই, দেহ ভাঙিতে আরম্ভ করে। সুধু মাংসপেশী লইয়াই দেহ নহে। দেহে "মস্তিষ্ক" ও "স্নায়ু" আছে; শিরা-ধমনী আছে; যন্ত্রপাতি আছে; গ্ল্যাণ্ড (বিশেষ করিয়া, endocrine glands) ও আছে। তাহা ছাড়া, শৈশবে আমরা বুকে হাঁটি; তাহার পরে, পর-পর হামাগুড়ি দিই, দাঁড়াইতে শিখি ও দৌড়াই—from serpentine to quadruped, to biped posture to running;—কাযেই, পিঠ, পেট, কোমর ও উরুদেশ—প্রধানতঃ এই চারটি স্থানের উপরেই আমাদিগকে বেশী করিয়া মনোযোগ দেওয়া চাই। যাঁহারা নিয়মিত পাশ্চাত্য মতে ব্যায়াম বা খেলা করেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ উদর ও নিতম্বদেশ লক্ষ্য করেন, ত দেখিবেন যে, ঐ দুইটি স্থান তেমন দৃঢ় ও সুপুষ্ট হয় না। এবং জুতার দোষে পা আড়ষ্ট হইয়া আসে—গুল্‌ফ ও তৎসন্ধি বিশ্রী হয়।

নৃত্যের বিশেষ গুণাবলী

অথচ কোনও বর্ব্বর বা অসভ্য জাতির মধ্যে—মেদবাহুল্য, উদর-প্রাচীরের শৈথিল্য বা ভুঁড়ি খাজু পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড), অপুষ্ট নিতম্ব দেখা যায় না। তাহারা দুই দিন বসিয়া থাকিলেও, তাহাদের দেহ ভাঙিয়া পড়ে না। তাহারা ত ঐরূপ কর্ম্মঠ, সুপুষ্ট, সুগঠিত ও লঘু দেহ লইয়া "জন্মায়" নাই—তাহারা আপনাদিগকে ঐরূপ "করিয়া" লইয়াছে। তাহাদের সহজ নৃত্য-ভঙ্গীর সাহায্যে, তাহারা একসঙ্গে সমগ্র দেহের উন্নতি সাধন করে। তাহারা দেহের ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া উন্নতি সাধন করে না—যেহেতু, তাহারা bicepsও জানে না, trapeziusও মানে না।

যাহারা নৃত্য করে, তাহারা তালে তালে, এবং বারম্বার স্বচ্ছন্দে, ঘুরিয়া-ফিরিয়া, নানারূপ কৌশল দেখায়। এ দিকে, পাশ্চাত্য মতে ব্যায়ামে, আকস্মিক ভাবে, কতকগুলি মাংস-পেশীর উপরে জোর প্রয়োগই প্রথম এবং শেষ কথা। যাঁহারা কলকব্জা বুঝেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, নৃত্যটা turbine or rotary engine; এবং বিলাতি ব্যায়ামটা, reciprocating or opposing engine. নৃত্যে শক্তির অপচয় নাই, পাশ্চাত্য-ব্যায়ামে শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় আছে।

দ্বিতীয়তঃ, নৃত্য করিতে গেলে, প্রধানতঃ উদর ও কোমরেরই বেশী কায হয়। ভগবান এই উদরের-প্রাচীরকে নমনীয় করিয়াছেন, এবং উদরের ভিতরেই, আমাদের পুষ্টির এবং দেহশুদ্ধির যন্ত্রপাতি রাখিয়াছেন। এই উদরেই, হিন্দুমতে মণিপুরচক্র ও পাশ্চাত্যমতে Solar plexus বা abdominaal brain নামক sympathetic স্নায়ুর অতীব

প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়াছেন। এবং মানবজীবনের তিনটি প্রধান স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ—gonads ও adrenals নামক endocrine glands—এই উদরেই স্থিত। কাযেই, এটা বেশ বুঝা যায় যে, যদি মস্তিষ্কের ও বক্ষের পরে কোনও দেহাংশের স্থান থাকে, তবে তাহা উদর ও বস্তি। নৃত্য করিতে গেলে, প্রধানতঃ উদর ও বস্তির সকল যন্ত্রই অল্পবিস্তর নাড়া চাড়া পায়। যদি বস্তিকে চক্রের মধ্যমণ্ডল বা নাভি (centre) কল্পনা করা যায় (এবং সেরূপ কল্পনা কিছু অযৌক্তিকও নহে), তবে, স্বচ্ছন্দে এ কথা বলা চলে যে, এই নাভির ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হস্ত-পদাদি-রূপ চক্রের পরিধিগুলি (radii) স্বতঃই নাড়া চাড়া পায় ও পুষ্ট হইয়া উঠে।

তৃতীয়তঃ, নৃত্যকালে, একটা গোড়ালির উপরে ভর দিয়া পাক খাওয়া, নানাদিকে কোমর বাঁকাইয়া অঙ্গভঙ্গী করা, উল্লম্ফন, নীচু হইয়া অর্দ্ধ বসিয়া পড়া, সারা দেহকে লীলায়িত ভাবে আন্দোলন করা—ইত্যাদি কারণে, উদর ও বস্তির মধ্যস্থ দৈহিক যন্ত্রগুলিও ঐ ঐ ভাবে নাড়া চাড়া পায় এবং সেই সঙ্গে, সমস্ত দেহের সমতা (balance), ভারসামঞ্জস্য (poise) ও গতিমাধুরী (grace) সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে। তাহা ছাড়া, নৃত্যকারীদের চরণের গঠন ও সৌষ্ঠব একটা দেখিবার জিনিষ।

চতুর্থতঃ, নৃত্যকালীন, কখনো এমন ভাবে আঁতমারার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের মাংসপেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করা হয় যে, মনে হয়, যেন তদ্দ্বারা সমস্ত আঁতটিকে টিপিয়া, চাঁছিয়া দেওয়া হইল—যাহার ফলে, আমাদের অন্ত্রমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে ক্রমশঃ অগ্রগতি হইতে পায়—কোষ্ঠশুদ্ধির পথ খোলসা করা হয়। পাশ্চাত্য মতে পেটের কসরৎগুলির ফল, পেটের যন্ত্রপাতিকে নীচের ও সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া—ভুঁড়ি তৈয়ারী করা। নৃত্যে তাহা আদপে হইতে পায় না, বরং উদর-প্রাচীরকে বেশ দৃঢ় করে। তদ্ব্যতীত, নৃত্যের ফলে সকল বোধক-স্নায়ু সজাগ হইয়া উঠে, মনে সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি বিরাজ করে।

তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে, শরীরকে সুস্থ রাখিবার ও গড়িয়া তুলিবার জন্য, এই এই বিষয়ে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে :—

(১) ব্যায়ামকারীকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যায়াম করার প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য,—শরীরকে সুগঠিত ও দৃঢ় করা, নিত্য নিয়মিত ২।৩ বার যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় তাহা করা, এবং মন ও সমগ্র শরীরকে স্ব-চ্ছন্দে রাখা। এই সবগুলিই পাওয়া যায়, যদি উদর ও বস্তিদেশকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করিয়া ব্যায়াম করা যায়—অর্থাৎ নৃত্যের সাহায্যে। হাতের বা পায়ের মাংসপেশীর দিকে প্রধান লক্ষ রাখিলে, এ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

(২) ব্যায়ামকালীন যত ছন্দানুবর্ত্তিতা থাকে, এবং সেই সঙ্গে গতি ও ভঙ্গী যত সহজ হয়, ততই সমস্ত দেহের মাংসপেশীগুলি সমানে গড়িবার অবকাশ পায়।

(৩) উদর ও বস্তিদেশকে প্রধান লক্ষ্যস্থল করিলে, হাত-পায়ের মাংস-পেশী (trapezius) ও deltoid সবাই আপনা-আপনিই গড়িয়া উঠে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র-ভাবে খেলাইতে হয় না।

এই কারণেই মনে হয় যে, আদিম বা অসভ্যাবস্থায় যে নৃত্য নিয়মিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিত্যই আচরিত হয়, তাহা যেমন শরীর গড়ে ও ভাল রাখে, বোধ হয়, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কসরৎ করিয়া, তাহা হয় না। এই জন্যই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের দেহ লীলায়িত, তিনি নৃত্যশীল এবং বংশী তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তিতার প্রতীক।

বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্য ball dancing কখনো দেখি নাই ; তবে তদ্বিষয়ে শুনিয়া, ছবি দেখিয়া, ও পড়িয়া মনে হয় যে, ঐ নৃত্যে আমার পূর্ব্ববর্ণিত সবগুলি নাই ; এই জন্য সে নৃত্যের ততটা সাধুবাদ দিতে পারিলাম না।

"রায় বেঁশে" নৃত্য দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক নৃত্যশীল ব্যক্তির দৈহিক গঠন দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ নৃত্যে আদিম-যুগের নৃত্যকারীদের যথেষ্টই মাল মসলা ও ভঙ্গী আছে। একারণে, drill ও gymnastics ত্যাগ করিয়া, প্রাণবন্ত নৃত্যের প্রসার হইলে, দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। এবিষয়ে মাননীয়া শ্রীযুক্তা পি, কে, রায় ও কবিসম্রাট ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও মাননীয় মিঃ গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের চেষ্টার জন্য, তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

লোভী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ওপারে ত্রিতল বাড়ীখানার ছাদের উপর নীল আকাশ যেন অলসভাবে শুইয়া আছে। ত্রিতল-বাসিনীদের দেবকন্যা বলিয়াই আমাদের মনে হইত। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে কলহ কোলাহল আছে এ কথা কোন' বইয়ে না পড়িলেও উহাদের বিচিত্র জীবন-যাত্রা হইতে এই সত্য কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি।

আমরা খোলার ঘরের অধিবাসী হইলেও—সংবাদ-সংগ্রহে অলস নহি ; এবং এ বিষয়ে সুরমার তৎপরতাকে অভিনন্দন না দিয়াও পারা যায় না। ও-বাড়ীর সকাল-দুপুর-রাত্রির খবর তার মুখে মুখে। সুতরাং সে খবর আমারও কাণের মধ্যে পশিয়া মনে একটু নাড়া দেয় বৈকি!

বিশেষ করিয়া ও-বাড়ীর বৌটি।

প্রায়ই দেখি ছাদের খাটো আলিসার উপর ভর দিয়া নীল আকাশকে ছুঁইয়া কেমন যেন উদাসিনীর মত একদিক পানে চাহিয়া থাকে। মাথায় কখনো স্বল্প-আবরণ থাকে, কখনো বা গুণ্ঠনহীনা। সমগ্র কালো মুখখানি ভীরু আলস্যের ভারে তন্দ্রাতুর। চোখ দুটিতে ক্ষুধার দৃষ্টি ;—লোভের, ক্ষোভের—এবং কলহেরও বটে। দীর্ণপ্রায় দেহ। গতি কখনো উগ্র, কখনো ধীর। কাপড় মেলিতে দেওয়ার সময় ক্ষিপ্র-কর-সঞ্চালনে পুঞ্জীভূত নিষ্ফল ক্রোধকে সে চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। মেয়েটিকে দেখিলেই আমার মনে হয়, অবরুদ্ধ আগ্নেয়-গিরি গলিত ধাতু উত্তাপে বিদারণের অপেক্ষায় ভিতর হইতে বিশীর্ণ দেহকে বারম্বার প্রবল পীড়ন করিতেছে। ভালবাসিবার বিন্দুমাত্র কোমলতা ও মুখের কোথাও নাই।

নব-জীবন কুঞ্জে কোথায় ওর মুকুলিত শাখায় কোকিল-কূজন, কোথায় বা নীল চোখে সাগরের স্বপ্নমায়া। বসন্তের উন্মাদ শ্রী, বর্ষার সজল কান্তি, শরতের প্রসন্নতা, —হেমন্তের শস্য-সম্পদ ও শীতের আরাম কল্পনা সমস্তই বুঝি বৈশাখী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের তেজে আত্মগোপন করিয়াছে। ছাদে পদচারণা করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া আপন মনে কত কি বকে। হাসিও দেখিয়াছি, নির্ম্মেঘ আকাশে যেমন করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে। শুষ্ক—শঙ্কাকুল ভীরু নয়ন দুটি তুলিয়া আকাশের গায়ে ও কি লেখা পাঠ করিতে চায় যেন। সেকি বিদলিত যৌবনের স্মরণ-সমারোহ মাঝে নিষ্ঠুর বর্ত্তমানের মরু-লিপি ?

সুরমা বলে—বৌটি মুখরা এবং লোভী।

নেপথ্যের কোলাহলে একথা না বিশ্বাস করিয়া পারি না, কিন্তু লোভকে উহার স্পষ্টই দেখিয়াছি।

ছাদের কোণে চিলেকোঠার গায়ে ঠেস দিয়া এদিক ওদিক ভীরু চোখে চাহিয়া কাপড়ের তলা হইতে লুকানো জিনিষ বাহির করিয়া প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে ও রসনার তৃপ্তি-সাধন করে। ক্ষয়া চুড়ি কগাছিতে রিনি ঝিনি বাজে।

তারপর ট্যাঙ্কের জলে হাত মুখ ধুইয়া রৌদ্রে মেলা কাপড়ে মুখ মুছিয়া ধীরে ধীরে বৌটি নামিয়া যায়।

সুরমা হাসিয়া বলে, "দেখেছ কাণ্ড! এমন নোলা-দাগা মেয়েও ত কখনো দেখিনি!"

কোন' কোন' দিন ধরাও পড়ে। বিধবা শাশুড়ী হয়ত চেলা কাঠ দিয়া বৌটির সর্ব্বাঙ্গে কালশিটা পাড়াইয়া দেন। কাঠে কাঠে ঠকাঠক শব্দ হয় ; ও কাঁদে না। তিরস্কার করিলে মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসে। বেহায়ার একশেষ! যে-কার্য্য বারণ করা যায়—সেই কার্য্যেই ওর উৎসাহ বেশী। আলিসায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাশুড়ী পাড়ার লোককে ডাকিয়া বৌয়ের গুণগ্রামের কাহিনী বলেন। বকিয়া বকিয়া শ্রান্ত হইয়া অবশেষে নামিয়া যান। কাহিনী হইতে বুঝা যায়, অমনুষ্যত্বের যে বিষবাষ্প কুটীরের চারিধারে ঘন কুয়াসা রচনা করিয়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে অসুন্দর, অসরল ও কদর্য্যতার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, —সে বাষ্পের ছায়া আকাশস্পর্শী ত্রিতলের ছাদেও ঘুরিয়া বেড়ায়। দৈন্য অভাবের মধ্যে যে লোভ—যে উৎপীড়ন মানুষকে শান্তিহারা করে, স্বচ্ছলতার মাঝেও তার প্রকাশ।

বৌটির কথাই বলি।

এই ত সেদিন এবাড়ীতে আসিয়াছে। সেদিন মানে—বছর দুই। শানাইয়ের বসন্ত-রাগিণী এখনও কাণে বাজিতেছে।

একমাত্র ছেলের বিবাহ—সঞ্চয়ী কর্ত্তার আনন্দের সীমা ছিল না। সমারোহ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। বাদ্য, হুলুধ্বনি ও আনন্দ-অভ্যর্থনার মধ্য দিয়া রূপসী—সালঙ্কারা বধূ আসিল। লোকে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অলঙ্কারের সুখ্যাতি করিল।

বিবাহ-শেষে অতিথিরা চলিয়া গেলে—কোলাহল-শূন্য-গৃহে বসন্ত দেখা দিল, কোকিলও ডাকিল। আমাদেরই এদিককার দ্বিতলের সুসজ্জিত-কক্ষে নব-দম্পতিরা আশ্রয় লইল। দক্ষিণ বলিয়া জানালা রহিল খোলা এবং সেই মুক্ত পথ দিয়া মিষ্ট হাসির ঢেউ আসিয়া চারিদিকের আবেষ্টনীকে বসন্তের মঞ্জুশ্রীতে ভরিয়া তুলিল। সারারাত্রি সে কলতানের বিরাম থাকিত না, সারারাত্রি

রঙীন আলোটাও জ্বলিয়া জ্বলিয়া সে রঙ্গ উপভোগ করিত। কখনো বাতায়নের নিকটে বৈষ্ণব পদাবলীর অতীত গানকে তারা রূপান্তরিত করিয়া তুলিত।

কিন্তু সে স্বপ্ন। অষ্টাহান্তে দম্পতি এ বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে—সেই যে ও-ঘরে আলো নিবিল, বাতায়ন বন্ধ হইল—এই দুটি বৎসরের অসংখ্য চন্দ্রালোকিত রাত্রিরেও তাহা আর খুলে নাই। গৃহিণী বাসনপত্র ঠাসিয়া ঘরখানির কণ্ঠরোধ করিয়াছেন। উত্তর খোলা ঘরে নব-দম্পতির শয্যা পড়িয়াছে। তারপর, কর্ত্তা পৃথিবীর ওপারে গিয়াছেন, যার নামে বিষয় সে গম্ভীর হইয়াছে।

গৃহিণী উহাদের অসহ্য আনন্দ-হাসিকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সর্ব্বদা শাসনের কষা লইয়া বৌটির পাছু পাছু ফিরেন। খাওয়া পরার বিধি নিষেধই কি কম!

বৌটির সে দামী বেনারসী ঢাকাই শান্তিপুরী নানা রঙ বে-রঙের কাপড়গুলি কোথায় গিয়াছে! হয়ত—ছিঁড়িয়াছে, হয়ত ট্রাঙ্কে পচিতেছে। গহনাও অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্তির ভয়ে তোলা আছে। নিমন্ত্রণে যাইবার পূর্ব্বে সেগুলি বাহির হয়। কিন্তু বিশীর্ণ দেহে সেগুলি যেন বিদ্রূপের মত বিঁধিতে থাকে। এখন নারিকেল তেলে জব্‌জবে চুল হইতে কোন প্রকার সুগন্ধ বাহির হয় না। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড় ভেদ করিয়া বর্ণ-সুষমাও দেখা যায় না। খদ্দরের মোটা ছেঁড়া সেমিজ, সারাক্ষণই অঙ্গে থাকে।

খাইতেই কি ভাল করিয়া পায়? তা যদি পাইত ত ছাদের উপর দাঁড়াইয়া—অমন কাঙাল-পনা করিবে কেন? শান্ত-বৌ মুখরা হইয়াছে, লক্ষ্মী-বৌ দুষ্ট হইয়াছে, সুন্দরী-বৌ রূপ-শ্রী হারাইয়া কুৎসিত হইয়াছে।

মাঝে মাঝে দ্বিতলের জানালাটা খুলিয়া যায়, বৌ আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আকাশ দেখে। বর্ত্তমানের আকাশে অতীতের বর্ণ-বৈচিত্র্য খুঁজিয়া বৃথাই সে প্রলোভিতা হয়। সেদিন মধ্যাহ্নেও সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সুরমা ঘরে আসিয়া বলিল, "ওগো, দেখ—দেখ, বৌটি কাঁদছে। বোধ হয় শাশুড়ী মেরেছে।" শাশুড়ী ত প্রত্যহই প্রহার করেন, কাঠ দিয়া কিংবা কাঠাপেক্ষা রূঢ়তর বাক্য দিয়া। তাহাতে ত কোনদিন ও কাঁদে না।

বলিলাম, "শাশুড়ী নয়, বোধ হয় ওর স্বামী।" সুরমা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এমন একগুঁয়ে বৌ ত কখনো দেখি নি! এত জিজ্ঞাসা ক'রলুম—মুখের রা-টি খসালে না! সাধ ক'রে কি আর মারে?" অশ্রুমতীর দু-চোখের বিগলিত ধারা নিঃশব্দে গাল বহিয়া গড়াইতেছে, দৃষ্টি তার দূর নীলাকাশের প্রান্তে। সুরমার সমবেদনামাখা প্রশ্নের একটি উত্তরও সে দেয় নাই। রাগ হইবারই কথা।

সুরমা অনেক কথাই বলিল। মানুষের অত লোভ মোটেই ভাল নহে। সকলকে খাওয়াইয়া পরাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে—তাহাই পরম তৃপ্তিতে গ্রহণ করা নাকি বধূধর্ম্ম। বধূ যে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী,—বিশেষত হিন্দুর ঘরে।

বলিলাম, "এ তো গেল বধূর কথা, কিন্তু মাতৃস্থানীয়া শাশুড়ীর কি কোন কর্ত্তব্য নেই, সু? বালিকা হঠাৎ বাপের বাড়ীর আদরের আবেষ্টনী থেকে এসে এমন অনাদরের ঢেউ যদি সহ্য না-ই ক'রতে পারে"—সুরমা গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, তবে আর হিঁদুর মেয়ে শিখলে কি? এত ব্রত-উপবাস, এত পাঁচালী কথা শুনেও শিখবে না?" কথা সত্য। সংযম শিক্ষার ভিত্তি পৌরাণিক কাহিনী ও আচার অনুষ্ঠানে বাল্যকাল হইতেই বালিকাদের অন্তরে আরম্ভ হইয়া থাকে! আমায় চিন্তান্বিত দেখিয়া সুরমা বাহিরে গিয়াছিল। খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "ওগো, দেখ সে—দেখ সে, কোথায় গেছে তার কান্না! দিব্যি ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় জামা বার ক'রে সেজে গুজে হাসচে। পাগল নাকি!"

পাগল না হইলে এই পরস্পর বিরোধী আচরণের কোন সামঞ্জস্যই ত খুঁজিয়া পাইনা! যে লাঞ্ছিতা নারী নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় ক্ষণপূর্ব্বে নিঃশব্দে অজস্রধারা বর্ষণ করিতেছিল, ক্ষণপরে তার এই উৎকট লোভ···পাগল ছাড়া আর কি?

ওর হাসি দেখিতে বড় সাধ হইল। দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সুরমা মিথ্যা বলে নাই, সত্যই পাগলিনী হাসিতেছে। মাধুরী নাই, প্রাণ নাই, শুষ্ক ম্লান হাসি। দামী বেণারসী সাড়ী, একদিন যাহা প্রতি অঙ্গবেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব সুষমাকে প্রকাশ করিত, আজ শীর্ণদেহে তাহা পরিপাটীরূপে ধরিয়া রাখাও দুষ্কর। গায়ের গহনা-গুলিও ঢলঢল করিতেছে। হাড় ওঠা গলায় ব্লাউজটা এমন বে-মানান হইয়াছে যে, টান মারিয়া সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেও ক্ষতি নাই! একে একে সমস্ত গহনা পরিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া বৌটি দাঁড়াইল। মুখে মৃদুহাসি। লম্বা দেওয়াল-আয়নাটায় সর্ব্বাঙ্গ হয় ত দেখা যাইতেছিল না। বৌ-টি কিসের উপর উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক ফিরিয়া ভাল করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে লাগিল। সে দেখা যেন তার শেষ আর হয় না। হাত ঘুরাইয়া ঘাড় কাত করিয়া, চুল এলাইয়া, পিছন ফিরিয়া, ঠোঁটে মৃদুহাসি টানিয়া, ভ্রূ-কুঁচকাইয়া কত রকমের দেখিবার যে ভঙ্গী! কে জানে, হয়ত সে ব্যাকুল আগ্রহে এ বাড়ীতে প্রথম পদার্পণের দিনটির লাবণ্য লালিত্যকে ওই শুষ্কশীর্ণ কুৎসিত প্রায় দেহের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছিল। কিন্তু গতদিন ফিরিয়া আসেনা এ নিষ্ঠুর সত্যকে জানিয়াও—ও যেন ভুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। কপোলে সে আরক্তিম আভা কই? কোথায় বঙ্কিম ভ্রূ-বিলাস, অধরের সুষ্ঠু ভঙ্গী! বহুক্ষণ পরে সে আয়নার সম্মুখ হইতে নামিয়া আসিল। মুখের হাসি মিলাইয়াছে, চক্ষের দীপ্তি নিবিয়াছে,

ব্যর্থচেষ্টার অবসাদে সারাদেহ মাতালের মত টলিতেছে। দেখিয়া মনে হইল, অশ্রুবন্যায় ও যেন এখনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে!

সারা দুপুর ধরিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৌটি বিগত সৌন্দর্য্য সাধনায় মন-প্রাণ ঢালিয়া ছিল। কিন্তু অনাদরে অভিমানে যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে ফিরাইবে কে? রাত্রিতে সুরমা বলিল, "ওগো, তুমি ঠিকই ব'লেছিলে। শাশুড়ীর মারে ও কোনদিন কাঁদেনা। আজ ওর বর ওকে বকেছিল—লাথিও মেরেছিল। বিকেল বেলায় ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ওর শাশুড়ী হাসতে হাসতে পাড়ার লোককে শোনালেন। ওর বর নাকি ব'লেছিল, 'দূর হ'য়ে যা জলার পেত্নী—অলক্ষ্মী কোথাকার!' আহা!"

বছর দুই পূর্ব্বে ওই দখিনদুয়ারী ঘরটায় বসন্ত সমারোহের তার অন্ত ছিলনা। রূপসী নববধূ—পিপাসী নববর। ভালবাসা তখন ছিলনা, সত্যই ছিলনা। তবুও নির্ঝরিণী কলরোলের মত সেই ক্লান্তিহীন সুমিষ্ট শব্দঝঙ্কার আজও আমার কাণে আসিয়া বাজিতেছে। ভালবাসাকে লইয়া সেই সুকোমল মুহূর্ত্তগুলির চঞ্চলতা। করে কর, অধরে অধর, নয়নে নয়ন, হাসিতে হাসি সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্য পান; তরুণ মনের প্রচণ্ড পিপাসা তৃপ্তির কি যে সুন্দর আয়োজন! ভালবাসা হয়ত সেই রূপের মধ্যে, শব্দের আশ্রয়ে, গন্ধের বিকাশে প্রাণের সূক্ষ্ম তন্ত্রী দিয়া কোন এক সময়ে শিরায় শিরায় রক্ত কণিকার সঙ্গে মিশিয়া যায়! তারপর, স্বপ্ন টুটিয়া—উদ্দামতা কাটাইয়া যে ভালবাসা যেদিন স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যেদিন বাহিরের রূপধারায় আর সে বাঁধা থাকে না। যেদিন অন্তরে অন্তরে তার মায়াজাল সম্প্রসারিত হয়। সেদিন, সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্ন মনকে পীড়া দেয় না, ত্রুটি বিচ্যুতি ও কর্কশ হইয়া দৃষ্টিপথে বাধা জন্মায় না। সেদিন,—জীর্ণ ম্লান কুয়াশা মণ্ডিত প্রকৃতির মাঝে—প্রকৃতির পরাজয়।

বৌ-টির দুঃখ এখন বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি ওর সারা দুপুরের সামঞ্জস্য হীন আচরণের ক্ষুধা। স্বামীর অবহেলাও সহিতে পারে নাই। হয়ত বা সেই অতীত ভালবাসার অবমাননায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ভালবাসা ওর বাসনার মধ্য দিয়া শীর্ণ দেহের নীল শিরায় সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। ভালবাসাকে ফিরাইবার জন্য সারা দুপুরের ব্যর্থ প্রয়াসে ও তাই মগ্ন হইয়াছিল।

সেইদিন হইতে বৌ-টি উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।—পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও ফিরাইবেই;—দেহের লাবণ্য, মুখের হাসি, অঙ্গের মনোরম ভঙ্গী। সকাল, বিকাল, দুপুর—এমন কি রাত্রিতেও চুরি করিয়া সে দুধ, সর, ফল, মিষ্ট যাহা কিছু সংগ্রহ করে—ছাদে আসিয়া খায়। দুপুরে ঘরে খিল আঁটিয়া গহনা, কাপড়, ক্রীম, পাউডার লইয়া শীর্ণ অঙ্গ সাজায়; আর্শীর সাম্নে দাঁড়াইয়া কত রকমে আপনাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে,—শেষে মুখ ম্লান করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। ওর ক্ষুধাতুর জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটোর পানে চাহিয়া ভয়ে আমরা কাঁপিয়া উঠি। ঘৃণা অবহেলার রুক্ষতায়—দিন দিন সে মুখে এমন কদর্য্যতা ফুটিয়া উঠিতেছে যে, দেখিলেই শিহরিয়া উঠিতে হয়। অথচ সে মুখ···অষ্টাদশ বর্ষীয়া সৌন্দর্য্যময়ী তরুণীর।

সেদিন, বোধ হয় দুয়ারের খিল বন্ধ করে নাই। ছোট টুলটির উপর দাঁড়াইয়া—এক গা গহনা পরিয়া—আর্শীর পানে চাহিয়াছিল। চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দুর্ব্বল শরীর টলিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া বৌটি পড়িয়া গেল। বৌ-টি ভয়ে কাঁদিয়া তাড়াতাড়ি টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডুর কপাল কাটিয়া লাল রক্ত গড়াইতেছে। দামী বেনারসী শাড়ীখানার অনেকখানি সেই রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোণেও অশ্রু, না, শোণিত? এত রক্তও ওই শীর্ণ দেহে ছিল। সৌন্দর্য্য সাধনার জন্য কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া উঞ্ছবৃত্তি করিয়া ওই লাল বিন্দুগুলিকে সঞ্চয় করিয়াছিল, আজ নিমেষের অসাবধানতায় ধারাকারে তা বাহির হইয়া গেল।

বৌ-টি ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যন্ত্রণায় নহে, পীড়নের ভয়েও নহে—আশা-ভঙ্গের হতাশ্বাসে।

সাড়া পাইয়া শাশুড়ী ছুটিয়া আসিলেন—আরও অনেকে আসিল। কিন্তু জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিজের চরম-লাঞ্ছনায় যে মাটীতে মিশাইয়া গেল, তাহাকে শাস্তি দিতে নিষ্ঠুরতম নির্য্যাতন আর কি আছে?

আর বৌ-টিকে ছাদে দেখি না, জানালাতেও আসিয়া দাঁড়ায় না। দ্বিপ্রহরের অলস আকাশ পরম আলস্যভরে প্রিয় সঙ্গিনীকে খুঁজিতে ছাদের কোণ ঘেঁষিয়া পড়িয়া থাকে। রৌদ্রে কাজল শুকায়, ট্যাঙ্কের জলধারাও ছড়্ ছড়্ করিয়া পড়ে; কিন্তু চিলে-কোঠার ছায়ায়—ভীরু লুব্ধা মেয়েটি আঁচলে খাবার ঢাকিয়া নিঃশব্দ পদে আর আসিয়া দাঁড়ায় না।

দ্বিতলের জানালাটা খোলা থাকে,—দক্ষিণের হাওয়া ঘরে বয়। যাঁরা সে ঘরে আসেন—অতি সন্তর্পণে, আবার তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া যান। বৌ-টির সৌন্দর্য্য-সাধনা শেষ হইয়াছে। স্বাস্থ্যলাভের তপস্যায় ও আর অবসন্ন দেহ মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে না। ছাদের উপর যে আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্থির হইয়া থাকে—তারই কোলে এতটুকু ঠাঁই পাইবার জন্য ওই লোভাতুরা ফুলশয্যার খাট-খানিতে শুইয়া আজ তপস্যা করিতেছে। ওর ওই দুর্দ্দমনীয় লোভকে ঠেকাইতে—মাটী মার সমস্ত বন্ধন—সমস্ত মায়াই আজ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বুঝি!



সাময়িকী

বাঙ্গলার আয় ব্যয়—

কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব-সচিব অনারেবল মিঃ এ, মার ১৯৩২-৩৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বাজেট উপস্থিত করিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার উপক্রমণিকায় মিঃ মার নৈরাশ্যের গীতি গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"আমার পক্ষে বাজেট উপস্থিত করা চিরদিনই একটা দুঃখজনক কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এবারকার দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। কাজেই কি কি কারণে এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমি এবার এই পরিষদের সদস্যদের মনে ভীতি সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করি না।"

অতঃপর মিঃ মার ১৯৩০-৩১, ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩২-৩৩ সালের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেন। তাহাতে দেখা যায় ১৯৩২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় ২,১০,৯৪,০০০৲ বেশী হইবে।

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ

এই ঘাট্‌তি পূরণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোট ২,১০,৯৪,০০০৲ টাকা ধার লওয়া হইবে। এই ধার বার্ষিক ১৪,৩৩,০০০৲ টাকা করিয়া আগামী ৫০ বৎসরে পরিশোধ করা হইবে।

১৯৩২-৩৩ সালের আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছে, ৯,৪৯,৮৪,০০০৲ টাকা এবং আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে ১১,১২,৯৮,০০০৲ টাকা।

১৯৩১-৩২ সালে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইবে মোট ১১,১৩,৮৯,০০০৲ টাকা। ১৯৩২-৩৩ সালের ব্যয় ইহা অপেক্ষা মাত্র ৯১,০০০৲ টাকা কম হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

রাজস্ব সচিব ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বেতন হ্রাস করা হইয়াছে এবং শাসন কার্য্যের ব্যয়ও সঙ্কোচের চেষ্টা করা হইতেছে। তথাপি ব্যয় সঙ্কোচের পরিমাণ এত কম হইল কেন, এ কথা সদস্যগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।—ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই, ১৯৩১-৩২ সালে বেতন হ্রাসের দ্বারা ৯,১০,০০০৲ টাকা বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৩২-৩৩ সালে এই বাবদ ৩৬,৯৮,০০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

মোটের উপর ১৯৩২-৩৩ সালে বেতন হ্রাসের দ্বারা ২৭,৮৮,০০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। ভ্রমণ ব্যয় ও ভাতা ইত্যাদি হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে আরও ১,৫৪,০০০৲ টাকা বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায়। মোট ২৯,৪২,০০০৲ টাকা বাঁচিবে।

কিন্তু জেল, পুলিশ, আদালত ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত ৩৩,১৭,০০০৲ টাকা বরাদ্দ করিতে হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে এই বিষয়ে ২১,৫৪,০০০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার প্রায় সমস্তই এই বিষয়ে ব্যয় হইয়া যাইবে। তথাপি রাজস্ব-সচিব আশা করেন যে, ব্যয়সঙ্কোচের টাকা হইতে অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধলক্ষ টাকা থাকিবে।

১৯৩২-৩৩ সালের ঘাট্‌তি

১৯৩২-৩৩ সালের শেষে গবর্ণমেণ্টের ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,৬৩,২৯,০০০৲ টাকা। মিঃ এ, মার বলিয়াছেন, যদি অস্বাভাবিক ব্যয় বন্ধ হয় এবং দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার আয় বাড়িবে এবং ব্যয় কমিবে। এই অবস্থায় ১৯৩২-৩৩ সালের শেষে ঘাটতির পরিমাণ হয় ত এত বেশী থাকিবে না। যদি ১,৬৩,২৯,০০০৲ টাকাই ঘাটতি পড়ে তাহা হইলে আবার ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণ করিয়া আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে হইবে এবং এই ঋণ পরিশোধের জন্য বার্ষিক ১১,০৯,০০০৲ টাকা করিয়া ভারত সরকারকে ৫০ বৎসর দিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে বার্ষিক ১৪,৩৩০০০৲ টাকা+১১,০৯,০০০৲ টাকা—মোট ২৫,৪২,০০০৲ টাকা করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

রাজস্ব-সচিব এবার নূতন কোন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করেন নাই; ঋণ করিয়া ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন—

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেসন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে :—

যে যে সর্ত্তের অধীনে রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র সমূহ অল্পমূল্যের ডাক টিকিটে ভারতের ডাকঘর সমূহে প্রেরিত হইয়া থাকে, ঐ সকল সর্ত্তের সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ১৯৩২ অব্দের আগামী ১লা এপ্রিল হইতে সংস্কৃত সর্ত্তগুলি প্রযুক্ত হইবে।

নূতন বিভাগের কয়েকটি প্রধান সর্ত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। প্রচলিত সংবাদপত্র সমূহের রেজিষ্ট্রেশন ১৯৩২ অব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে। তৎপরে পুনরায় রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে।

২। যে সকল সংবাদপত্র ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল বা তৎপূর্ব্বে প্রথম রেজেষ্ট্রী হইবে, ঐ সকল সংবাদপত্র যে অব্দে রেজেষ্ট্রী হইবে, ঐ অব্দের শেষকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিবে। তৎপরে নূতন অব্দে পুনরায় রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে।

৩। রেজেষ্ট্রীকালের মিয়াদ অতীত হইবার এক মাস কাল পূর্ব্বে সংবাদপত্র সমূহের ম্যানেজার বা প্রকাশককে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বা কেন্দ্র বিশেষের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পুনরায় রেজেষ্ট্রী করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া নোটীশ দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন পুনরায় লইতে হইলে কোন ফি দিতে হইবে না।

৪। রেজিষ্ট্রেশন প্রার্থনার নোটীশের সহিত অন্ততঃ ৫০জন গ্রাহকের নাম সম্বলিত এক তালিকা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) যদি এমন দেখা যায় যে কোন রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র ন্যূন মূল্যের টিকেট লাগাইয়া ডাকে দিয়াছে অথবা যদি রেজিষ্ট্রেশনের কোন বিধান ভঙ্গ হয় তাহা হইলে ঐ সংবাদপত্র ফেরৎ দেওয়া হইবে। যদি এইপ্রকার কোন বিধানের লঙ্ঘন পথিমধ্যে বা ডেলিভারী আফিসে ধরা পড়ে তাহা হইলে উহা বুক প্যাকেটরূপে গণ্য করা হইবে এবং বুক-প্যাকেটের হার অনুসারে ন্যূন টিকেটের মূল্য দ্বিগুণ করিয়া আদায় করা হইবে। কোন সংবাদ-পত্রের ভিতরে যদি নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্বলিত কোন ক্রোড়পত্র ভরিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ সংবাদপত্র বুক-প্যাকেট-রূপে পরিগণিত হইবে—

(১) কোন বিজ্ঞাপনদাতার জন্য মুদ্রিত বিজ্ঞাপনপত্র যাহা সংবাদপত্রের সহিত পাঠাইবার জন্য সংবাদপত্রে প্রেরিত হইবে।

(২) কোন বিজ্ঞাপনপত্র যাহাতে দরখাস্তের, প্রোপো-সালের বা জিজ্ঞাসাবোধক ফরম থাকিবে।

(৩) কোন মুদ্রিত পত্র যাহাতে গ্রাহকের নিকট প্রেরকের ব্যক্তিগত পত্র বুঝাইবে, যেমন মুদ্রিত সার্কিউলার বা পত্র।

রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র প্রেরণ সম্বন্ধে প্রচলিত সর্ত্ত-গুলিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

ডাক বিভাগ ১৯৩০-৩১—

ভারতীয় ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের—১৯৩০-৩১ সালের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। ডাক বিভাগে ক্ষতির পরিমাণ এ বছর ৬২ লক্ষ ৯ হাজার ২১২ টাকা। আগের বছর ক্ষতি হয়েছিল ২১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৩৩ টাকা। টেলিগ্রাফ বিভাগে এ বছর ক্ষতি হয়েছে ৬১ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৪ টাকা। টেলিফোন ও রেডিও বিভাগের ক্ষতি এবার ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩০৮ টাকা। গত বছর এই বিভাগে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৩১ টাকা। সমস্ত বছরে ১২৯ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩৫১টি চিঠিপত্র ডাক বিভাগ ডেলিভারী করেছে, আগের বছর ৯ কোটি ২০ লক্ষ চিঠিপত্র ডেলিভারী বেশী হয়েছিল। সংবাদপত্রের প্যাকেট আলোচ্য বছর কমেছে ৮৫ লক্ষ। প্রেস অর্ডিন্যান্সের ফলে গত বছর অনেক কাগজ বন্ধ হয়েছিল, এই কারণে বোধ হয় অনেক পত্রিকা প্যাকেটে কমেছে। আলোচ্য বছর পোষ্টকার্ডের ব্যবহার কমেছে প্রায় ৬০ লক্ষের উপর—অ-রেজেষ্ট্রী চিঠি কমেছে প্রায় কোটি ২০ লক্ষের উপর। মণিওর্ডার সংখ্যায় শতকরা প্রায় ৪ ভাগ ও টাকার পরিমাণে শতকরা ৮৷৷০ ভাগ কমেছে।

স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মিত্র—(১৮৯৮—১৯৩২)

সুপ্রসিদ্ধ ভবানীপুর ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কোষাধ্যক্ষ এবং ইণ্ডিয়ান ম্যাচ্ ফ্যাক্টরির স্বত্বাধিকারী রবীন্দ্রনাথ মিত্র বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। খেলার মহলে বিলি মিত্রকে চিনিত না এমন খুব কম লোকই আছে। ভবানীপুর ক্লাব তাঁহারই যত্নে ও উৎসাহে ভারতবর্ষীয় ক্রীড়া সমিতিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

কোন্নগরের বিখ্যাত মিত্র বংশের জমিদার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের তিনি দ্বিতীয় সন্তান। বিশেষ কৃতিত্বের

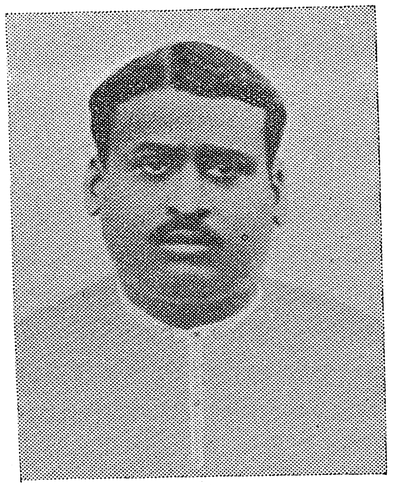

স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মিত্র

সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পাস করিয়া তিনি তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ম্যাচ্ ফ্যাক্টরিতে তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করেন। তিনি কোন চাকরি গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য নিরাকরণ কেবল জাতীয় শিল্পের জাগরণ দ্বারাই হইতে পারে।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি বাগবাজারের খ্যাতনামা ৺নন্দলাল বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বটবিহারী বসুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার কোন পুত্র-কন্যা নাই।

সমগ্র বাংলাদেশ শোক-নিবেদন করেছে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রতিকৃতি ও জীবনী বাহির করে। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী স্যার্ এন্, এন্, সরকারের সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁহার জীবনী, আদর্শ, এবং কার্য্যাবলি বিশেষরূপে সমালোচিত হয়। আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প বিভাগ—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প বিভাগ (Department of Industries) হইতে মধ্যে মধ্যে এক একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া থাকে। এই সকল পুস্তিকায় এই বিভাগের কর্ম্মীদের গবেষণা ও পরীক্ষার ফল এবং আরও নানা প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হয়। এইগুলি Bulletin নামে অভিহিত। আমরা শেষ যে বুলেটিনখানি পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা ৫১ ; অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে আরও পঞ্চাশখানি বাহির হইয়াছে। তাহার কতকগুলিও আমরা পাইয়াছি। ৫১ সংখ্যার পর যদি কোনখানি বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা এখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

---

৫১ সংখ্যক বুলেটিনের নাম The Refining of Cccoanut Oil বা নারিকেল তৈল শোধন করিবার পদ্ধতি। নারিকেল তৈল বঙ্গীয় মহিলারা মাথায় মাখিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে উহা রন্ধনার্থ এবং ভোজ্য রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাজারে নারিকেল তৈল যাহা পাওয়া যায়, এমন কি বিখ্যাত কোচিনের তৈল বলিয়া যাহা বিক্রীত হয় তাহাও বিশুদ্ধ নহে ; এবং তাহাতে একটা অপ্রিয় গন্ধ থাকে। সৌখিন পুরুষ ও মহিলারা নারিকেল তৈল রঞ্জিত করিয়া তাহাতে মাথাঘষা মশলা ও গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া কেশ-তৈলরূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু উহার দুর্গন্ধ ও অবিশুদ্ধ অবস্থার দরুণ কেশতৈল হিসাবে এই তৈল তেমন সুবিধাজনক নহে। সেইজন্য মূল্যবান কেশতৈল প্রস্তুত করিতে জলপাইয়ের তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য পুস্তিকার প্রণেতা ডাক্তার আর, এল, দত্ত ডি-এসসি এবং তাঁহার সহকারীরা এই পুস্তিকায় নারিকেল তৈল শোধনের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া নারিকেল

তৈলকে গন্ধ ও বর্ণহীন করিতে পারিলে কেশতৈল প্রস্তুত কার্য্যে নারিকেল তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। তৈল ব্যবসায়ীদিগকে আমরা জিনিষটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পরামর্শ দিতেছি।

নদীর কথা—

সংবাদপত্রের সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সেটি—(১) এই নদীমাতৃক দেশে জলকষ্ট, এবং (২) অনাবৃষ্টি ও (৩) অতিবৃষ্টির ফলে শস্যহানি। আজ যদি সংবাদপত্রে পড়া গেল যে অনাবৃষ্টির ফলে অমুক স্থানে শস্য জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, তাহা হইলে, আগামী কল্য হয় ত পড়া যাইবে—অতিবৃষ্টির ফলে অমুক স্থানে শস্য হাজিয়া মজিয়া পচিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ ঘটাইল। তাহার উপর বৎসরের কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট মাস ধরিয়া জলাভাবে সাধারণের আর্ত্তনাদ শুনিতে সংবাদপত্রের পাঠক সাধারণ এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহারা আর উহাতে বিচলিত হন না। নিত্য ও নৈমিত্তিক এই সকল ব্যাপারের উপর কয়েক বৎসর অন্তর বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাওয়ার সংবাদও প্রায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল। ১৩১৮-১৯ সালে দামোদরের বন্যায় বর্দ্ধমান ভাসিয়া গিয়া দেশময় হাহাকার উঠিল। মাত্র নয় বৎসর পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ জলপ্লাবনে কিছু কাল ধরিয়া জলমগ্ন হইয়া রহিল। তাহার পর গত বৎসরও আবার বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থল বন্যাপ্লাবিত হইয়া রহিল। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ দেশব্যাপী সর্ব্বনাশ কিরূপ সম্ভবপর হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

সুখের বিষয় সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা এফ আর-এস মহাশয় এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তা ও গবেষণার ফল একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবিশ মহাশয়ের সঙ্কলিত (১৮৭০-১৯২২) প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বাঙ্গলার বৃষ্টির পরিমাণ ও প্লাবনের হিসাব পর্য্যালোচনা করিয়া অধ্যাপক সাহা মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বঙ্গদেশের নদ-নদীগুলির গতি অতি পরিবর্ত্তনশীল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মেজর রেনেলের মানচিত্রে বাঙ্গলার নদ নদীগুলির অবস্থান যেরূপ ছিল, মাত্র সার্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে তাহার সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর, নদীর গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, সাধারণ স্বাস্থ্য, লোক সংখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গলার নদনদীর অবস্থান যেরূপ ছিল, তাহাতে বৃষ্টির ও বন্যার জল বাঙ্গলা প্রদেশের সর্ব্বত্র যথোপযুক্ত অনুপাতে বিস্তৃত হইয়া পড়িত—দেশের কোন একটা অংশ জলপ্লাবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না। এবং সম্ভবতঃ এই কারণে তখন বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া এমন ব্যাপক ভাবে ছিল না।

এইরূপ অতিপ্লাবন এবং দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া নিবারণের পন্থা নির্দ্দেশেও অধ্যাপক সাহা মহাশয় বিরত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ১৭৮৭ সালের পূর্ব্বে নদনদীর অবস্থান যেরূপ ছিল, সেগুলিকে সেই পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিম্বা বাঙ্গলার দুইটী প্রধান নদীর জল এবং উত্তরবঙ্গের জলপ্রণালী যাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এটি অবশ্য বহুব্যয়সাধ্য এঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপার ; সুতরাং ইহা যে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অর্থ সংস্থান করিতে পারিলে ব্যাপারটি যে অসম্ভব নহে, স্যার উইলিয়ম উইলকক্সের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠ করিলে এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশের নদনদীর অবস্থা ও অবস্থান স্বয়ং পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া স্যার উইলিয়ম উইলকক্স এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ভাগীরথী প্রভৃতি বড় বড় নদীগুলি স্বভাবজাত নহে উহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক খাত এবং সেকালের ভারতীয় স্থপতির অসাধারণ এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির পরিচায়ক। স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, স্থানান্তরে যাতায়াতের সুবিধা প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজন সাধনের জন্যই ঐ সকল প্রকাণ্ড নদী সেই সুদূর অতীত কালে

খাত হইয়াছিল। সেকালে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, একালে তাহা সম্ভব না হইবার কারণ দেখা যায় না।

অবশেষে অধ্যাপক সাহা মহাশয় বলিয়াছেন—"আমার মনে হয় যে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত প্রাথমিক তদন্ত করিয়া উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে বাঙ্গলার জনসাধারণের পক্ষে কোন ব্যয়বহুল পরিকল্পনাতে রাজী হওয়া উচিত নহে। নিম্নলিখিত ভাবে তদন্ত করিতে হইবে :—

(১) বাঙ্গলা দেশের নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য গবেষণার্থ একটী হাইড্রলিক রিসার্স লেবরেটারি স্থাপন।

(২) অধ্যাপক মহলানবিশের গবেষণা আরও চালাইবার জন্য একটী সংখ্যাসংগ্রহ বিভাগ (Statistical department) গঠন।

(৩) বাঙ্গালার জলপথ সম্বন্ধে আধুনিক উপায় জরীপ (hydrographic survey)।"

সাহিত্য-সংবাদ

—নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী—

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "তারপর" মূল্য—২৲

শ্রীসীযুকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বেদুইন" ; মূল্য—১৲

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত নাটক "জগন্নাথ"—১৲

শ্রীদিলীপকুমার রায়, বীরবল ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সঙ্কলিত "পত্রাবলী ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান"—১৲

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "ভারতলক্ষ্মী"—১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সাহিত্য-ভারতী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "প্রভাতী"—১৲

ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল বিরচিত "মেয়েদের সাংখ্য"—৸০

শ্রীনীহারবালা দেবী প্রণীত উপন্যাস "দেশের ডাক"—১৲

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত গল্প পুস্তক "মনাতনী"—১৷০

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "চেনা ও জানা" মূল্য—২৲

অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এম-এ প্রণীত "আমি ও আমার দেহ"—১৷০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার ত্রৈমাসিক সংস্করণ যণ্ডামার্কের দপ্তরের চতুর্থ গ্রন্থ "সঙ্কট দ্বীপ"—১৷০

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপন্মনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত "কামরূপ শাসনাবলী" মূল্য—৬৲

ফাল্গুনের ভারতবর্ষে "ভারতে যাদব বংশ" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩৭১	২৭	আমর্ত্ত	আনর্ত্ত
"	২৮	সোম দ্বীপের	কোন দ্বীপের
"	২৯	সোম রাজার	কোন রাজার
৩৭২	দ্বিতীয় ব্লকের নাম	জুনা গড়ে উপরকোট দুর্গ	জুনাগড়ে উপরকোট দুর্গ হইতে রৈবতকের দৃশ্য

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭৩	"	উপরকোট হইতে রৈবতকের দৃশ্য	জুনাগড়ে উপরকোট দুর্গ হইতে রৈবতকের দৃশ্য
"	৩৫	রাখিগ্না	রাখিয়া
৩৭৬	৯	কুলস্থলী	কুশস্থলী
৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩		রুদ্রদাস ও জয়দাস সর্ব্বত্র	রুদ্রদাম ও জয়দাম হইবে।

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEE.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

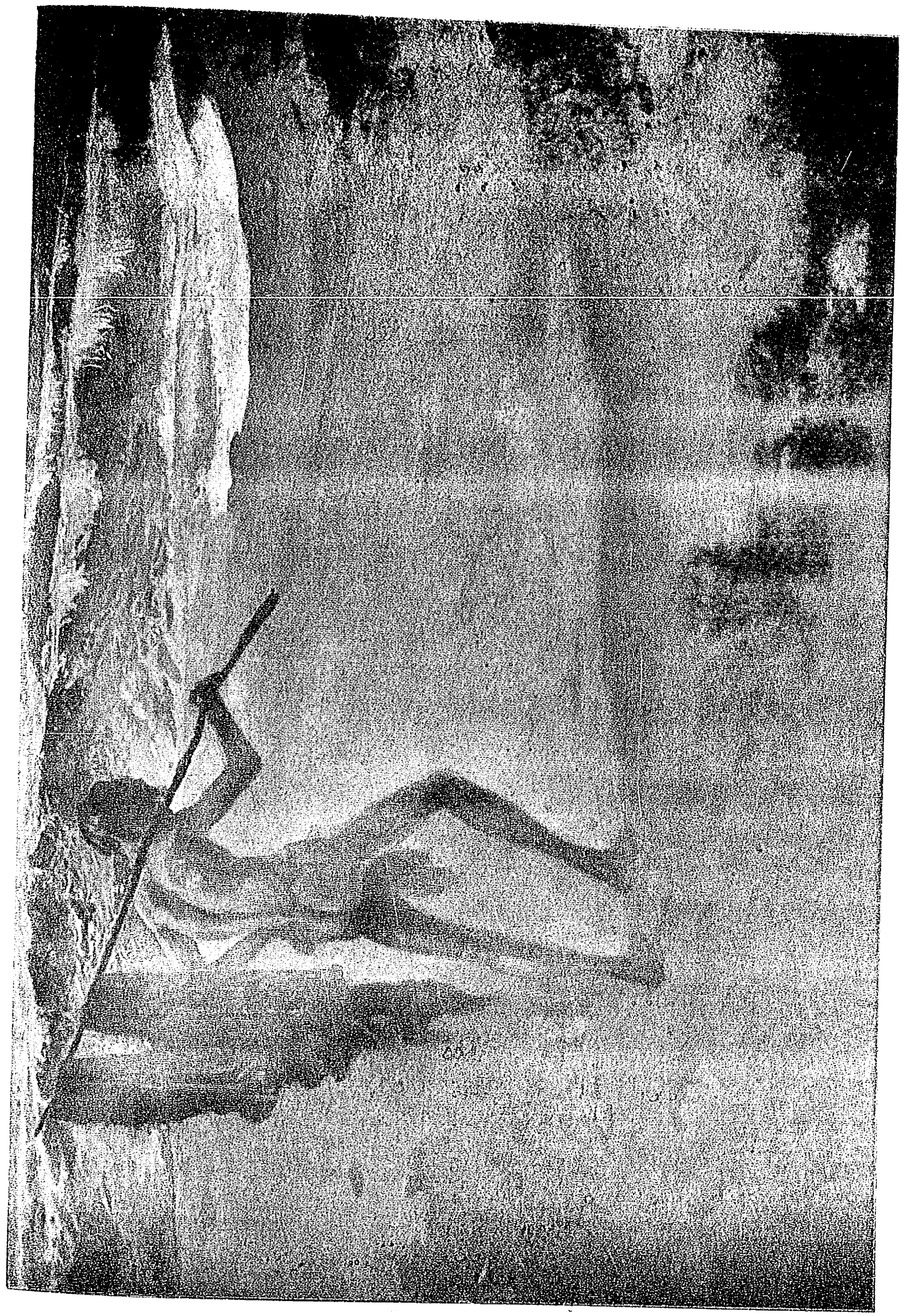

দিনের শেষ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ভারতবর্ষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works